প্রেমচন্দ গল্পসংগ্রহ



প্রেমচন্দ গল্পসংগ্রহ

প্রেমচন্দ

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রথম প্রকাশ

২০ মে ১৯৬৫

দ্বিতীয় বাংলা আকাদেমি সংস্করণ

নভেম্বর ২০০১

প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড

কলকাতা ৭০০ ০২০

প্রচ্ছদ

রবীন দত্ত

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

টাইপোগ্রাফিক্স

১১৫ কারনানি মেনসনস

২৫এ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৬

মূল্য ১৫০ টাকা

ISBN 81-7751-067-3

নিবেদন

বাঙালি পাঠকের কাছে প্রেমচন্দ শুধু পরিচিত নয়, পরম আদরণীয় একটি নাম। প্রেমচন্দ নিজেও বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যস্রষ্টাদের বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। লেখকের জীবৎকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের প্রতি বাঙালি পাঠকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা মনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রেমচন্দের জন্মশতবর্ষে তাঁর গল্প বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত সাহিত্য উপদেষ্টা পর্ষদ এই কাজের জন্য একটি উপদেষ্টামণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। এর পর প্রেমচন্দের অন্যতম পুত্র শ্রীঅমৃত রায়ের সহযোগিতায় ৮০টির মতো গল্প নির্বাচন করে অনুবাদ করানো হয়েছিল। সম্পাদকমণ্ডলী প্রতিটি গল্পের ভাষান্তর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, যাতে গল্পের স্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ অনুবাদ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় সেইদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত *প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ* বেশ কিছুকাল হল নিঃশেষিত হয়েছে। বহু পাঠক গ্রন্থটির খোঁজ করেছেন, এখনও করেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গল্প সংকলনটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'দুনিয়া কা সব্‌সে আনমোল রতন' (যা লেখকের মূল নাম ধনপত রায়ের নামেই প্রকাশিত হয়) থেকে শুরু করে প্রেমচন্দ ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প 'বড়ে ঘর কী বেটী' হয়ে তাঁর জীবনের সমাপন প্রান্তে প্রকাশিত গল্পগুলির প্রতিনিধিস্থানীয়দের অনুবাদ এখানে সংকলিত হয়েছে। ফলে পাঠক তাঁর গল্প-লেখালিখির বিবর্তন-ধারা বিষয়েও একটি ধারণা গড়ে নিতে পারবেন। উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জনজীবনের লেখমালা প্রেমচন্দের গল্প। সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর থেকে উঠে-আসা মানুষজন, তাদের মানসভঙ্গিমার সর্ববিধ অনুভূতি সংরাগ সংক্ষোভ সমেত যেন গড়ে তোলে এক মহত্তর মানবযাত্রা। এই মানবযাত্রী দলের কথাকার প্রেমচন্দ বিশ্বাস করতেন জীবনের নানা সংগ্রামের মধ্যে এক পরমসৌন্দর্য বিরাজ করে। সেই সৌন্দর্যে প্রাণিত তাঁর গল্পের দুনিয়া। কোনো সমালোচক যথার্থভাবেই তাঁকে ভারতীয় সাহিত্যের ম্যাক্সিম গোর্কি বলে অভিহিত করেছেন। উত্তরজীবনে তিনি তাঁর জীবনাদর্শের কেন্দ্রে সমাজবাদকে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বহু গল্প এবং উপন্যাস সেই সাক্ষ্য বহন করছে।

সেই দুনিয়ার দিগন্ত বাঙালি পাঠকের সম্মুখে ক্রমশ উন্মোচিত হোক, এই অভীপ্সা নিয়ে এই গল্পসংগ্রহের পুনঃপ্রকাশের আয়োজন। বর্তমান আকাদেমি সংস্করণে এবং পূর্বতন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন ছয়টি গল্পের শিরোনামও পরিবর্তিত হয়েছে। আরও তিনটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। প্রকাশনার সামগ্রিক বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হওয়ার আয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে প্রেমচন্দের পুত্রদ্বয়, উপদেষ্টামণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ও অনুবাদকরা যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনের বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন শ্রীঅমল রায়। প্রকাশনার অন্য কয়েকটি বিষয়েও তাঁর পরামর্শ আমাদের বিশেষ কাজে লেগেছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীপবিত্র সরকার আকাদেমি সংস্করণের জন্য নতুন করে এবং পরিবর্ধিত আকারে ভূমিকা লিখেছেন। প্রকাশনার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আশা করি বর্তমান সংস্করণ ব্যাপকভাবে পাঠকপৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সংসার, জীবিকা, সাহিত্যকর্ম ও সম্পাদনা, রাজনীতি—তাঁর জীবনের এইসব বৃহৎ ভূমিগুলি থেকে তিনি বারবার বিচলিত হয়েছেন, তা তাঁর জীবনীর পাঠকমাত্রেই জানেন। তবু এর মধ্যে লেখা হয়ে যায় প্রায় এগারোটি উপন্যাস—*বরদান* (১৯০৪), *প্রেমা* (১৯০৭, পরে *প্রতিজ্ঞা* নামে এর সংশোধিত রূপ প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এ), *সেবাসদন* (১৯১৮), *প্রেমাশ্রম* (১৯২২), *রঙ্গভূমি* (১৯২৫), *কায়াকল্প* (১৯২৬), *নির্মলা* (১৯২৮), *গবন* (১৯৩১), *কর্মভূমি* (১৯৩২), *গোদান* (১৯৩৬) এবং অসমাপ্ত *মঙ্গলসূত্র*। প্রকাশ করেন প্রায় তিনশো গল্প, যেগুলি গ্রন্থিত হয় *সোজ-এ-ওঅতন* থেকে আরম্ভ করে হিন্দি *সপ্ত-সরোজ* (১৯১৭) , *নও-নিধি* (১৯১৮), *বড়ে ঘর কী বেটী* (১৯২১), *প্রেম-পচীশী* (১৯২৩), *প্রেম-দ্বাদশী* (১৯২৪), *প্রেম-প্রসূন* (১৯২৫), *প্রেম-তীর্থ* (১৯২৯), *প্রেম-চতুর্থী* (১৯২৯), *পঞ্চ-ফুল* (১৯২৯), *অগ্নি-সমাধি* (১৯২৯), *সপ্ত-সুমন* (১৯৩০), *প্রেম-পঞ্চমী* (১৯৩০) ইত্যাদি অজস্র বইয়ে। প্রেমচন্দের মৃত্যুর পরে একই গল্প একাধিক সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। কখনও সংকলিত হয়েছে গ্রাম্য জীবনের গল্প, কখনও *জঙ্গল কী কহানিয়াঁ*, কখনও *নারী জীবন কী কহানিয়াঁ*। এখন *মান-সরোবর* নামে আট খণ্ডের বিপুল আধারে, দু-খণ্ড *গুপ্তধন*-এ, আর *কফন*-এ তাঁর প্রায় সমস্ত গল্প মুদ্রিত আকারে লভ্য। প্রবন্ধ, আলোচনা, অভিভাষণের সংখ্যাও প্রায় পাঁচশো। তার উপরে সরল ভাষায় রামায়ণের কাহিনি বলেছেন 'রামচর্চা' নাম দিয়ে। শেষে আমরা তাঁর রচনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছি, তা দ্রষ্টব্য।

রচনাপ্রকাশের এই তালিকা থেকে প্রেমচন্দের মহত্ত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। যে-কথা আমরা বরং খুব স্পষ্টতা আর জোরের সঙ্গে বলতে চাই তা হল, ভারতের জীবনের এত বৃহৎ ও এত গভীর ছবি আর কোনো লেখকের লেখায় নেই, তেমনই এই জীবনের শ্রেণি-অবস্থান, বঞ্চনা, শোষণ আর অত্যাচারের স্বরূপ, কারা কোন্ পক্ষে দাঁড়িয়ে অথচ কারা ভণ্ডামি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ ও পক্ষপাতকে আড়াল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে— এসব প্রেমচন্দের প্রখর দৃষ্টি ও কলমে তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। একেবারে প্রথম কয়েকটি গল্পে খানিকটা রোমান্সের আবেশ আছে, কিন্তু *সপ্ত-সরোজ* (১৯১৭)-এর গল্পগুলি, আর *সেবাসদন* উপন্যাসটি (১৯১৮) তাঁকে ভারতীয় বাস্তবের নির্মম ভূমিতে এনে দাঁড় করায়, এবং তারপর থেকেই চূড়ান্ত অনাসক্তিতে, কিন্তু বঞ্চিতের জন্য গভীর মানবিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি এই বাস্তবকে সকলের সামনে নিক্ষেপ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। কোথাও তাঁর দৃষ্টি বিচলিত হয় না, মধ্যবিত্ত, আত্মবৃত্তবদ্ধ পাঠকদের রেয়াত করার কথা তাঁর আদৌ মনে হয় না, উচ্চবিত্ত বঞ্চনাহীন এক ভারতের অলীক ছবি খাড়া করে পাঠককে স্বপ্নপ্রবঞ্চনা উপহার দিতে চান না তিনি। মনে হয় ভারতীয় জীবনের ধন ও দারিদ্র্য, ধর্ম ও অনৈতিকতা, পুরুষ ও নারী, উচ্চবর্ণ ও অচ্ছুতদের অধিকার ও জীবনপটের চূড়ান্ত বিরোধ তাঁর ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড এক ক্রোধের জন্ম দেয়, যে-ক্রোধ তাঁর রচনায় মৃদু ডিকেন্সীয় হাস্যের আড়াল থেকেও আগুনের আঁচের মতো আমাদের গায়ে এসে না লেগেই পারে না।

প্রথম থেকেই লক্ষ করি, প্রেমচন্দের অতি তীক্ষ্ণ এবং গভীর মানবিক দৃষ্টি একেবারে ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছে এই দেশে কারা সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ পীড়িত, বঞ্চিত, নিগৃহীত, আর

কারা সেই পীড়ন, বঞ্চনা আর নিগ্রহ সম্পাদন করে নিজেদের দৈহিক ও মানসিক বিলাসকে অব্যাহত রেখেছে। আর কাদের সচেতন ভণ্ডামি আর অজ্ঞতা, অচেতনতা বা বিভ্রান্তি এই ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে ও রাখতে সাহায্য করেছে। তাঁর অভিযোগের তির উঁচিয়ে থাকে সমাজের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের দিকে, যারা তথাকথিত নিম্নবর্ণ আর অচ্ছুতদের জন্তুজানোয়ারের বেশি সম্মান দেয় না। 'সদ্‌গতি'-র দুখি চামারের মৃতদেহকে যেভাবে পণ্ডিত ঘাসিরাম পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গ্রামের বাইরে আস্তাকুঁড়ে ফেলেছে তা বড়ো বেশি করে পশুর মৃতদেহ সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থা-অবলম্বনের কথা মনে করায়। তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগের তির সংসারে পুরুষের দিকে, যে-পুরুষ নারীকে—সে মা হোক, স্ত্রী হোক, বোন হোক—সংসারের একটি বস্তুদায় এবং শিশুর জন্মদান ও পালন, ঘর-গোছানো আর খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের যন্ত্রমাত্র মনে করে। নারী কোথাও 'ব্যক্তি' নয়, তার কোনো আবেগ বা মতামতেব মূল্য পুরুষের কাছে নেই, ফলে পুরুষের স্বার্থের জন্য তার উৎপীড়ন, ক্ষয় ও মৃত্যু যেন স্বাভাবিক এক ব্যবস্থা। *সেবা সদন, নির্মলা* বা *গোদান* উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে গল্পমালা 'বড়ো ঘরের মেয়ে', 'ভগবানের সং', 'বোঝাপড়া', 'মা', 'বলিদান', 'বুড়ি কাকি', 'শূদ্রা', 'জাতাবুড়ির কুয়ো', 'নতুন বিয়ে', 'মিস্ পদ্মা', 'পুত্রবতী বিধবা', 'তেঁতুর', 'শ্রাধের নিমন্ত্রণ'— কত নাম করব। শুধু মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের নয়, নারীর এই প্রথাগত অপমানিত অস্তিত্ব নিম্নবর্গ আর দাবিদ্র্যের রসায়নে আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। সবাই অবশ্য মেনে নেয় না, আত্মহত্যাব পথ বাছে না। কেউ কেউ বুখে দাঁড়ায় কুসুমের মতো, প্রেমচন্দ তাও দেখিয়েছেন।

উপরে আমরা প্রেমচন্দের রচনার বিষয়কে কয়েকটি প্রধান বিরোধেব সূত্রে দেখবার চেষ্টা করেছি। এই বিরোধগুলি তাঁর চোখে পড়েছে ভারতের জনজীবনে, এবং বিরোধে তিনি মূলত যারা দুর্বলতর তাদেরই পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু তাঁব এই পক্ষপাত কখনোই উদ্‌ঘোষণমূলক বা চিৎকারধর্মী নয়। কখনও শেষে একটি তির্যক মন্তব্যে তিনি বঞ্চনার মুখোশ খুলে দেন, আবার হয়তো কখনও সে-'মন্তব্য' একটু অতিরিক্ত মনে হয়, যেমন 'সদ্‌গতি'-র শেষে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমচন্দ কোনো মন্তব্য কবেন না, কেবল ঘটনাব পরম্পরা ধবে আখ্যান কোন্ অমোঘ অবস্থানে পৌঁছাল তা দেখিয়ে দেন। কিন্তু তা-ই যেন পাঠকেব স্বস্তি ও বিশ্বাসভিত্তি হঠাৎ টলিয়ে দেয়।

প্রেমচন্দের রচনার তৃতীয় বিরোধ যা আমাদের চোখে পড়েছে তা ধর্মের ভিতর আর বাহির, লক্ষ্য আর আচরণের মধ্যে। ধর্মের ভড়ং আর আনুষ্ঠানিকতা কীভাবে শোষণেব যন্ত্র হয়ে দরিদ্র জনজীবনকে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেয় তা প্রেমচন্দ লক্ষ করেন—'সদ্‌গতি' আর 'কফন' তারও মর্মান্তিক সূত্র তুলে ধরে। ধর্মের খাত বয়েই তৈরি হয় ব্রাহ্মণত্বেব গগনচুম্বী মহিমা আর জল্লাদের পক্ষে যা লজ্জাকর সেই পৈশাচিক শক্তি। নারীর উপর অত্যাচারেব বহু তত্ত্বও তৈরি হয় ধর্মের অধীনে। এই ধর্মই সৃষ্টি করে সমাজের পরগাছা গুরু-পুরুত বা মোটেরাম শাস্ত্রীদের (নিমন্ত্রণ) মতো জঞ্জাল।

অর্থাৎ এখানেই আমরা লক্ষ করি যে, এই 'বিরোধ'-গুলিকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখালেও সেগুলি একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, প্রত্যেকে অন্যকে প্রভাবিত করে। পুরো ভারতের ছবিতে তারা পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিশে থাকে।

ধন আর নিঃস্বতা প্রেমচন্দের বিশ্বে চতুর্থ বিরোধ হিসেবে আমরা আনছি, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে এ একেবারে প্রথমে। তাই এ-বিরোধকেই আমাদের প্রথমে আনা উচিত ছিল। এই বিরোধের চিত্রণেই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে থাকেন ভারতবর্ষের দরিদ্র-জীবনের তন্নিষ্ঠ কথক প্রেমচন্দ। এক সমধর্মী লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুর বছরে তাঁরও মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুর এই আপতিক যোগ ছাড়াও দু-এর জীবনবীক্ষার মধ্যে যে গভীর নৈকট্য ছিল, তা অনেকেই লক্ষ করেছেন, এ নিয়ে একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। গোর্কির ক্ষেত্রে একাধিক বিবর্তন লক্ষ করি আমরা। প্রেমচন্দের বিবর্তনও পরম্পরাযুক্ত এবং স্পষ্ট। একাধিক গল্পে গান্ধিবাদী ধরনের হৃদয়ের পরিবর্তনজনিত উপসংহার দেখান প্রেমচন্দ, 'সুভাগী'-তে যেমন, কিন্তু এইসব ইচ্ছাপূরক আখ্যানগুলি শোষণ, অত্যাচার আর দারুণ নিশ্চৈতন্যের ভারতীয় বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো মায়াজাল তৈরি করতে পারে না। 'সদ্‌গতি' বা 'কফন'-এর মতো গল্পে তা একেবারে বীভৎস নগ্নতায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। বোঝাই যায় যে 'কফন'-এর ঘিসু আর মাধব আর বুধিয়া সব একই অদৃশ্য বন্ধনের অংশীদার। বুধিয়া যে-কারণে মর্মান্তিক অবহেলায় মরে, ঘিসু আর মাধবকেও সমাজের মর্মান্তিক অবজ্ঞা আর অবহেলা ওই অর্ধমানবিক করে তৈরি করেছে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমচন্দের পূর্ববর্তী বা সমকালীন বিখ্যাত লেখকদের লেখাতেও বঞ্চিত ও সর্বহারাদের ছবি আছে। কিন্তু আমার কাছে তা কিছুটা সরল ও আবেগসিক্ত বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'-এর সঙ্গে তুলনা সহজেই এসে পড়ে। তা জীবনচিত্র হিসেবে অবশ্যই মর্মস্পর্শী। কিন্তু গফুর বা অভাগী চরিত্রের মধ্যে প্রেমচন্দের বহু চরিত্রের মতো জটিলতা নেই, শক্তিও নেই। বিশেষ করে ঘিসু আর মাধোর কথা মনে হয়। তাদের অসম্ভব বঞ্চনা যেন তাদের মধ্যে নিজেদের ধ্বংস করবারই এক আসুরিক শক্তি জাগিয়ে তোলে। শরৎচন্দ্রের গফুর তবু ফুলবেড়ের চটকলে যায়, অভাগী স্বপ্ন নিয়ে মরে। দুখি চামার, মাধো আর ঘিসুর পরিণাম এত স্বচ্ছন্দ নয়, তা লেখকের সহানুভূতিসিক্ত আবেগকে এত সহজে উচ্ছ্বসিত করে না। বরং প্রেমচন্দের ভিতরকার একটা চাপা ক্রোধ যেন গনগনে আঁচ ছড়াতে থাকে, তাঁর কলম কঠোর ও নির্মম হয়ে সত্যের নগ্ন চেহারাটা দেখিয়ে দিতে থাকে। সেখানে ঈশ্বরের বা পরলোকের কোনো ভূমিকা নেই, কোনো আশ্বাস নেই। শরৎচন্দ্র সমাজের কুশ্রীতা দেখাতে গিয়ে ব্যক্তিকে একটু সরল করে ফেলেন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রেমচন্দের দুটি দিকেই সমান নজর, ব্যক্তিও তাঁর হাতে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। এই সব গল্প যখন পড়ি তখন আমাদের সাজিয়ে-দেওয়া ওই বিরোধগুলি সব একাকার হয়ে গিয়ে ভারতের দরিদ্র পৃথিবীর সবচেয়ে স্থায়ী, কুৎসিত ও মর্মান্তিক বাস্তবকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এ-বাস্তব আজও কি আমূল বদলানো সম্ভব হয়েছে? 'বিমারু' রাজ্যগুলির অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের বা অন্য অনেক প্রদেশের গ্রামের খবর তো এখন সবরকম মিডিয়াই আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট করে মেলে ধরে; আমরা কি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি যে হয়েছে? পারি না।

তাই অদৃষ্টবাদ আর গান্ধিবাদ-শাসিত অর্ধশতাব্দীর স্বাধীন ভারতের প্রায় অপরিবর্তিত শ্রেণি-বৈষম্যের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি গান্ধিবাদের ভিত্তি থেকে যাত্রা আরম্ভ হয় তাঁর, কিন্তু গান্ধিবাদ তাঁর সবটুকু অধিকার করতে পারে না। গান্ধি-আরউইন চুক্তি তাঁকে ক্ষুব্ধ

করে তোলে। এ ছাড়াও তিরিশের বছরগুলিতে বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের উপলক্ষ্যে যখন গান্ধিজি বলেন যে, তা হল ওখানকার মানুষের পাপের ফল, তখন সেই যুক্তিহীন কথার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রেমচন্দ প্রশ্ন তোলেন, ওখানকার সব লোকই কি পাপী ছিল? অন্য জায়গায় কি পাপী লোক নেই? সেখানে কেন ভূমিকম্প হয় না? তাঁর মৃত্যুর বছরে যেসব কথা বলেন তিনি, বিশেষত, মহাজনি সভ্যতা-র মতো প্রবন্ধে, তখন বুঝি তিনি মার্কসবাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মারাঠি লেখক টিকেকর-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শুনি—'ম্যায় কম্যুনিস্ট হুঁ। কিন্তু, মেরা কম্যুনিজম কেবল য়হী হ্যায় কি হমারে দেশ মে জমীদার, সেঠ, আদি জো কৃষকোঁ কে শোষক হ্যায়, ন রহেঁ।' অসমাপ্ত *মঙ্গলসূত্র* উপন্যাসে প্রেমচন্দ তাঁর ওই উদারতন্ত্রী সাম্যবাদেরই পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলেন, কেন 'এক আদমী জিন্দগী ভর কৃড়ী সে কড়ী মিহনৎ করনে পর ভী ভুখোঁ মরতা হ্যায়, ঔর দুসরা আদমী হাথ পাঁও ন হিলানে পর ভী ফুলোঁ কী সেজ পর সোতা হ্যায়।'

এই প্রশ্ন যখন তুলছেন প্রেমচন্দ, তখনই, মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে, তাঁকে চলে যেতে হল। দীর্ঘায়ু পেলে ভারতবর্ষের সাহিত্যসংসার তিনি কীভাবে কতটা সমৃদ্ধ করতেন—দরিদ্র ভারতবর্ষ তাঁর সৃষ্টিতে আরও কতটা ব্যাপ্তি পেত—সে-প্রসঙ্গ এখন অবান্তর। আমরা যা পেয়েছি তা-ই কি সামান্য? প্রেমচন্দের গল্পে সামন্ততন্ত্র থেকে মহাজনি সভ্যতা-য় পরিবর্তমান ভারতবর্ষ, গান্ধিবাদ থেকে বামপন্থার মধ্যে পরিবর্তমান মধ্যবিত্ত চেতনা যেমন ধরা দেয়, তেমনই গ্রামের জমিদার, জোতদার ও চাষি-গেরস্থ, খেতমজুর, দোকানি, ব্যবসায়ী, শহরের শিল্পপতি, ম্যানেজার, কারখানার শ্রমিক, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী আর দোকানদার, পেশাজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসঘাতক, পণ্ডিত, বৈদ্য ও হাকিমের দল—বিশেষ করে অচ্ছুত সমাজবর্জিত সর্বরিক্ত মানুষেরা অভাবনীয়রূপে জীবন্ত হয়ে বিরাজ করে। গ্রাম ও শহরে তাঁর যাতায়াত ঘটে, তবু গ্রামের ছবিটিই যেন একটু বেশি মমতা পায় তাঁর কাছে। তাঁর গল্পে বাণী, বক্তৃতা, উপদেশ যা আছে তা জীবনের ওই প্রত্যক্ষ স্পষ্ট তীব্র রূপকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আর আছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল ডিকেন্সীয় বর্ণনাভঙ্গি, যার অভিঘাতে দুঃখের ছবি আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।

এই সংকলনের গল্পগুলির অনুবাদ ও সম্পাদনার পদ্ধতিটি ছিল এইরকম প্রথমে প্রেমচন্দের গল্পকার-জীবনের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় আশিটির মতো গল্প নির্বাচন করলেন সম্পাদকেরা। এই নির্বাচনের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি যেমন আছে, তেমনই আছে প্রতি পর্বে তার সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পগুলি। অর্থাৎ গল্পকার প্রেমচন্দের ধারাবাহিক বিবর্তনের ছবিটি যাতে এই গল্পগুলিতে ফুটে ওঠে, সেই দিকে সম্পাদকদের লক্ষ্য ছিল, সেই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার বিপুল বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির নানা ভাঁজ-বিভঙ্গও তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। গল্পগুলি নির্বাচনের পর সেগুলি অনুবাদকদের হাতে দেওয়া হয়। অনুবাদকদের ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানমাত্র যথেষ্ট ছিল না, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে একই গল্পের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ নিয়ে। এমন দেখা গেছে যে, *মান-সরোবর* নামক বৃহৎ সংকলন—যাতে আপাতত প্রেমচন্দের প্রায় সমস্ত গল্পই সংকলিত, তার পাঠের সঙ্গে পৃথক গ্রন্থের পাঠে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। উর্দু-হিন্দির পাঠের অসংগতি তো আছেই—

অন্তত প্রথম দিককার বেশ কিছু গল্পের ক্ষেত্রে। সম্পাদকেরা প্রেমচন্দ-তনয় প্রখ্যাত লেখক অমৃত রায়ের পরামর্শে *মান-সরোবর* গ্রন্থমালাকেই মূলত অবলম্বন করেছেন অনুবাদের প্রাথমিক উৎস হিসাবে।

অনুবাদ জমা পড়বার পর একজন হিন্দিভাষী, একজন উর্দুভাষী এবং অন্তত একজন বঙ্গভাষী সম্পাদক প্রতিটি অনুবাদ পরীক্ষা করেছেন নিয়মিত বৈঠক করে। এখানেও মূলের ভাষাশৈলীর প্রতি আক্ষরিক আনুগত্য এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ভঙ্গিমার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হয়েছে। সম্পাদকেরা দুয়ের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—প্রেমচন্দের নিজস্ব ভাষিক বিশিষ্টতা এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ইডিয়ম। অনুবাদের সম্পাদনায় এ-দুয়ের সামঞ্জস্য বিধানে তাঁরা এবং অনুবাদকগোষ্ঠী কতটা সফল হয়েছেন তা সুধী পাঠকরা বিচার করবেন। সম্পাদকেরা একসঙ্গে প্রেমচন্দের এতগুলি গল্প বাঙালি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন বলে আনন্দিত ও কৃতার্থ। অন্য কোথাও এক খণ্ডে এতগুলি গল্প পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা আরও তিনটি গল্প যোগ করেছি।

আমরা এ-গল্পগুলিকে প্রকাশকালের ক্রম অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করেছি। তবে কয়েকটি গল্পের প্রকাশকাল অজ্ঞাত থাকায় কোথাও কোথাও এই ক্রম ভাঙতে হয়েছে।

প্রেমচন্দের মতো একজন লেখক সব দেশেই, সব সময়েই বিরল। বাঙালি পাঠকদের কাছে তাঁর রচনার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তুলে ধরবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-উদ্যোগ নিয়েছিল তার প্রথম পর্যায় হিসেবে এই গল্পসম্ভার বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হল। তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ আরও আনন্দের উপলক্ষ্য। এবারেও আশা করি, এই সংকলন বাঙালির ঘরে মহত্তম গ্রন্থগুলির পাশে তার স্বাভাবিক স্থান গ্রহণ করবে।

পবিত্র সরকার

সূচি

দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন

দিলফিগার এক কাঁটাভরা গাছের নীচে বসে তার জামার প্রান্ত ছিঁড়ে ঘোর কষ্টে চোখের জল ফেলছিল। সে হল সৌন্দর্যের দেবী সম্রাজ্ঞী দিলফরেবের সাচ্চা ও জীবনপণ-রাখা প্রেমিক। যারা সুগন্ধ মেখে ও জমকালো পোশাকে সেজে প্রেমিক হওয়ার দম্ভ দেখায়, সে সেরকম প্রেমিকদের একজন নয়। সাদাসিধে ভালোমানুষ সে—সেই প্রেমিকের মতো যারা বনেজঙ্গলে ও পাহাড়ে-পর্বতে মাথা খোঁড়ে ও ফরিয়াদ করে বেড়ায়। দিলফরেব তাকে বলেছিল, তুমি যদি সাচ্চা প্রেমিক হও, তাহলে যাও আমার জন্যে নিয়ে এসো দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু, নিয়ে দরবারে হাজির হও। তখন আমি তোমায় আমার গোলামের দলে ভর্তি করে নেব। যদি তুমি সেই বস্তু না পাও, তাহলে খবরদার আর এমুখো হোয়ো না, হলে তোমায় শূলে চড়াব। দিলফিগারকে এতটুকুও অবসর দেওয়া হল না তার মনের কথা বলার, অনুযোগ করার, প্রেমিকার সৌন্দর্য দর্শন করার। দিলফরেবের এই ফয়সালা শোনামাত্র তার চোপদাররা গরিব দিলফিগারকে ধাক্কা মেরে বের করে দিল। তাই আজ তিন দিন ধরে এই বিপন্ন লোকটি সেই ভয়ংকর মাঠে কাঁটাভরা গাছের নীচে বসে ভাবছে কী করা যায়। দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য জিনিস কি আমি পাব? অসম্ভব। আর এই জিনিসটিই বা কী? কারও রত্নভাণ্ডার? অমৃত? খুসরৌর রাজমুকুট? জামেজম? তখতে তাউস? পরভেজের সম্পত্তি? না এগুলো কিছুতেই নয়। দুনিয়াতে অবশ্যই এগুলোর চেয়ে দামি, এগুলোর চেয়ে অমূল্য জিনিস আছে। কিন্তু সে বস্তুটি কী? কোথায়, কী করে পাওয়া যাবে? হে খোদা, আমার মুশকিল কী করে আসান হবে?

দিলফিগারের মাথায় এই এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

মুনির পেয়েছিলেন শামি হাতিমের মতো সাহায্যকারী। হায়! আমিও যদি কারও সহায়তা পেতাম! হায়! আমায় যদি কেউ বলে দিত দুনিয়ার অমূল্য বস্তুর নামটা কী। সেই বস্তু হাতে না পেলেও যদি জানতে পারতাম সেই বস্তুটি কী। আমি কলসির মতো বড়ো মুক্তোর সন্ধানে যেতে পারি। আমি সমুদ্রের গান, পাথরের হৃদয়, মৃত্যুর শব্দ এবং এগুলোর চেয়েও বেনিশার বস্তুর সন্ধানে কোমর বেঁধে লাগতে পারি। কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন। এ বস্তু আমার কল্পনার বহু উর্ধ্বে।

আসমানে একটি-দুটি তারা দেখা দিচ্ছে। দিলফিগার হঠাৎ খোদার নাম করে উঠে দাঁড়াল, একটা দিক লক্ষ করে পা চালিয়ে দিল। অভুক্ত, পিপাসার্ত, নগ্নগাত্র, ক্লান্ত দেহে সে বছরের পর

বছর বনে-জঙ্গলে ও শহরে-গ্রামে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াল। পায়ের পাতা কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল। শরীর কংকালসার হয়ে গেল। কিন্তু দুনিয়ার সেই যে সবচেয়ে অমূল্য জিনিস, তার কোনো হদিস কোথাও পেল না সে।

একদিন সে পথ হারিয়ে এক মাঠে গিয়ে পড়ল। সেখানে হাজার হাজার লোক দল বেঁধে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে কয়েকজন পাগড়ি ও চোগাচাপকান-পরা দাড়িওয়ালা কাজি অফিসারদের রোয়াকে বসে নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ করছে। এই ভিড় থেকে কিছু দূরে একটা শূল খাড়া করা রয়েছে। দিলফিগার খানিকটা দুর্বলতার জন্য ও খানিকটা কৌতূহলবশত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখল, উন্মুক্ত তরবারি হাতে কয়েকজন হাতেপায়ে শেকল বাঁধা একজন কয়েদিকে ধরে আনছে। শূলের কাছে পৌঁছে সেপাইরা থামল, কয়েদির হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হল। এই অমানুষটার হাত শত শত নিরপরাধের রক্তে রঞ্জিত। উপকার ও দয়া কাকে বলে তার হৃদয় আদৌ শেখেনি। লোকটার নাম কালা চোর। সেপাইরা তাকে শূলের তক্তায় দাঁড় করিয়ে দিল। তার গলায় মৃত্যুর ফাঁস পরিয়ে জল্লাদেরা যেই তক্তা টেনে নিতে যাবে সেই মুহূর্তে হতভাগা অপরাধীটা চিৎকার করে বলল, খোদার দোহাই, আমাকে এক লহমার জন্য ফাঁসিকাঠ থেকে নামিয়ে দাও, আমি আমার মনের শেষ সাধ মিটিয়ে নিতে চাই। একথা শুনে চারিদিকে স্তব্ধতা নেমে এল। লোকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। কাজি ভাবল, ফাঁসির আসামির শেষভিক্ষা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। হতভাগ্য কালা চোরকে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁসিকাঠ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল।

এই ভিড়ের মধ্যে একটি ভদ্র ও সুন্দর মুখশ্রীর শিশু ছড়িতে চেপে লাফিয়ে লাফিয়ে তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিল। তার জগতে সে এতই মগ্ন ছিল যে, ভাবছিল যেন এই মুহূর্তে সে কোনো আরবি ঘোড়ায় চেপে চলেছে। তার চেহারা সেই নির্মল আনন্দে পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। সে আনন্দ অল্প ক-দিনের জন্য শৈশবে মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তার স্মৃতি আমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারি না। তার হৃদয়কে এখন পর্যন্ত স্পর্শ করেনি পাপের কালিমা। সে যেন প্রশান্তির কোলে ক্রীড়ারত এক শিশু।

হতভাগ্য কালা চোর ফাঁসিকাঠ থেকে নামল। হাজার হাজার চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। সে ছেলেটির কাছে এল, কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল তাকে। কবে সে নিজে এই রকম শান্তশিষ্ট হাসিখুশি ছিল, ছিল দুনিয়ার কদর্যতার স্পর্শ থেকে মুক্ত, সেই সব দিনের কথা তার মনে পড়ল। মা তাকে কোলে করে খাওয়াতেন, পিতার বুক আনন্দে ভরে উঠত তার মুখ চেয়ে। সারা পরিবার তার জন্য যে কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত ছিল। আঃ! অতীতের দিনগুলির স্মৃতিতে ছেয়ে গেল কালা চোরের মন, তার চোখ থেকে— যে চোখ মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাতর ছটফটানিতেও একবার পলক ফেলত না— এক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।

দিলফিগার এগিয়ে গিয়ে সেই অমূল্য অশ্রুর মুক্তোকে নিজের হাতে তুলে নিল। তার হৃদয় বলে উঠল—নিঃসন্দেহে এই হল দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন যার জন্য ময়ূর সিংহাসন, জামেজম, আব-এ-হায়াত ও পরভেজের ধনদৌলত বিসর্জন দেওয়া সম্ভব।

এই ভেবে খুশিমনে সাফল্যের আশায় মত্ত দিলফিগার প্রেমিকা দিলফরেবের শহর মনোসবাদ-এর দিকে রওনা হল। কিন্তু যতই সে লক্ষ্যস্থলের কাছে যায়, ততই তার মনে হতাশা জাগে। জাগে

এই ভেবে যে, যে বস্তুকে আমি দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন মনে করেছি দিলফরেব যদি তার কদর না বোঝে, তাহলে নির্ঘাত আমার ফাঁসি হবে। আমার আশার জলাঞ্জলি হবে। অ যা হওয়ার হোক। এই আমার ভাগ্যপরীক্ষা। পাহাড় ও সমুদ্র পার হয়ে শেষে সে মনোসবাদ শহরে এসে পৌঁছাল, প্রেমিকার দেউড়িতে গিয়ে জানাল যে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দিলফিগার খোদার ফজলে দিলফরেবের হুকুম তামিল করে ফিরে এসেছে। সে তার পদযুগল চুম্বন করতে চায়। দিলফরেব তৎক্ষণাৎ তাকে সামনে ডেকে পাঠাল। সোনালি পরদার আড়াল থেকে ফরমাশ করল, সেই অমূল্য রতন হাজির কর দেখি। দিলফিগার আশা ও ভয়ের এক বিচিত্র দ্বিধার মধ্যে অশ্রুবিন্দু তার সামনে ধরল। বেশ বলিষ্ঠ ভাষায় বলে গেল তার পূর্ণ বৃত্তান্ত।

দিলফরেব কাহিনির সমস্তটা মন দিয়ে শুনল। আর সেই উপহার হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখার পর বলল—দিলফিগার, নিঃসন্দেহে তুমি দুনিয়ার এক অতি মূল্যবান জিনিস খুঁজে বের করেছ। তোমার হিম্মত ও বুদ্ধির তারিফ করি। কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু এ নয়। তুমি আবার বেরিয়ে পড়ো, আবার চেষ্টায় লাগো। হয়তো এবার তুমি ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাবে। তখন তোমার ভাগ্যে আমার গোলামি জুটবে। আমি আগে বলেছিলাম, আমি তোমায় শূলে চড়াব, কিন্তু এখন তোমার প্রাণভিক্ষা দিচ্ছি। দিচ্ছি এই জন্য যে, আমি আমার প্রেমিকের মধ্যে যে গুণ দেখতে চাই তোমার মধ্যে সেই গুণ লক্ষ করছি। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনোদিন সফল হবে।

ব্যর্থ ও ভগ্নমনোরথ দিলফিগার প্রেমিকার এই মেহেরবানিতে একটু সাহস পেয়ে বলল—হে হৃদয়েশ্বরী, বহুদিন পরে তোমার দেউড়িতে সিজদা করার সৌভাগ্য হল। খোদা জানেন আবার কবে এমন দিন আসবে। তোমার জন্য প্রাণপাত করছে যে প্রেমিক, তার দুর্দশা দেখে তুমি কি দয়া করবে না? নিজের রূপের এক ঝলক দেখিয়ে এই পুড়ে-মরতে-থাকা দিলফিগারকে ভবিষ্যতের কষ্ট সহ্য করার শক্তি জোগাবে না? তোমার একটি মদির দৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে যে কাজ আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি সেই কাজ আমি নিশ্চয়ই করতে পারব।

দিলফরেব প্রেমিকের এই বাসনা-ভরা কথা শুনে রেগে উঠল। হুকুম দিল, এই দিওয়ানাটাকে এখুনি দরবার থেকে বার করে দাও। চৌকিদার তক্ষুনি বেচারা দিলফিগারকে ধাক্কা দিয়ে প্রেমিকার গলি থেকে বার করে দিল।

দিলফিগার তার প্রেমিকার হৃদয়হীন অকরুণ ব্যবহারে কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করল। তারপর ভাবতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়। বহুকাল এদিক-সেদিক, বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর পর অশ্রুর সেই বিন্দু সে পেয়েছিল। এখন কী এমন মূল্যবান জিনিস সে পাবে যার দাম এর চেয়েও বেশি? হজরত খিজির। তুমি সেকেন্দারকে আব-এ-হায়াত কূপের পথ দেখিয়েছিলে, আমার উপর তোমর করুণা হবে না? সেকেন্দার ছিল সারা দুনিয়ার অধিপতি। আর আমি তো ঘর-হারানো মুসাফির। তুমি অনেক ডুবন্ত তরিকে কিনারায় এনে তুলেছ, এই গরিবকে পার করো, হে মহামহিম জিবরাইল। তুমিই এই মৃতপ্রায়, দুখি প্রেমিকের ওপর সদয় হও। তুমি খোদার বিশেষ অনুচর, আমার মুশকিল আসান করবে না তুমি? এভাবে দিলফিগার অনেক কাকুতিমিনতি করল। তবে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াল যে, তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। শেষে হতাশ হয়ে পাগলের মতো আবার একদিকে বেরিয়ে পড়ল সে।

দিলফিগার পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত কত কত বনজঙ্গল ও জনবসতিহীন জায়গায় ঘুরল। কখনও ঘুমিয়ে পড়েছে ঢাকা পাহাড়চুড়ায়, কখনও ঘুরে বেরিয়েছে উপত্যকায়। কিন্তু যে জিনিসের জন্য সে পাগল তার সন্ধান কোথায়? তার শরীর গেল অস্থিচর্মসার হয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে এক নদীর তীরে দুঃখিত চিত্তে পড়ে ছিল। চেতনা ফিরে আসার পর চমকে উঠে দেখল, চন্দনের এক চিতা তৈরি করা রয়েছে আর এক যুবতি বিয়ের জোড় পরে সেজেগুজে তার উপর বসে আছে। তার হাঁটুর উপর তার প্রিয় স্বামীর মাথা শোয়ানো। হাজার হাজার লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, তার উপর পুষ্প বর্ষণ করছে। হঠাৎ চিতায় জ্বলে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত এক শিখা, সতীর চেহারা মুহূর্তে এক পবিত্র ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চিতাগ্নির পবিত্র শিখাগুলি তার গলা জড়িয়ে ধরল ও পলকে সেই ফুলের মতো কোমল শরীর অঙ্গারস্তূপে পরিণত হল। প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য আত্মোৎসর্গ করল, দুটি মানব-মানবীর সত্য, পবিত্র, অমর প্রেমের শেষ লীলা তার দৃষ্টিথেকে মুছে গেল। সকলে বাড়ি ফিরে গেল। দিলফিগার নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, তার ছেঁড়া জামার আঁচলে তুলে নিল সেই ছাই। ভাবল, এই একমুঠো ভস্মই তো দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রত্ন। সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে আবার রওনা হল প্রেমিকার উদ্দেশে। এবার গন্তব্যস্থল যতই কাছে এগিয়ে আসে, তার সাহস ততই বেড়ে চলে। তার অন্তরাত্মা বলে—এবার তোমার জিত হবে। তার এই সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শেষে সে এসে পৌঁছাল মনোসবাদ শহরে। দিলফরেবের উঁচু দেউড়িতে এসে খবর দিল, দিলফিগার সফল হয়ে ফিরে এসেছে। সে গৃহকর্ত্রীর সামনে উপস্থিত হতে চায়। দিলফরেব দুঃসাহসী প্রেমিককে দরবারে ডেকে পাঠাল তৎক্ষণাৎ। দুনিয়ার সেই অমূল্য রতনের জন্য হাত পাতল সে। তখন দিলফিগার সাহস করে তার রজতশুভ্র মণিবন্ধ চুম্বন করল এবং একমুঠো ভস্ম তার হাতে ঢেলে দিল। তারপর সে সমগ্র কাহিনি হৃদয়দ্রাবক ভাষায় বলে গেল। এবার সুন্দরী প্রেমিকার মুখে আপন ভাগ্যে অনুকূল রায় শোনার অপেক্ষা মাত্র। দিলফরেব সেই একমুঠো ছাই তার চোখে ছোঁয়াল। কিছুক্ষণ চিন্তার সাগরে ডুবে রইল সে। তারপর বলল—হে আমার প্রাণতুচ্ছকরা প্রেমিক দিলফিগার, তুমি যে ভস্ম এনেছ তা স্পর্শমণির চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এ দুনিয়ার খুবই অমূল্য জিনিস। এ অমূল্য উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। কিন্তু দুনিয়ায় এর চেয়েও অমূল্য কোনো বস্তু কি নেই? যাও, তার খোঁজ করো, তারপর আমার কাছে এসো, আমি অন্তর দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি খোদা যেন তোমার সন্ধান সফল করেন। এই কথা বলে সে সোনালি পরদার বাইরে এসে প্রেমিকার রমণীয় ভঙ্গিমায় তার রূপের ছবি দেখিয়ে আবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দিলফিগারের মাথা তখনও ঘুরছে, এমন সময় চোপদার আলতোভাবে তার হাত ধরে তাকে প্রেমিকার গৃহ থেকে বার করে দিল। এই তৃতীয়বার প্রেমের সেই পূজারি নিরাশার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকল। দিলফিগার আর তার সাহস খুঁজে পায় না। তার বিশ্বাস জন্মাল, সে পৃথিবীতে জন্মেছে এই নিষ্ফল হতাশ্বাস মৃত্যুর জন্যেই। এখন কি তাহলে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়বে? প্রেমিকার অসহ্য জুলুমের বিষয়ে অভিযোগ করার জন্য আমার একটি হাড়ও যেন আস্ত না থাকে। দিওয়ানার মতো উঠে দাঁড়াল সে, পড়িমরি করে এক গগনচুম্বী পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাল। অন্য কোনো সময় এমন উঁচু পাহাড়ে ওঠার সাহস তার হতই না। কিন্তু এখন প্রাণ দেওয়ার উৎসাহে পাহাড় তার কাছে এক সাধারণ

টিলার মতোই ছোট্ট মনে হল। যেই সে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় সবুজ পোশাক-পরা সবুজ পাগড়ি-বাঁধা এক বৃদ্ধ—তাঁর এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে লাঠি—হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। হাত তুলে থামালেন তাকে। তারপর সাহস দেওয়ার স্বরে বললেন—দিলফিগার,ওরে নির্বোধ,কাপুরুষের মতো এ কী করতে চলেছিস? তুই নিজেকে প্রেমিক বলে দাবি করিস, অথচ জানিস না যে প্রেমের পথের প্রথম ধাপ হল প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। মরদ হ তো বাছা, এভাবে সাহস হারাস না। পুবে একটা দেশ আছে, যার নাম হিন্দুস্তান, সেখানে যা। তোর বাসনা পূরণ হবে।

এই কথা বলে হজরত খিজির মিলিয়ে গেলেন। দিলফিগার এবার শুকরিয়ার (ধন্যবাদের) নমাজ পড়তে বসল। আবার সে নতুন উৎসাহে টাটকা প্রেরণায়— সেই সঙ্গে অলৌকিক সাহায্যের ভরসা পেয়ে—খুশিমনে পাহাড় থেকে নেমে এসে হিন্দুস্তানের দিকে রওনা হল।

কতদিন ধরে কাঁটা-ভরা জঙ্গলে, আগুন-ঝরা মরুভূমিতে হেঁটেছে সে। কঠিন উপত্যকা ও অলঙ্ঘ্য পর্বত হয়ে শেষে সে ভারতের পবিত্র জমিতে এসে হাজির হল। শীতল জলের ঝরনায় যাত্রার দুঃখকষ্ট মুছে গেল তার। তারপর ক্লান্তিতে নদীর তীরে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যার দিকে সে এক তৃণবৃক্ষহীন ময়দানে গিয়ে পৌঁছাল। দেখল অসংখ্য আধমরা ও প্রাণহীন মানুষের দেহ বিনা কবরে পড়ে আছে। মরে পড়ে আছে কত চিল, কাক ও নানা হিংস্র পশু। সারা মাঠ রক্তেলাল। দিলফিগারের হৃদয় কেঁপে উঠল এই ভয়ংকর দৃশ্যে। হায় খোদা, কী বিপদেই না পড়লাম।

মৃত্যুপথযাত্রীদের কাতরানি, কান্না ও ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, হিংস্র পশুগুলির ভাঙা হাড়গোড় ও মাংসপিণ্ড নিয়ে পালানো, এমন বীভৎস হৃদয়বিদারক দৃশ্য দিলফিগার এর আগে কখনো দেখেনি। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, এ নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্র। আর এই মৃতদেহ সব বীর সৈনিকদের। এই সময় কাছেই কাতরানি শুনতে পেল সে। দিলফিগার সেদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, এক দীর্ঘদেহী মানুষ যার বীরত্বপূর্ণ চেহারায় আসন্ন মৃত্যুর বিবর্ণতা স্পর্শ করেছে, মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন। বক্ষঃস্থল থেকে ধারাস্রোতে রক্ত পড়ছে কিন্তু ধারালো তরবারিখানি তার মুষ্টি থেকে চ্যুত হয়নি।

দিলফিগার একখানি ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল, যাতে রক্ত পড়া থামে। জিজ্ঞেস করল—হে সৈনিক, আপনি কে? শুনে মানুষটি চোখ খুললেন ও বীরের মতো বললেন—তুমি কি জান না আমি কে, তুমি কি আজ এই তরবারি চালনা দেখনি? আমি আমার মায়ের সন্তান ও ভারতের সুপুত্র। এই কথা বলতে বলতে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল, বিবর্ণ মুখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল। তাঁর শাণিত তরবারি যেন শত্রু নিধনের আশায় জ্বলজ্বল করে উঠল। দিলফিগার বুঝতে পারল, মানুষটি এই মুহূর্তে তাকে তাঁর শত্রু মনে করছে। সে মৃদু কণ্ঠে বলল—হে বীর, আমি আপনার শত্রু নই। আমি এক দরিদ্র মুসাফির, নিজের দেশ ছেড়ে এসেছি। পথভুলে এদিকে চলে এসেছি। মেহেরবানি করে এখানকার কথা একটু বুঝিয়ে বলুন।

একথা শুনে সেই আহত সৈনিক খুব মধুর কণ্ঠে বললেন—যদি তুমি মুসাফির হও, তাহলে এসে বসো, আমার রক্তে ভেজা পাঁজরাই তোমার আসন হোক। এই দুই আঙুল জমি আমার জন্যে বাকি থেকে গিয়েছে। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কেউ এ জমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আপশোশের কথা কি জানো? তুমি এখানে এমন সময়ে এসেছ যখন তোমার আদর-যত্ন করার অবস্থা আমাদের নেই আর। আমাদের পিতৃপুরুষের দেশ আজ হারালাম আমরা। এখন দেশ

বলতে কিছু নেই আমাদের। কিন্তু (পাশ ফিরে বলতে লাগলেন) আমরা আক্রমণকারী শত্রুকে দেখিয়ে দিয়েছি রাজপুতরা কেমন বীর, কেমন অনায়াসে তারা নিজের দেশের জন্য বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ দিতে পারে। এই আশেপাশে তুমি যে লাশগুলি দেখছ এগুলি হল যাদের এই তরবারি দিয়ে যমলোকে পাঠিয়েছি (স্মিত হেসে) তাদের। আমার দেশ শত্রুর হাতে এখন, কিন্তু আমার আনন্দ এই যে আমি শত্রুর জমিতে প্রাণত্যাগ করছি। (বুকের আঘাতস্থল থেকে ন্যাকড়া বের করে) তুমি কি ন্যাকড়াতে মলম লাগিয়ে দিয়েছ? কেন? রক্ত বার হতে দাও, থামিয়ে কী লাভ? আমি কি নিজের দেশেই গোলামি করার জন্য বেঁচে থাকব? না, এমন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এর চেয়ে ভালো মৃত্যু কী আছে বলতে পার মুসাফির?

বীরপুরুষের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল, শরীর শিথিল হয়ে পড়ল। এত বেশি রক্ত পড়ল যে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে একটি বিন্দু ঝরে পড়ছে। শেষে দেহে আর কোনো সাড় রইল না, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল, বীর সৈনিকের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। দিলফিগার ভাবল, বীরপুরুষের দেহে আর প্রাণ নেই। এমন সময় সেই মৃত্যুপথযাত্রী মৃদু স্বরে বলে উঠলেন— ভারতমাতার জয় হোক। এর সঙ্গে তার বুক থেকে রক্তের শেষ বিন্দু ঝরে পড়ল। এক সাচ্চা দেশপ্রেমী ও দেশভক্ত দেশভক্তির কাজ সম্পূর্ণ করল। এই দৃশ্যে অভিভূত হয়ে গেল দিলফিগার। তার প্রাণ বলে উঠল, অসম্ভব। এই রক্তবিন্দুর চেয়ে দামি জগতে অন্য কোনো বস্তুই হতে পাবে না। সে তক্ষুনি রক্তের সেই বিন্দু হাতে তুলে নিল এবং সেই রাজপুতের বীরত্বে মুগ্ধ অবস্থায় নিজ দেশের উদ্দেশে রওনা হল। পথে কত কষ্ট স্বীকার করল সে, শেষকালে সে সমৃদ্ধ ও সফল হয়ে ফিরে এসেছে। সে দরবারে হাজির হতে চায়। দিলফরেবও তাকে সেই মুহূর্তে হাজির হওয়াব হুকুম দিল। যথারীতি পরদার আড়াল থেকে বলল— দিলফিগার, এবার তুমি অনেক দিন পবে ফিরে এসেছ। দাও, দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু কী এনেছ।

দিলফিগার মেহেদি-রাঙা হাতের চেটোয় চুম্বন করে রক্তের সেই বিন্দু তার ওপর রেখে দিয়ে পুরো কাহিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বলে শোনাল। যখন বলা শেষ হল তখুনি হঠাৎ সরে গেল সোনালি পরদা। দিলফিগারের সামনে সৌন্দর্যের সাজানো দরবার আবির্ভূত হল। সেখানে প্রত্যেকটি সুন্দবী জুলেখার চেয়েও সুন্দর। তার মধ্যে সেনালি মসনদের সৌন্দর্য ম্লান করে তার উপর বসে আছে দিলফরেব। যৌবনের এই মায়াপুরী দেখে দিলফিগার চমৎকৃত ও স্তব্ধ হয়ে ছবির মতো নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। দিলফরেব মসনদ থেকে উঠে দাঁড়াল, কয়েক পা এগিয়ে তাকে দু হাতে আলিঙ্গন করল। গায়িকারা গান ধরল আনন্দে। দরবারিরা দিলফিগারকে প্রণতি জানাল। চাঁদ-সূর্যের চেয়ে মহত্তর সম্মান দেখিয়ে তাকে মসনদে বসিয়ে দিল। গানের মোহনধ্বনি স্তব্ধ হলে দিলফরেব উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে দিলফিগারকে বলল— হে জাঁনিসাব প্রেমিক দিলফিগার, আমার অনুরাগ গ্রহণ করো। খোদা আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তিনি তোমায় সফল ও ঐশ্বর্যবান করেছেন। আজ থেকে তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার অধীনা সেবিকা।

এই বলে একটি রত্নখচিত মঞ্জুষা আনিয়ে তার থেকে একটি ফলক বার করল। তাতে লেখা ছিল—'রক্তের যে শেষ বিন্দু দেশরক্ষার জন্য ক্ষয়িত হয় সেই হল দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু।'

(দুনিয়া কা সবসে অনমোল রতন/১৯০৭) অনুবাদ মহাদেবপ্রসাদ সাহা

বড়ো ঘরের মেয়ে

বেণীমাধব সিংহ গৌরীপুর গ্রামের জমিদার। তাঁর পিতামহ কোনো এককালে বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের ঘাট বাঁধানো সব দিঘি আর মন্দির, যেগুলি এখন মেরামত করাও দুঃসাধ্য, সেসব তাঁরই কীর্তি। লোকে বলে তাঁর দরজায় নাকি হাতি বাঁধা থাকত। আজ সে জায়গায় একটি বুড়ো মোষ বাঁধা, শরীরে যার ক-খানা হাড়-পাঁজর ছাড়া কিছুই বাকি নেই। তবে দুধটা বোধ হয় খুব দেয়, কারণ কেউ না কেউ একটা পাত্র নিয়ে চৌপর দিন ওর সঙ্গে লেগে থাকে। বেণীমাধব সিংহ তাঁর অর্ধেকের উপর সম্পত্তি উকিলদের চরণে উৎসর্গ করে বসে আছেন। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় এক হাজারের বেশি নয়। জমিদার মশাইয়ের দুই ছেলে। বড়োটির নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। অনেকদিনের পরিশ্রম আর চেষ্টাচরিত্রের পর সে বিএ ডিগ্রি লাভ করেছে। একটি অফিসে এখন চাকরি করে। ছোটো ছেলে লালবিহারী সিংহ—দোহারা চেহারার শৌখিন যুবক। ভরাট মুখ, চওড়া বুক। মোষের টাটকা দুধ দুসেরটাক সে সকালে ঘুম থেকে উঠে খেয়ে থাকে। দাদা শ্রীকণ্ঠ সিংহের অবস্থাটা ঠিক একেবারে উলটো। এসব চোখে লাগার মতো গুণাবলিকে সে বিএ—এ দুটি অক্ষরের পায়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে। এই অক্ষর দুটি তার দেহটিকে দুর্বল, মুখমণ্ডলকে শ্রীহীন করে দিয়েছে। কবিরাজি শাস্ত্রে তাই তার বিশেষ রুচি। আয়ুর্বেদিক ওষুধে তার বেশি আস্থা। সকাল সন্ধেয় তার ঘর থেকে খলনুড়ির সুরেলা ও মধুর শব্দ প্রায়ই শোনা যায়। লাহোর আর কলকাতার বৈদ্যদের সঙ্গে তার খুব চিঠি লেখালেখি চলে।

ইংরেজি ডিগ্রিটির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের সামাজিক প্রথাগুলোর প্রতি শ্রীকণ্ঠ সিংহ মোটেই অনুরক্ত নয়। বরং প্রায়ই সে খুব জোরগলায় সেসবের নিন্দা করে ও ধিক্কার দিয়ে থাকে। এজন্যই গাঁয়ে তার খুব সম্মান। দশহরার সময় সে খুব উৎসাহ নিয়ে রামলীলায় অংশগ্রহণ করে, নিজে কোনো না কোনো চরিত্রে পার্ট নিয়ে থাকে। সেই ছিল গৌরীপুরের রামলীলার জন্মদাতা। সনাতন হিন্দু সভ্যতার গুণগান করা তার ধর্মনিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। একান্নবর্তী পরিবারের তো সে ছিল একমাত্র উপাসক। আজকাল যৌথ পরিবারে মিলেমিশে থাকতে মেয়েদের যে অরুচি তাকে সে জাতি এবং দেশ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর বলে মনে করত। এজন্যই গ্রাম্যললনারা তার সমালোচনা করত। কেউ কেউ তো তাকে তাদের শত্রু বলে ভাবতেও সংকোচ বোধ করত না। তার নিজেরই পত্নীর সঙ্গে এ ব্যাপারে তার মতান্তর ছিল। তার কারণ এ নয় যে, মেয়েটি তার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর কিংবা ভাসুরকে ঘৃণা করত; বরং তার সিদ্ধান্ত হল অনেক কিছু সহ্য করার, অনেক কিছু গায়ে না মাখবার পরেও যদি সংসারে আর সবার সঙ্গে বনিবনা না হয়, তাহলে রোজকার খিটিমিটিতে জীবনটাকে নষ্ট করার চাইতে নিজের হাঁড়ি আলাদা করে নেওয়াই ভালো।

আনন্দী বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা ছিলেন ছোটোখাটো এক তালুকদার। বিরাট বাড়ি, একটি হাতি, তিনটি কুকুর, বাজপাখি, শিকরে পাখি, ঝাড়লণ্ঠন, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আর ধারদেনা ইত্যাদি যা কিছু একজন প্রতিষ্ঠাবান তালুকদারের ভোগ করার কথা তা সবই তাঁর ছিল। নাম ভূপ সিংহ। বড়ো উদারহৃদয়, প্রতিভাশালী পুরুষ। তবে দুর্ভাগ্যবশত ছেলে নেই একটিও। সাত-সাতটি মেয়ে হয়েছিল আর ভগবৎকৃপায় সব কটিই বেঁচেবর্তে রয়েছে। প্রথমে উৎসাহের বশে তো তিনি প্রাণ খুলে তিনটির বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন পনেরো-বিশ হাজার টাকা দেনা ঘাড়ে চাপল, তখন হুঁশ হল, হাত গুটিয়ে নিলেন। আনন্দী তাঁর চতুর্থ কন্যা। রূপে, গুণে বোনেদের সকলের সেরা ছিল সে। তাই তালুকদার ভূপ সিংহ তাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই এমন ঘটে যে, সুন্দর সন্তানই তার মা-বাবার ভালোবাসা বেশি পায়। আনন্দীর বিয়ে কোথায় দেবেন এই ছিল তালুকদার মশাইয়ের প্রধান দুশ্চিন্তা। ঋণের বোঝা আরও বাড়ুক এ যেমন চাইতেন না, আবার এও চাইতেন না যে মেয়েটা নিজেকে হতভাগিনী ভাবুক। একদিন কী একটা ব্যাপারে চাঁদার টাকা চাইতে শ্রীকণ্ঠের আচার-ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, ধুমধাম করে তারই সঙ্গে আনন্দীর বিয়ে দিয়ে দেন।

আনন্দী তার নতুন সংসারে এসে দেখল এখানকার হালচাল বেশ অন্যরকম। যে রকম জাঁকজমকে ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত এখানে তার লেশমাত্রও নেই। হাতিঘোড়া দূরে থাক, একটা সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা সুন্দর গোরুর গাড়ি পর্যন্ত নেই। রেশমি চটিজোড়া এনেছিল সঙ্গে করে, কিন্তু এখানে তা পরে হাঁটবার মতো বাগান কই। ঘরে জানালা পর্যন্ত নেই; মেঝেতে নেই ফরাশ, দেওয়ালে নেই ছবি। এ একেবারে সাদাসিধে গেঁয়ো গেরস্থ বাড়ি। আনন্দী কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে এতটাই মানিয়ে নিল যেন বিলাসিতার জিনিস সে জীবনে চোখেই দেখেনি।

দুই

একদিন দুপুরবেলা লালবিহারী সিংহ দুটি পাখি নিয়ে এসে বউদিকে বলল—চটপট মাংস রেঁধে দাও তো, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আনন্দী ইতিমধ্যেই রান্নাবান্না সেরে তার পথ চেয়ে বসেছিল। এখন আবার নতুন পদ রাঁধতে বসল। পাত্রে দেখে ঘি পো-টাকের বেশি নেই। বড়ো লোকের ঝি, হিসেব করে খরচটরচ করা স্বভাবে নেই। সে সব ঘি টুকুই মাংসে ঢেলে দিল। লালবিহারী খেতে বসে দেখল ডালে ঘি পড়েনি। জিজ্ঞেস করল, ডালে ঘি দাওনি যে?

আনন্দী বলল—ঘি সবটা মাংসে দিয়ে ফেলেছি।

লালবিহারী চড়াগলায় বলে উঠল—এই তো পরশু মাত্র ঘি এল, এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে গেছে?

আনন্দী উত্তর দিল—আজকে তো শুধু পোয়াটাক ঘি বাকি ছিল। ওর সবটাই আমি মাংসে দিয়ে দিয়েছি।

শুকনো কাঠে আগুন যেমন খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে, ক্ষুধায় কাতর মানুষও ঠিক তেমনি তুচ্ছ কথায় দপ করে জ্বলে ওঠে।

বউদির এই ধৃষ্টতা লালবিহারীর সহ্য হল না। খেঁকিয়ে বলে উঠল—ইস্, বাপের বাড়িতে যেন ঘির নদী বয়ে যাচ্ছে।

মেয়েরা গালাগালি সয়ে যায়, মারধোরও ভুলে যায়। কিন্তু বাপের বাড়ির নিন্দে তারা কিছুতেই সইতে পারে না। আনন্দী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—হাতি মরলেও লাখ টাকা! ও বাড়িতে রোজ এইটুকু ঘি নাপিত-বেহারাদের ভোগেই যায়।

লালবিহারী রেগে আগুন হয়ে উঠল, থালাটাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলল, তারপর বলল—ইচ্ছে করছে জিভটা টেনে উপড়ে নিই।

আনন্দীরও রাগ হল। মুখ লাল হয়ে উঠল তার, বলল—উনি থাকলে আজ মজাটা টের পাইয়ে দিতেন।

অশিক্ষিত, উদ্ধত রাজপুত নন্দন আর থাকতে পারল না। তার নিজের বউটি ছিল সাধারণ এক জমিদার ঘরের মেয়ে। যখনই মন চাইত, তাকে দু-চার ঘা মেরে বসত সে। খড়ম তুলে সে আনন্দীর দিকে জোরে ছুঁড়ে মারল, বলল—যার দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, তাকেও দেখে নেব, তোমাকেও।

আনন্দী হাত দিয়ে খড়ম ঠেকায়। মাথাটা বেঁচে গেল, কিন্তু আঙুলে বেশ চোট লাগল। রাগে পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে সে তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েদের যা কিছু শক্তি আর সাহস, মান ও মর্যাদা সব স্বামীকে ঘিরে। স্বামীর শক্তি ও পৌরুষেরই অহংকার তাদের। প্রচণ্ড রাগকে কোনোমতে বুকে চেপে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল আনন্দী।

তিন

শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রতি শনিবার বাড়ি আসত। ঘটনাটা ঘটল বৃহস্পতিবার। দু দিন ধরে আনন্দী গোঁসা ঘরে রইল, কিচ্ছু খায়নি, ছোঁয়নি, স্বামীর আসার পথ চেয়ে রইল। শেষে শনিবার দিন যথারীতি সন্ধের সময় শ্রীকণ্ঠ বাড়ি এল। বাইরে বসে কিছু একথা-সেকথা, দেশ, কাল, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু খবরাখবর এবং কিছু মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এসব কথাবার্তা রাত দশটা অবধি চলল। গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা এসব আলোচনায় এতই মজা পান যে তাঁরা খাওয়াদাওয়াই ভুলে যান। ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া শ্রীকণ্ঠের পক্ষে মুশকিল হয়। এ দু-তিন ঘন্টা আনন্দী খুব ছটফট করে কাটায়। শেষে কোনোমতে খাওয়ার সময় হয়। আড্ডা ভাঙে। শ্রীকণ্ঠকে একা পেয়ে লালবিহারী বলল, দাদা, আপনি বউদিকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবেন যেন মুখ সামলে কথাটথা বলে, নইলে একদিন অনর্থ ঘটে যাবে।

বেণীমাধব সিংহ ছোটো ছেলের পক্ষ নিয়ে বলেন—হ্যাঁ, ব্যাটাছেলেদের মুখে মুখে কথা বলার স্বভাব বউ-ঝিদের মোটেই ভালো নয়।

লালবিহারী—সে বড়োলোকের মেয়ে হতে পারে, তা বলে আমরাও কিছু একটা চাষাভুষো নই।

শ্রীকণ্ঠ উদ্‌বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল—তা, হয়েছে কী?

লালবিহারী বলল—কিছু না, এমনি শুধু শুধু গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। বাপের বাড়ির গুমোরে তো আমাদের মনিষ্যি বলে গেরাহ্যি করে না।

শ্রীকণ্ঠ খাওয়াদাওয়া সেরে আনন্দীর কাছে এল। আনন্দী গুম হয়ে বসেছিল। এ মহাশয়টিও একটু কড়া মেজাজের। আনন্দী জিজ্ঞেস করে—মন ভালো তো?

শ্রীকণ্ঠ উত্তর দেয়—হ্যাঁ, খুব ভালো, কিন্তু তুমি আজ সংসারে এসব কী উৎপাত বাধিয়ে বসে আছ?

আনন্দীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, রাগে সর্বশরীরে আগুন জ্বলে ওঠে তার। বলে—তোমার কাছে এসব ঘর-জ্বালানি কথা যে লাগিয়েছে তাকে পেলে মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতাম।

শ্রীকণ্ঠ—মেজাজ এত গরম করছ কেন? কী হয়েছে বলো না।

আনন্দী—কী আর বলব। এ আমার কপালের ফের। তা নইলে একটা গোঁয়ার ছোঁড়া, যার চাপরাশিগিরি করারও এলেম নেই, সে কিনা আমাকে খড়ম দিয়ে মেরে এভাবে বুক ফুলিয়ে চলে।

শ্রীকণ্ঠ—সব কিছু খুলে বলো তবে তো বুঝি। আমি তো এসব কিছুই জানি না।

আনন্দী—পরশু তোমার আদুরে ভাইটি আমাকে মাংস রাঁধতে বলেছিল। ঘির ভাণ্ডে পো-খানেকের বেশি ঘি ছিল না। যেটুকু ছিল আমি সবটা মাংসে দিয়ে ফেলেছিলাম। খেতে বসে আমাকে বলে—ডালে ঘি দাওনি কেন? ব্যস, এনিয়ে আমার বাপের বাড়ি তুলে যা তা বলতে লাগল। আমি আর থাকতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, ও বাড়িতে এটুকুন ঘি তো নাপিত-বেহারারা খেয়ে থাকে, কারও চোখেই পড়ে না। ব্যস, একথাটা শোনামাত্র বদমাশটা আমাকে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছে। হাত দিয়ে যদি না ঠেকাতাম, তাহলে মাথাটাই ফেটে যেত। ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি যা বললাম তা সত্যি কি মিথ্যে।

শ্রীকণ্ঠের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। বলল—এতদূর গড়িয়েছে। ছোঁড়াটার এত সাহস!

আনন্দী মেয়েদের স্বভাবমতো কাঁদতে শুরু করল, কারণ চোখের জল তো ওদের চোখের পাতায়। শ্রীকণ্ঠ এমনিতে খুবই ধৈর্যশীল, শান্ত পুরুষ। সহজে সে রাগত না। তবে মেয়েদের চোখের জল জল হলেও তা পুরুষের ক্রোধাগ্নিকে জ্বালিয়ে তুলতে তেলের কাজ করে। সারাটা রাত সে এপাশ ওপাশ করে কাটাল। দুশ্চিন্তায় দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। সকালে বাবার কাছে গিয়ে বলল—বাবা, এ বাড়িতে তো আর আমার থাকা চলে না।

এ ধরনের বিপ্লবাত্মক কথা বলার জন্য শ্রীকণ্ঠ কতবার তার বন্ধুদের একহাত নিয়েছে, আজ স্বয়ং তাকেই নিজমুখে এ কথাগুলি বলতে হল, এ ভারী দুর্ভাগ্যের কথা। সত্যি, অপরকে উপদেশ দেওয়া কত সহজ।

বেণীমাধব সিংহ হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কেন? কেন?

শ্রীকণ্ঠ—নিজের মানসম্মান নিয়েও একটু ভাবনাচিন্তা করতে হয় আমাকে, সেইজন্যই। আপনার সংসারে এখন অন্যায় আর জেদাজেদির বেশ প্রকোপ চলছে দেখতে পাই। যাদের উচিত গুরুজনদের সম্মান করা, তারা তাদের মাথায় চড়ে বসছে। আমাকে অন্যের চাকরি করতে হয়, বাড়িতে থাকি না। এখানে আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ির মেয়েদের ওপর খড়ম আর জুতো বৃষ্টি হয়। কড়া কথা শোনাক, সে ঠিক আছে। চাই-কি কেউ এক কথার জায়গায় দু-কথা বলুক তাও আমি সহ্য করতে পারি। কিন্তু আমার উপর লাথি ঘুঁষি চলবে আর আমি রা-টি কাড়ব না—এ কেমন করে চলে, বলুন?

বেণীমাধব সিংহ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শ্রীকণ্ঠ চিরকাল তাঁকে মান্য করে এসেছে। তার এই রুদ্রমূর্তি দেখে বৃদ্ধ জমিদার মশায় অবাক হয়ে গেলেন। তিনি শুধু বললেন—বাবা, তুমি

বুদ্ধিমান হয়ে এসব কথা বলছ? স্ত্রীজাতি এভাবেই ঘরে সর্বনাশ ডেকে আনে। ওদের খুব বেশি লাই দেওয়া ঠিক নয়।

শ্রীকণ্ঠ—সেটা আমি জানি। আপনাদের আশীর্বাদে অতটা মূর্খ আমি নই। আপনি নিজেই তো জানেন আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ গাঁয়ের কয়েকটি সংসারকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যে মহিলার মান-সম্ভ্রমের জন্য আমি ঈশ্বরের দরবারে দায়ি, তার প্রতি এমন ঘোর অবিচার ও পশুর মতো ব্যবহার আমি সয়ে যাব কেমন করে? আপনি বিশ্বাস করুন, আমি যে লালবিহারীকে এর জন্য কোনো শাস্তি দিচ্ছি না সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এবার বেণীমাধব সিংহও গরম হয়ে উঠলেন। এ ধরনের কথা আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। বললেন—লালবিহারী তোমার ভাই। ও যদি কোনো ভুলচুক করে, কানটা ধরে শাসন করবে, তাই বলে—

শ্রীকণ্ঠ—লালবিহারীকে আমি ভাই মনে করি না।

বেণীমাধব সিংহ—বউ বলেছে বলে?

শ্রীকণ্ঠ—আজ্ঞে না, ওর ক্রূরতা আর অবিবেচনার জন্য।

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ। জমিদার মশাই ছেলের ক্রোধ শান্ত করতে চাইলেন বটে, কিন্তু মানতে চাইছিলেন না যে লালবিহারী অনুচিত কিছু করেছে। এরই মধ্যে পাড়ার আরও ক-জন ভদ্রলোক হুঁকো-কল্কেকে টানার ছুতোয় এসে হাজির। বউয়ের কথায় শ্রীকণ্ঠ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে চলেছে শুনে কয়েকজন মহিলার তো খুবই উল্লাস হল। উভয় পক্ষের মধুর বাণী শোনার জন্যে ওদের মন ছটফট করতে লাগল। আর এই পরিবারের নীতিসংগত চালচলন দেখে মনে মনে জ্বলেপুড়ে মরত এমন কিছু কুচক্কুরে মানুষও গাঁয়ে ছিল। তারা বলাবলি করত, শ্রীকণ্ঠ বাপের সামনে মাথা তোলে না, তো ওটা আবার পুরুষ কীসের। সে এত এত লেখাপড়া করেছে, বইয়ের পোকা হয়েছে। বেণীমাধব সিংহ যে শ্রীকণ্ঠের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না, সেটা তাঁর মূর্খামি। এই সব মহানুভবদের শুভকামনা আজ পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সব গুটিগুটি এসে বসতে লাগল—কেউ হুঁকো খাওয়ার অছিলায়, কেউবা খাজনার রসিদ দেখানোর অজুহাতে। বেণীমাধব সিংহ প্রবীণ ব্যক্তি। এসব মনোভাব টের পেতে তাঁর দেরি হল না। তিনি ঠিক করলেন, যাই হোক না কেন, এই পাজি লোকগুলো খুশিতে হাততালি দেবে, তা তিনি হতে দেবেন না। তাড়াতাড়ি গলা নরম করে বলেন—বাবা, আমি তো আর তোমার থেকে আলাদা নই। তোমার যা মন চায় করো, ছেলেটা সত্যিই এবার অন্যায় করে ফেলেছে।

এলাহাবাদের অনভিজ্ঞ ক্রুদ্ধ গ্র্যাজুয়েট কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পারল না। ডিবেটিং ক্লাবে আপন যুক্তিতে গোঁ ধরে থাকা তার স্বভাব। এসব ঘোরপ্যাঁচ সে কী করে বুঝবে? বাবা যে উদ্দেশ্যে কথার মোড় ঘোরালেন সেটা সে আন্দাজ করতে পারল না, বলল—লালবিহারীর সঙ্গে এ বাড়িতে আমি আর বাস করতে পারব না।

বেণীমাধব—বাব, যারা বুদ্ধিমান, তারা মূর্খের কথায় কান দেবে কেন? লালবিহারী গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে। ওর যা কিছু ভুলচুক হয়েছে, তুমি বড়ো, ওকে ক্ষমা করে দাও।

শ্রীকণ্ঠ—ওর এই শয়তানি আমার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। হয় সে থাকবে এই বাড়িতে, না হয় আমি। ও যদি আপনার বেশি প্রিয়পাত্র হয়, তাহলে আমাকে বিদায় দিন। আমি নিজের দায়

নিজের ঘাড়ে নেব। যদি আমাকে আটকাতে চান, তাহলে ওকে বলে দিন, ও যেখানে খুশি চলে যাক। ব্যস, এই আমার শেষকথা।

লালবিহারী সিংহ দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাদার কথাগুলি শুনছিল। দাদাকে সে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। শ্রীকণ্ঠের সামনে খাটিয়ায় বসে হুঁকো টানে, কিংবা পান খায় এমন সাহস তার কখনো হত না। এতটা সম্মান সে বাপকেও দেখাত না। শ্রীকণ্ঠও তাঁকে কম ভালোবাসত না। জ্ঞানত কোনোদিন সে লালবিহারীকে একটা ধমক পর্যন্ত দেয়নি। এলাহাবাদ থেকে যখনই বাড়ি এসেছে, ওর জন্য কোনো না কোনো জিনিস নিয়ে এসেছে সে। সেবার একজোড়া মুগুর বানিয়ে দিয়েছিল তাকে। গত বছর নাগপঞ্চমীর দিনে লালবিহারী যখন তার থেকে দেড়গুণ তাগড়াই এক জোয়ানকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, তখন আখড়ার মধ্যিখানেই ছুটে গিয়ে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। খুচরো পয়সার হরিলুট দিয়েছিল পাঁচ টাকার। অমন দাদার মুখ থেকে এমন মর্মান্তিক কথাগুলো শুনে লালবিহারীর বড়ো কষ্ট হল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সে তার কাজের জন্য মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দাদা আসার একদিন আগে থেকে ওর বুক কাঁপছিল না জানি দাদা কী বলবেন ভেবে। ভাবছিল, আমি ওঁর সামনে যাব কী করে, ওঁর সঙ্গে কথা বলব কী করে, ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকাব কী করে। ভেবেছিল দাদা তাকে ডেকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেবেন। সে আশার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটল, দাদাকে আজ সে দেখল যেন নির্দয়তার প্রতিমূর্তি। সে মূর্খ, কিন্তু তার মন বলছে, দাদা তার প্রতি সুবিচার করছেন না। যদি শ্রীকণ্ঠ তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে দু-চারটে কড়া কথা বলত, কিংবা, তাই-বা-কেন, দু-চারটে চড়চাপড়ও মারত; তাহলেও বোধ হয় ওর এতটা কষ্ট হত না। দাদা যে বলল আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না, সেটা লালবিহারীর মন ভেঙে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভেতর এল সে। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় বদলাল, চোখ মুছে ফেলল যাতে কেউ টের না পায় যে সে কেঁদেছে। তারপর আনন্দীর ঘরের দরজার সামনে এসে বলল—বউদি। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন উনি আর আমার সঙ্গে এ বাড়িতে থাকবেন না। উনি আর আমার মুখ দেখতে চান না। বউদি, আমি চললাম। দাদাকে আর এমুখ দেখাব না। তোমার পায়ে যা কিছু অপরাধ করেছি মাপ করে দিয়ো, বউদি।

বলতে বলতে লালবিহারীর গলা ধরে এল।

চার

লালবিহারী যখন মাথা হেঁট করে আনন্দীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, তক্ষুনি শ্রীকণ্ঠ সিংহও চোখমুখ লাল করে বাইরে থেকে এল। ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যেন তার ছায়াও এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

লালবিহারীর নামে ঝোঁকের মাথায় নালিশ করে বসে আনন্দী তখন মনে মনে আপশোশ করছিল। এমনিতে তার মনে যথেষ্ট মায়াদয়া আছে। সে মোটেই ভাবতে পারেনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। মনে মনে স্বামীর উপর তার রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে এতে সে কেন এতটা গরম হয়ে উঠল। এ ভয়টাও তাকে পেয়ে বসেছিল যে, তাকে এখন যদি এলাহাবাদে গিয়ে থাকতে বলে তাহলে সে কী করে কী করবে। এরই মধ্যে যখন লালবিহারীকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে শোনে যে আমি চলে যাচ্ছি, আমার যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো, তখন তার রাগ যেটুকু বা

বাকি ছিল তাও জল হয়ে গেল। সে কাঁদতে শুরু করে। মনের ময়লা ধুয়ে সাফ করে ফেলতে চোখের জলের চাইতে ভালো আর কী আছে?

শ্রীকণ্ঠকে দেখে আনন্দী বলে উঠল—ঠাকুরপো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছে।

শ্রীকণ্ঠ—তা আমি কী করব?

আনন্দী—যাও, ওকে ভেতরে ডেকে আনো। আমার জিভে আগুন লাগুক। এ আমি কোন ঝামেলা বাধিয়ে বসলাম।

শ্রীকণ্ঠ—আমি পারব না।

আনন্দী—পরে আপশোশ করবে। ওর মনে খুব কষ্ট হয়েছে, আবার কোথাও চলেটলে না যায়।

শ্রীকণ্ঠ ওঠে না। ইতিমধ্যে লালবিহারী আবার বলে—বউদি, দাদাকে আমি এখান থেকে প্রণাম জানাচ্ছি। উনি আমার মুখ দেখতে চান না, তাই আমিও আমার মুখ ওঁকে দেখাব না।

বলেই লালবিহারী ফিরে চলে। দ্রুতপায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আনন্দী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে। লালবিহারী ফিরে তাকায়, চোখে জল নিয়ে বলে—যেতে দাও আমাকে।

আনন্দী—যাচ্ছ কোথায়?

লালবিহারী—এমন জায়গায় যেখানে কেউ আমরা মুখ দেখতে পাবে না।

আনন্দী—আমি তোমাকে যেতে দেব না।

লালবিহারী—আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই।

আনন্দী—আর এক পা এগোও তো আমার মাথা খাও।

লালবিহারী—যদি জানি আমার সম্বন্ধে দাদার মনে আর কোনো নালিশ নেই, তবেই আমি ফিরব, নইলে আমি এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।

আনন্দী—ঈশ্বর সাক্ষী, তোমার উপর আমার মনে একটুও রাগ নেই।

এবার শ্রীকণ্ঠেরও হৃদয় গলে যায়। বাইরে এসে লালবিহারীকে বুকে টেনে নেয় সে। দু-ভাই খুব কাঁদে। ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে লালবিহারী বলে—দাদা, আর কখনো যেন বলবেন না যে আমি তোর মুখ দেখব না। এছাড়া আর যে সাজা আপনি দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেব।

কাঁপা গলায় শ্রীকণ্ঠ বলে—লল্লু, ও সব কথা একেবারে ভুলে যা। সব চুকেবুকে গেছে। ভগবান করুন, এমন দিন যেন আর না আসে।

বেণীমাধব সিংহ বাইরে থেকে আসছিলেন। দু-ভাইকে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন—বড়ো ঘরের বেটিরা তো এমনিই হয়ে থাকে, যদি কিছু বিগড়ে যায়, তো তারা ঠিক সামলে নেবে।

গাঁয়ে এ বৃত্তান্ত যারই কানে যায় সে আনন্দীর উদারতার প্রশংসা করে বলে—হবে না, বড়ো ঘরের মেয়ে কি শুধু মুখের কথা!

(বড়ে ঘর কী বেটী / ১৯১০) অনুবাদ ননী শূর

অভিশাপ

মুনশি রামসেবক ভুরু কুঁচকে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন—এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাও ভালো। সচরাচর এরকম যত নিমন্ত্রণ মৃত্যুকে পাঠানো হয় মৃত্যু যদি সে সবই গ্রহণ করত তাহলে সংসার বোধ হয় এতদিনে উজার হয়ে যেত।

চাঁদপুর গ্রামের এক অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন মুনশি রামসেবক। বড়োলোকদের সবরকম গুণই তার মধ্যে ছিল। মানবচরিত্রের দুর্বলতাগুলোই ছিল তার জীবনের অবলম্বন। প্রতিদিন মুনসেফ কোর্টের হাতায় একটা নিমগাছের নীচে একটা ভাঙা চৌকির উপর বস্তাখানেক কাগজ নিয়ে তাকে বসে থাকতে দেখা যেত। কেউ কোনো দিন তাকে কোনো এজলাশে দাঁড়িয়ে সওয়াল কিংবা কোনো মামলার তদারকি করতে দেখে নি। তবু সবাই তাকে মোক্তার সাহেব বলে ডাকত। ঝড় হোক, বাদল হোক, শিলাবৃষ্টি হোক, ওই জায়গা থেকে মোক্তার সাহেব নড়ে বসতেন না। যখন তিনি কাছারির দিকে রওনা দিতেন তখন গ্রামের লোক দলে দলে তার পিছু নিত। চারদিক থেকে যেন তার উপর বিশ্বাস ও ভালোবাসা বর্ষিত হত। সবাই জানত—তার জিহ্বায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান। একে ওকালতি বা মোক্তারি যাই বলা যাক না কেন, আসলে এসবই ছিল কুলমর্যদার ব্যাপার। আয় খুব একটা হত না। রুপোর টাকার কথা কী আর বলব, সময় সময় তামার মুদ্রাও নির্ভয়ে তার কাছে আসতে তিন বার হোঁচট খেত। মুনশিজির আইনের জ্ঞান সম্পর্কে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে কোনো ডিগ্রি না থাকায় তার অসুবিধা ছিল।

তা যাই হোক, তার এই পেশা ছিল কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। আসলে তার জীবিকার মুখ্য অবলম্বন ছিলেন আশপাশের বিধবারা, যাদের খাওয়াপড়ার কোনো অভাব না থাকলেও দেখাশোনার লোকের অভাব ছিল। আব ছিলেন সোজা-সরল ধনী বৃদ্ধরা যারা তাকে বিশ্বাস করতেন। বিধবারা তাদের টাকা তার কাছে জমা রাখতেন। বৃদ্ধরা কর্তব্যহীন সন্তানদের ভয়ে তাদের ধন তার হাতে সঁপে দিতেন। তবে টাকা একবার তার হাতে গেলে আবার বেরিয়ে আসার কথা ভুলে যেত। প্রয়োজনে মুনশিজি সময় সময় টাকা ধার কবতেন। তা, ধার না করে কেই বা আর চালাতে পারে? সন্ধ্যায় শোধ করে দেবেন বলে টাকা নিতেন, কিন্তু সেই সন্ধ্যা আর ফিরে আসত না। মোট কথা, ধার করে শোধ দেওয়া মুনশিজি শেখেননি। এরকমটাই ছিল তার কুলপ্রথা। এইসব ঝামেলা প্রায়শ মুনশিজির সুখশান্তিতে বিঘ্ন ঘটাত। আইন কিংবা আদালতের ভয় তিনি করতেন না। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মোকাবিলা করা আর জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা ছিল একই ব্যাপার। তবু যদি কোনো দুষ্ট লোক তার সঙ্গে লাগতে চাইত, তার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করত কিংবা তার মুখের উপর দুটো কথা শুনিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হত, তাহলে মুনশিজির প্রাণে

বড়োই আঘাত লাগত। তবে এ জাতীয় দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই থাকত। সব জায়গাতেই এমন লোক দেখা যায় যারা অন্যকে ছোটো করতে পারলে নিজেরা আনন্দ পায়। এরকম লোকের উসকানিতেই কখনও কখনও ছোটোলোকও মুনশিজির সঙ্গো ঝগড়ায় লেগে পড়ত। নয়তো এক আনাজওয়ালির এত সাহস কী করে হবে যে সে বাড়ি এসে মুনশিজির মুখের উপর কথা শুনিয়ে যায়! মুনশিজি ছিলেন তার পুরনো খদ্দের। বছরের পর বছর তার কাছ থেকে তিনি তরিতরকারি কিনেছেন। দাম না দিলেও আনাজওয়ালিকে খুশি রাখতেই হত আর দেরিতে হোক কিংবা তাড়াতাড়ি হোক, দাম সে পেত। তবু ওই মুখ-আলগা আনাজওয়ালি দু বছরেই ঘাবড়ে গেল। কটা মাত্র পয়সার জন্য কিনা প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোককে অপমান করে বসল। বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুনশিজি যদি মৃত্যুকে আহ্বান জানাতে বদ্ধপরিকর হন তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

দুই

এই গ্রামেই মুঙ্গা নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী বাস করত। তার স্বামী বর্মা মুলুকে পলটনে হাবিলদারের কাজ করত আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তার ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সরকারের তরফে মুঙ্গাকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়। বিধবা মানুষ, তারপর আবার দিনকাল খারাপ। বেচারি সব টাকাটাই মুনশি রামসেবকের কাছে গচ্ছিত রেখে দিল। মাসে মাসে কিছু কিছু চেয়ে নিয়ে খরচ চালাত।

মুনশিজি এই কর্তব্য বেশ কয়েক বছর নিষ্ঠার সঙ্গো পালন করলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন মুঙ্গা মরল না তখন মুনশিজির এই চিন্তা হল—তাহলে কি স্বর্গযাত্রার জন্য এই টাকার অন্তত আধেকটাও মুঙ্গা রেখে যাবে না? একদিন তাই তিনি মুঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুঙ্গা, তুমি কি মরবে না? সোজাসুজি বলে দাও তাহলে আমিই আমার মরার ফিকির করি। সেই দিনই মুঙ্গার চোখ খুলল। তার ঘুম ছুটে গেল। সে বলল—আমার হিসাব বুঝিয়ে দাও। হিসাবের চিঠা তৈরি করাই ছিল। জমার ঘর একেবারে শূন্য। মুঙ্গা খুব শক্ত করে মুনশিজির হাত ধরে বলল—আমার আড়াইশো টাকা এখনও তোমার কাছে রয়েছে। এক পয়সাও আমি ছাড়ব না।

কিন্তু অসহায়ের ক্রোধ হল পটকার আওয়াজের মতো। বাচ্চারা ভয় পায় বটে তবে আসলে কিছু হয় না। আদালতে যাবার মতো জোর তার ছিল না, কারণ না ছিল কিছু লেখাপড়া, না ছিল হিসাবকিতাব। হ্যাঁ, তবে পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কিছুটা আশা ছিল। পঞ্চায়েত বসল। কয়েকটা গ্রামের লোক একত্রিত হল। মুনশিজি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। সভায় দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ভাইসব, আপনারা সকলেই সত্যপরায়ণ, সম্মানিত মানুষ। আমি আপনাদের সকলের দাসানুদাস। আমি আপনাদের সকলের উদারতা, কৃপা, দয়া ও ভালোবাসায় সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা কি এটা মনে করেন যে, আমি অনাথা বিধবা মহিলার টাকা খেয়ে ফেলেছি?

পঞ্চায়েত একস্বরে উত্তর দিল—না, না। আপনারা দ্বারা একাজ সম্ভব নয়।

রামসেবক—যদি আপনাদের সকলের এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি টাকা খেয়ে ফেলেছি তাহলে আমার ডুবে মরা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। আমি ধনবান নই কিংবা উদারতা দেখাবার মতো

ঔদ্ধত্যও আমার নেই। তবে নিজের কলমের জোরে, আপনাদের সকলের দয়ায়, আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। তা আমি কি এমনই অপদার্থ হয়ে গেলাম যে, এক অনাথার টাকা গায়েব করে দেব?

পঞ্চায়েত একস্বরে আবার বলল—না, না। আপনার দ্বারা একাজ সম্ভব না। মুখ দেখে লোক চেনা যায়।

পঞ্চায়েত মুনশিজিকে ছেড়ে দিয়ে সভা শেষ করে দিয়ে উঠে গেল। মুঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল—আচ্ছা! এখানে কিছু হল না, ঠিক আছে। ওখানে কোথায় যাবে।

তিন

এখন আর মুঙ্গার দুঃখের কথা শোনার বা সাহায্য করার কেউ রইল না। দারিদ্র্যের জন্য যেসব কষ্ট সইতে হয় তার সবই তাকে সইতে হল। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল, চাইলে পরিশ্রমও করতে পারত। কিন্তু যেদিন পঞ্চায়েতের সভা হয়ে গেল সেদিন থেকেই সে কোনো কাজ না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। এখন থেকে সে দিনরাত শুধু টাকা-টাকাই করতে থাকল। উঠতে, বসতে, ঘুমিয়ে, জেগে থেকে তার একটাই কাজ হল—মুনশি রামসেবকের মঙ্গলকামনা। তার কুঁড়ে ঘরের দরজায় বসে থেকে দিনরাত শুধু অন্তরে সে তাকে আশীর্বাদ করতে থাকত। প্রায়শই তার আশীর্বাদে এমন কাব্যময়তার পরিচয় পাওয়া যেত, সে এমন উপমা ব্যবহার করত যে তা শুনে লোক আশ্চর্য হয়ে যেত। ধীরে ধীরে মুঙ্গা পাগল হয়ে গেল। খালি মাথা, খালি গা, হাতে একটা কুডুল নিয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে সে বসে থাকত। কুঁড়ে ঘরের জায়গায় এখন তাকে শ্মশানে, নদীর ধারে, পোড়ো বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। বিস্রস্ত চুল, লাল চোখ, উন্মাদের মতো চেহারা, হাত-পা—তার এই রূপ দেখে লোক ভয় পেয়ে যেত। কেউ আর এখন তাকে হেসে উত্ত্যক্ত করত না। কখনও সে যদি গ্রামে এসে হাজির হত তাহলে মেয়েরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিত। পুরুষরা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত আর বাচ্চারা চিৎকার করে পালাত। ছেলেছোকরাদের মধ্যে একমাত্র যে পালাত না সে হল মুনশি রামসেবকের সুপুত্র রামগুলাম। পিতার চরিত্রের সমস্ত অপূর্ণতা পুত্রে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এর মারের চোটে গ্রামের ছেলেদের নাকালের একশেষ হত। গ্রামের অন্ধ, খোঁড়া মানুষ-এর চেহারা দেখলে বিরক্ত হত। গালিগালাজ শুনে এর এত আনন্দ হত যে, শ্বশুরগৃহাভিমুখী জামাইয়েরও তা হয় না। সে মুঙ্গার পিছন পিছন তালি বাজাতে যেত কুকুর সঙ্গে নিয়ে। যতক্ষণ সে বেচারি বিরক্ত হয়ে গ্রামের বাইরে চলে না যেত ততক্ষণ সে তাকে তাড়া করে বেড়াত। টাকাপয়সা, জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে মুঙ্গার উপাধি জুটল 'পাগল' আর সত্যিই সে এখন উন্মাদ। একা বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নিজে নিজে সে কথা বলত আর তাতে মুনশি রামসেবকের মাংস, হাড়, চামড়া, চোখ, কলিজা ইত্যাদি খাবার, পিষবার, কুটিকুটি করবার ও ছিঁড়ে ফেলবার উৎকট বাসনা প্রকট হত আর যখন সব ইচ্ছা প্রকাশের শেষ সীমায় পৌঁছাত তখন সে রামসেবকের বাড়ির দিকে মুখ করে বুকের রক্ত জমানোর মতো করে হাঁক পাড়ত—তোর রক্ত খাব।

প্রায় প্রতি রাত্রে অন্ধকারে এই চিৎকার শুনে মেয়েরা আঁতকে উঠত। তবে এই চিৎকার থেকে আরও মারাত্মক ছিল তার অট্টহাসি। মুনশিজির রক্তপান করার কল্পিত আনন্দে সে অট্টহাসি হাসত। এই অট্টহাসিতে এমন একটা আসুরিক উদ্দামতা, এমন একটা পাশবিক উগ্রতা থাকত যে তা শুনে

রাত্রে লোকের রক্ত হিম হয়ে যেত। মনে হত যেন অসংখ্য পেঁচা একসঙ্গে হাসছে। মুনশি রামসেবক ছিলেন খুব সাহসী ও বুকের পাটাওয়ালা মানুষ। দেওয়ানি ফৌজদারি কিছুরই ভয় তার ছিল না। তবে মুঙ্গার এই পিলে-চমকানো চিৎকার শুনে তিনিও ভয় পেতেন। মনুষ্যরচিত আইনকে আমরা ভয় নাও করতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরীয় কানুনের প্রতি সকলের মনেই আপনা থেকে একটা ভয় থাকে। মুঙ্গার ভয়ংকর নৈশবিহার রামসেবকের মনেও সময় সময় ওই রকম ভয় উৎপন্ন করত এবং তার চেয়েও বেশি করত তার স্ত্রীর মনে। তার স্ত্রী ছিল খুব চতুর। সে মুনশিজিকে এসমস্ত ব্যাপারে সর্বদাই পরামর্শ দিত। যারা বলতেন, মুনশিজির জিহ্বাগ্রে সরস্বতীর অধিষ্ঠান, তারা ভুল করতেন। আসলে এই গুণের অধিকারিণী ছিল তার স্ত্রী। মুনশিজি লেখায় যেমন দড় ছিলেন তেমনি তার স্ত্রী ছিল কথায়। আর এই দুই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রায়শ তাদের অসহায়তা নিয়ে কী করা কর্তব্য তার আলোচনা হত।

গভীর রাত। প্রতিদিনের নিয়মানুসারে মুনশিজি নিজের চিন্তা দূর করবার জন্য কয়েক ঢোক মদ গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মুঙ্গা একেবারে তার দরজায় এসে হাঁক দিয়ে 'তোর রক্ত খাব' বলে অট্টহাসি হেসে উঠল।

মুনশিজি এই ভয়ংকর হাসির লহর শুনে আঁতকে উঠলেন। ভয়ে তার পা থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুক টিপ টিপ করতে লাগল। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে দরজা খুলে স্ত্রী নাগিনকে ঘুম থেকে তুললেন। নাগিন বিরক্ত হয়ে বললেন—কী বলছ? মুনশিজি রুদ্ধ গলায় বললেন—পাগলি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

নাগিন উঠে বসে বলল—কী বলছ?

— তোমার মাথা।

— কী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে?

— আওয়াজ শুনছ না?

নাগিন মুঙ্গাকে ভয় পেত না, ভয় পেত তার আত্মকথনকে। তবু তার এই বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা বলে মুঙ্গাকে অবশ্যই চুপ করাতে পারবে। সে সামলে নিয়ে বলল—তুমি রাজি হলে আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বল নিই। মুনশিজি কিন্তু আপত্তি করলেন।

দুজনেই পা টিপে টিপে দেউড়িতে গিয়ে দরজা ফাঁক করে দেখলেন। মুঙ্গার ধূলিধূসরিত দেহ মাটির উপর পড়ে ছিল, তার প্রবল নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল। রামসেবকের রক্ত ও মাংসের ক্ষুধায় সে তার নিজের রক্ত ও মাংস শুকিয়ে ফেলেছিল। একটা শিশুও বোধ হয় তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারত। তবুও এই মুঙ্গার ভয়ে সমস্ত গ্রাম থরথর করে কাঁপত। আমর জীবন্ত মানুষকে ভয় পাই না, ভয় পাই মৃত মানুষকে। রাত কাটল। দরজা বন্ধ ছিল। তবে মুনশিজি আর নাগিন বসে বসেই রাত কাটিয়ে দিলেন। মুঙ্গা বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারত না ঠিকই কিন্তু তার আওয়াজকে ঠেকাবে কে। মুঙ্গার চেয়ে অনেক ভীতিপ্রদ ছিল তার আওয়াজ।

ভোরে মুনশিজি বাইরে এসে মুঙ্গাকে বললেন— এখানে পড়ে কেন?

মুঙ্গা বলল—তোর রক্ত খাব।

নাগিন সাহস সঞ্চয় করে বলল—তোর মুখ ঝলসে দেব।

কিন্তু মুঙ্গার উপর নাগিনের বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে আবার সেই অট্টহাসি হেসে উঠলে নাগিন কিছুটা সংকুচিত হয়ে গেল। হাসির সামনে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। মুনশিজি আবার বললেন—এখান থেকে উঠে যা।

—উঠব না।

—কতক্ষণ এভাবে পড়ে থাকবি?

—আগে তোর রক্ত খাব, তবে যাব।

মুনশিজির শক্তিশালী লেখনী এখানে কোনো কাজে লাগল না আর নাগিনের অগ্নিবর্ষী বাণীও যেন কেমন শীতল। দুজনে ঘরে গিয়ে পরামর্শ চলল কী করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যায়, কী করে এই আপদের হাত থেকে পার পাওয়া যায়।

দেবী যখন আসেন, পাঁঠার রক্ত খেয়ে চলে যান, কিন্তু এই ডাইনি তো এসেছে মানুষের রক্ত খাবার জন্য। অথচ এই রক্তের একটা ফোঁটাও যদি কলম কাটতে গিয়ে পড়ত তাহলে সমস্ত পরিবারে সপ্তাহ কিংবা মাসাধিককাল তার জন্য শোক চলত এবং এই ঘটনা সারা গাঁয় ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যেত। তা, এই রক্ত পান করেই কি মুঙ্গার বিশুষ্ক শরীর সতেজ হয়ে উঠবে?

চার

গ্রামে এই আলোচনা চলল যে, মুঙ্গা মুনশিজির বাড়ির দরজায় ধরনা দিয়ে বসে আছে। মুনশিজির অপমান হলে গ্রামের লোকের খুব আনন্দ হত। দেখতে দেখতে শতাধিক লোকের ভিড় জমে গেল। তবে এই বাড়ির দরজায় সময় সময় এমন ভিড় লেগেই থাকত। রামগুলামের এই ভিড় পছন্দ ছিল না। মুঙ্গার উপর তার এত রাগ হল যে, যদি সে তার ইচ্ছামতো কাজ করতে পারত তাহলে সে তাকে কুয়োয় ফেলে দিত। এই চিন্তা মাথায় আসতেই রামগুলামের মনে কেমন একটা সুড়সুড়ির উদয় হল আর অনেক কষ্টে সে তার হাসি চেপে রাখল। আহা! ওই কুয়োয় ফেলে দিতে পারলে কী মজাই না হত। তবে এই পেতনি তো এখান থেকে নড়ছেও না। কী করা যায়? মুনশিজির বাড়িতে একটা গোরু ছিল। খোল, কলাই, ভুসি ওটাকে খাওয়ানো হত ঠিকই, কিন্তু সবই যেন ওই গোরুর হাড়ে মিলিয়ে যেত। ওর শরীরই শুধু পুষ্ট হত। রামগুলাম ওই গোরুরই গোবর একটা হাঁড়িতে নিয়ে সবটাই বেচারা মুঙ্গার মাথায় দিল ঢেলে আর সেই গোবরের ছিটে দিয়ে দিল দর্শকদের উপর। বেচারা মুঙ্গা একেবারে নেয়ে উঠল আর দর্শকরাও পালাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা বলতে লাগল—এটা মুনশি রামগুলামের বাড়ির দরজা। এখানে এরকম শিষ্টাচারই প্রাপ্য। তাড়াতাড়ি পালাও নয়তো পরে এর থেকেও বেশি আদর যত্ন হতে পারে। ভিড় পাতলা হলে রামগুলাম ঘরে গিয়ে হাততালি দিয়ে খুব একচোট হাসল। এরকম ফালতু ভিড় এত সহজে ও এমন সুচারুরূপে হটিয়ে দেওয়াতে মুনশিজি নিজের সুশীল পুত্রের পিঠ চাপড়ে দিলেন। সবাই চলে গেলেও বেচারি মুঙ্গা কিন্তু যেমন ছিল তেমনি বসে থাকল।

দুপুর হয়ে গেল, মুঙ্গা কিন্তু খেল না। সন্ধ্যা হল। অনেক বলাকওয়া সত্ত্বেও সে খেল না। গ্রামের প্রধান অনেক খোশামোদ করলেন, এমন কী, মুনশিজি হাতজোড় পর্যন্ত করলেন, কিন্তু দেবী প্রসন্ন হলেন না। শেষে মুনশিজি না পেরে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। বলে গেলেন, গোঁসা করে যারা

না-খেয়ে থাকে তারা আবার নিজেরাই খায়। রাতটাও মুঙ্গা কোনো কিছু না খেয়ে পার করে দিল। মুনশিজি ও তার স্ত্রী এই রাতটাও না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন। আজ মুঙ্গার হাসি ও গর্জন দুইই অনেক কম শোনা গেল। ঘর থেকে ওরা ভাবলেন, আপদ দূর হয়েছে। ভোর হতেই দরজা খুলে দেখলেন, মুঙ্গা নিঃসাড় পড়ে আছে। তার মুখে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। তার প্রাণপাখি উড়ে গেছে। সে এই বাড়িটার দরজাতেই মরবে বলে এসেছিল। যে তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় আত্মসাৎ করে নিয়েছে তারই হাতে সে তার জীবনও সঁপে দিল। নিজের শরীরটা পর্যন্ত সে তাকে দিয়ে গেল। সম্পদকে মানুষ কী ভালোই না বাসে। সম্পদ তার নিজের প্রাণ থেকেও প্রিয়, বিশেষ করে বার্ধক্যে। সমস্ত ঋণ চুকিয়ে দেবার দিন যত কাছে আসতে থাকে ততই যেন তার সুদও বেড়ে উঠতে থাকে।

এ ঘটনা গ্রামে কী নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল আর মুনশিজিকেই বা কীভাবে অপমানিত হতে হল, সে সব কথা বলতে যাওয়া নিরর্থক। একটা ছোটো গ্রামে এরকম একটা অসাধারণ ঘটনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার থেকে বেশিই হয়েছিল। মুনশিজির অপমান যতটুকু হবার কথা ছিল তার চেয়ে এক চুলও কম হল না। এই ঘটনার পর থেকে তিনি একঘরেই হয়ে গেলেন। গ্রামের চামারও এখন তার হাত থেকে জল খেতে বা তাকে ছুঁতে রাজি নয়। যদি কারও বাড়িতে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় কোনো গোরু মারা যায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে মাসাবধি দরজায় দরজায় ভিক্ষা মেগে ফিরতে হয়। নাপিত তাকে কামায় না, কাহার তাকে জল তুলে দেয় না, কেউ তাকে ছোঁয় না পর্যন্ত। এই হল গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মহত্যার শাস্তি তো এর থেকেও ঢের কঠিন আর অপমানও অনেক বেশি। মুঙ্গা তা জানত আর তাই সে এই বাড়ির দরজায় এসে মরেছিল। সে এটা বুঝেছিল—আমি বেঁচে থেকে যা করতে পারিনি মরে তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারব। গোবরের ঘুঁটে যখন পুড়ে ছাই হয় তখনই সাধুসন্ত সেই ছাই মাথায় মাখেন। পাথরের ঢেলা আগুনে পুড়ে আগুনের চেয়ে বেশি তেজি ও মারাত্মক হয়ে যায়।

পাঁচ

মুনশি রামসেবক ছিলেন আইনবাজ লোক। আইনের চোখে তো তার কোনো অন্যায় ছিল না। আইনের কোনো ধারা মোতাবেক তো মুঙ্গার মৃত্যু হয়নি। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এর কোনো নজির পাওয়া যাবে না। কাজেই এই জন্য যারা তাকে প্রায়শ্চিত্ত করাতে চেয়েছিল তারা খুবই ভুল করেছিল। কারণ, কাহার যদি জল না দেয়, না দেবে—তিনি নিজেই জল ভরে নেবেন। নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে লজ্জা কোথায়। নাপিত চুল কাটবে না? ভালো। নাপিত দিয়ে কামানোর দরকারই বা কীসের? দাড়ি খুব সুন্দর জিনিস। দাড়ি পুরুষের শোভা ও সৌন্দর্যবর্ধক। আর, সত্যি দাড়ির প্রতি যদি কারও ঘৃণা থেকেও থাকে তবে বাজারে তো এক আনা করে ব্লেডও পাওয়া যায়। ধোপা যদি কাপড় না ধোয় তাতেও পরোয়া নেই, কারণ সর্বত্র এক পয়সা দামে সাবান কিনতে পাওয়া যায়। এক গুলি সাবানে ডজনের উপর কাপড় হাঁসের পালকের মতো সাদা করে কাচা যায়। ধোপা কী খায় যে এত পরিষ্কার করে কাপড় কাচবে? পাথরে আছড়ে আছড়ে তো কাপড়ের বারোটা বাজিয়ে দেয়। নিজেরা পরবে, পয়সা নিয়ে অন্যদের পরতে দেবে, ভাঁটিতে চড়াবে, সোডার জলে ডোবাবে—কাপড়ের দুর্গতির একশেষ করে ছাড়ে। এই জন্যই তো দু-তিন বছরের বেশি একটা

জামা পরা যায় না। তা নইলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দুটো আচকান আর দুটো জামা বানালেই চলত। মুনশি রামসেবক আর তার স্ত্রী সারা দিন তো এসব কথা আলোচনা করে নিজেদের প্রবোধ দিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তর্কজাল শিথিল হতে লাগল।

এবার তাদের মনে ভয় এসে দানা বাঁধল। রাত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাইরের দরজাটা ভুল করে খোলা পড়েছিল, কিন্তু সেটা বন্ধ করার সাহস আর কারও হল না। শেষ পর্যন্ত নাগিন নিল হাতে প্রদীপ, মুনশিজি নিলেন কুড়ুল আর রামগুলাম নিল দা। তিন জন এই ভাবে সজ্জিতহয়ে কোনো রকমে দরজা পর্যন্ত গেল। তবে মুনশিজি খুব বাহাদুরির পরিচয় দিলেন। কোনো কিছু ঠিক না করেই তিনি দরজার বাইরে যাবার চেষ্টা করলেন। কম্পিত কলেবর হয়েও অত্যন্ত জোরে নাগিনকে বললেন, তুমি খামোখা ভয় পাচ্ছ। সে কি এখানে বসে আছে? কিন্তু তার প্রিয় নাগিন তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিরক্তিভরে বলল, তোমার এই ছেলেমানুষি তো ভালো নয়। এইভাবে সমস্যার সমাধান করে তিন জনই রান্নাঘরে এসে খাবার খেতে লেগে গেল।

তবে মুঙ্গা তাদের চোখে ঠাঁই করে নিয়েছিল, তাই নিজেদের ছায়া দেখেও তারা মুঙ্গাকে ভয় পাচ্ছিল। অন্ধকার ঘরের কোণ দেখে তাদের মনে হতে লাগল—মুঙ্গা বসে আছে। সেই হাড্ডিসার শরীর, সেই উশকোখুশকো চুল, সেই পাগলামি, সেই ভীতিপ্রদ চোখ— পা থেকে মাথা পর্যন্ত সেই মুঙ্গা। এই ঘরেই আটা, ডাল ইত্যাদি রাখার কয়েকটা মটকি ছিল, ওখানে কিছু ছেঁড়া কাপড়ও পড়ে ছিল। একটা ইঁদুর ক্ষুধায় কাতর হয়ে (মটকিতে শস্যের চেহারাও দেখা যেত না, তবু সারা গ্রামে একথা চাউড় ছিল যে, এবাড়ি ইঁদুরের স্বর্গরাজ্য) আটা, ডাল ইত্যাদির খোঁজে—যদিও সেসব কোনো দিন মাটিতে পড়ত না— ঘুরতে ঘুরতে ওই ছেঁড়া কাপড়ের নীচে এসে হাজির হয়েছিল। কাপড়ের মধ্যে কী একটা নড়ছে মনে হল। প্রসারিত ছিন্নবস্ত্র মুঙ্গার শীর্ণ পা বলে প্রতিভাত হল। তা দেখে নাগিন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। মুনশিজি বিমূঢ় হয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। রামগুলাম ছুটতে গিয়ে পায়ে কী বেধে পড়ে গেল। ইঁদুর বাইরে বেরিয়ে এলে দেখে ওদের চেতনা হল। মুনশিজি সাহস করে মটকির দিকে এগিয়ে গেলে নাগিন বলল, রেখে দাও, তোমার পুরুষালি দেখা গেছে।

মুনশিজি নিজের প্রিয়তমা পত্নীর এই টিটকারিতে খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন—কী, তুমি ভেবেছ আমি ভয় পেয়েছি? আরে, ভয়ের আবার কী হল? মুঙ্গা মরে গেছে। সে কি এখানে এসে বসে আছে? কেন, কাল আমি দরজার বাইরে যাইনি? তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছিলে না, তা আমি তো তোমার কথা শুনিনি।

মুনশিজির এই যুক্তিতে নাগিন নিরুত্তর হয়ে গেল। দরজার বাইরে যাওয়া কিংবা তার চেষ্টা করা গতকাল খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। যার সাহসের এমন প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে ভিতু বলবে কে? ওটা নাগিনের বাড়াবাড়ি।

খাওয়া শেষ করে তিন জনই শোবার ঘরে এল, কিন্তু এখানেও মুঙ্গা পেছন ছাড়ল না। কথা বলা, চলা, মনকে প্রবোধ দেওয়া হল, নাগিন রাজা হরদৌল ও রানি সারন্ধার কাহিনি বলল, মুনশিজি কয়েকটা ফৌজদারি মামলার কথা শোনালেন, তবু এসব সত্ত্বেও মুঙ্গার মূর্তি তাদের চোখের সামনে থেকে সরছিল না। একটু খটখট হতেই তিন জন চমকে উঠতে লাগলেন। পাতার

শনশন শব্দ হতেই তিন জনের রোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। থেকে থেকে একটা মৃদু আওয়াজ মাটির নীচ থেকে তাদের কানে আসতে লাগল—'তোর রক্ত খাব।'

মধ্যরাতে নাগিনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। তার মনে হল রক্তবর্ণ চোখে, সবল ও ধারালো দন্তপাটি নিয়ে মুঙ্গা তার বুকে চেপে বসে আছে। নাগিন চিৎকার করে উঠল। পাগলের মতো ছুটে উঠানে গিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে একাকার। মুনশিজিও আর চিৎকার শুনে চমকে জেগে উঠেছিলেন, কিন্তু ভয়ে চোখ খুলতে পারছিলেন না। অন্ধের মতো দরজা হাতড়াতে লাগলেন। অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুঁজে পেয়ে উঠানে এলেন। নাগিন উঠানে পড়ে হাত-পা খিঁচছিল। তিনি তাকে তুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন, তবে সারারাত সে আর চোখ খুলল না। ভোরের দিকে সে প্রলাপ বকতে শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যে জ্বর এসে গেল। মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিকার দেখা দিল আর মধ্যরাতে যখন পৃথিবী আঁধারে নিমগ্ন তখন নাগিন এই সংসার থেকে বিদায় নিল। মুঙ্গার ভয় তার প্রাণ হরণ করল। যতদিন মুঙ্গা বেঁচে ছিল ততদিন সে নাগিনের ফোঁসফোঁসানিকে সর্বদা ভয় পেত। পাগল হয়ে গিয়েও সে কখনও নাগিনের সামনে পড়ত না। তবে আজ সে নিজের প্রাণ দিয়ে নাগিনের প্রাণ নিয়ে নিল। ভয়ের দারুণ ক্ষমতা। সুতো ছাড়া মানুষ হওয়ায় একটা গিটও দিতে পারে না আর এ হাওয়ায় একটা আস্ত জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল।

রাত কেটে গিয়ে দিন বাড়তে লাগল। তবু গ্রামের কাউকে নাগিনের লাশ তুলে নেবার জন্য আসতে দেখা গেল না। মুনশিজি বাড়ি বাড়ি গেলেন, কিন্তু কেউ বেরোল না। খুনির বাড়িতে আসবেই বা কেন? খুনির বাড়ির লাশ কে উঠাবে? এসময়ে মুনশিজির দাপট, তার প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন লেখনীর ভয় কিংবা তার আইনজ্ঞান কোনোটাই কাজে এল না। চারদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে মুনশিজি আবার নিজের বাড়িতেই ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। দরজা পর্যন্ত এসে ঘরের ভিতরে আর পা রাখতে পারছিলেন না। বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। বাইরে মুঙ্গা, ভিতরে নাগিন। মন শক্ত করে হনুমান-স্তোত্র জপতে জপতে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তখন তার মনের যা অবস্থা হয়েছিল তা তিনিই জানেন। তা অনুমান করাও কঠিন। ঘরে স্ত্রীর লাশ, আগে পিছে সাহায্য করার কেউ নেই। দ্বিতীয় বার বিবাহ হতে পারে, কারণ এই ফাল্গুনেই তো মাত্র পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। তবে এমন সুযোগ্যা মধুরভাষিণী স্ত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? বড়ো আপশোশের কথা। তাগাদাকারীদের সঙ্গে এখন কে আর তর্ক করবে? কেই বা তাদের নিরুত্তর করবে? লেনদেনের হিসাব এত ভালোভাবে কে আর করবে? কার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ আর ঋণগ্রহীতাদের বক্ষচুম্বন করবে? এত ক্ষতি আর পূরণ হবার নয়। পরের দিন লাশ ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে মুনশিজি গঙ্গার দিকে নিয়ে চললেন।

ছয়

মৃতদেহের সঙ্গে যাবার মতো কেউ আর ছিল না। এক, স্বয়ং মুনশিজি আর দুই, তার পুত্ররত্ন রামগুলামজি। এতটা অসম্মান কিন্তু মুঙ্গার মৃতদেহের বেলাতেও হয় নি।

মুঙ্গা নাগিনের প্রাণ নিয়েও কিন্তু মুনশিজিকে ছাড়ল না। তার মনে সব সময় মুঙ্গার মূর্তি বিরাজমান থাকত। যেখানেই থাকুন না কেন তার চিন্তা এতেই আবদ্ধ থাকত। যদি চিত্তবিনোদনের

কোনো উপায় থাকত তাহলে হয়তো মুনশিজি এতটা অস্থির হয়ে পড়তেন না। গ্রামের কেউই তার দরজায় উঁকি দিয়েও দেখত না। বেচারা নিজ হাতেই জল ভরতেন, নিজেই বাসন মাজতেন। অনুশোচনা ও ক্রোধ, চিন্তা ও ভয়—এই সব শত্রুর সামনে একটা মাথা কত দিন আর ঠিক থাকতে পারে, বিশেষ করে সে মাথা যদি রোজ আইনের কচকচানিতে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে!

একা বন্দীর মতো কোনো প্রকারে দশ-বারো দিন তো কাটল। চোদ্দো দিনের দিন মুনশিজি কাপড় পালটে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে কাছারির দিকে গেলেন। তাকে দেখে কিছুটা প্রফুল্ল মনে হল—'আমি যেতেই মক্কেলরা আমাকে ঘিরে ধরবে, তাদের শোক জানাবে, আর আমিও দুফোঁটা চোখের জল ফেলব। তারপর আবার বেনাম দলিল, বন্ধকি দলিল ও আদেশনামার ভিড় লেগে যাবে। হাতে টাকা আসবে, সন্ধ্যায় একটু নেশাটেশা করা যাবে। এই নেশা জমছে না বলেই তো মন একেবারে উচাটন হয়ে পড়েছে।' — এই সব ভাবতে ভাবতে মুনশিজি কাছারি পৌঁছুলেন।

কিন্তু কোথায় সেখানে বন্ধকি দলিলের রমরমা, কোথায়ই বা বেনাম দলিলের বন্যা কিংবা মক্কেলের ভিড়! তার বদলে দেখা গেল নিরাশার বালুকাভূমি। বান্ডিল খুলে কাগজপত্র নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা সত্ত্বেও কেউ একবার কাছে এল না। একথাটা পর্যন্ত কেউ জিজ্ঞাসা করল না যে, আপনি কেমন আছেন। নতুন মক্কেলের কথা বাদই দিলাম, বড়ো বড়ো পুরনো মক্কেল যাদের সঙ্গে মুনশিজির কাজের সম্পর্ক ছিল, তারাও আজ মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে লাগল। সেই অপদার্থ, আনাড়ি রমজান যাকে দেখে মুনশিজি ঠাট্টা করতেন, যে ঠিক করে কিছু লিখতেও পারতে, আজ তার গোপিনীদের দলে কৃষ্ণের অবস্থা। হায় রে ভাগ্য! মক্কেলরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, যেন কারও সঙ্গে কোনো চেনাজানাই নেই। সারাদিন কাছারির মাটি ছেনে নিরাশা আর চিন্তায় ডুব দিয়ে মুনশিজি বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। তিনি বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন আর মুঙ্গার ছবি তার সামনে দিয়ে আনাগোনা শুরু করল। অবস্থা এমন হল যে, দরজা খুলে তিনি যেই ঘরে ঢুকতে যাবেন অমনি রামগুলামের দুই কুকুর, যে দুটোকে সে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল, সে-দুটো ছুটে বেরিয়ে গেল আর মুনশিজিও ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে ভয়ের যত প্রভাব তত আর কোন কিছুরই নয়। প্রেম, চিন্তা, নিরাশা, ক্ষতি — এসব মনকে বিচলিত করে ঠিকই, তবে এসব হল হাওয়ার হালকা ঝাপটা। আর ভয় হল প্রচণ্ড আঁধি। এরপর মুনশিজির কী হল জানা যায় না। কয়েকদিন অবশ্য লোকে তাকে কাছারি যেতে এবং সেখান থেকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখেছে। কাছারি যাওয়াটা তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ত, কারণ সেখানে মক্কেলের আকাল থাকলেও পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিংবা তাদের বুঝিয়ে মানাবার জন্য ওই একটাই উপায় ছিল। এরপর কয়েকমাস আর মুনশিজির দেখা পাওয়া গেল না। তিনি বদ্রীনাথ চলে গিয়েছিলেন। একদিন গ্রামে এক সাধু এলেন। তাঁর শরীরময় বিভূতি, মাথায় লম্বা জটা, হাতে কমণ্ডুলু। তাঁর চেহারার সঙ্গে মুনশি রামসেবকের চেহারার অনেক সাদৃশ্য ছিল। কথাবার্তাতেও খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তিনি একটা গাছের নীচে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেলেন। সেই রাত্রেই মুনশি রামসেবকের বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। আগুনের শিখাও দেখা গেল আর সে আগুন বেড়েও উঠল। গ্রামের কয়েকশো লোক ছুটে গেল। তারা আগুন নেভাতে গেল না, গেল তামাশা দেখতে। গরিবের অভিশাপের কী ক্ষমতা! মুনশিজি

বেপাত্তা হয়ে যাবার পর রামগুলাম তার মামার বাড়ির চলে গিয়েছিল। সেখানে সে কিছুদিন ছিল। তবে সেখানে তার চালচলন কারও পছন্দ হয়নি।

একদিন সে কোনো একজনের খেত থেকে চুরি করে মুলো তুলেছিল বলে তাকে উত্তমমধ্যম দেওয়া হয়েছিল। এতে সে এত বিগড়ে গেল যে, সেই লোকের ফসল মরাইয়ে এলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। সমস্ত ফসল পুড়ে খাক হয়ে গেল। হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হল। অনুসন্ধান করে পুলিশ রামগুলামকে ধরল। এই অপরাধে সে এখনও চুনারের 'রিফর্মেটরি' স্কুলে রয়েছে।

(গরীব কী হায় / ১৯১১) অনুবাদ অমলকুমার রায়

নিমকের দারোগা

নিমকের নতুন দপ্তরটি যখন খোলা হল এবং ঈশ্বরদত্ত এই বস্তুটির ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন লোকে লুকিয়ে চুরিয়ে এর ব্যাবসা করতে লাগল। অনেক রকমের ছল চাতুরীর সূত্রপাত হল। কেউ ঘুষঘাষ দিয়ে কাজ হাসিল করত, কেউ বা চালাকি করে। অফিসারদের পোয়াবারো। পাটোয়ারিগিরির সর্ব-সম্মানিত পদ ছেড়েছুড়ে দিয়ে লোকে এই দপ্তরের বরকন্দাজগিরি করত। এখানকার দারোগাদের জন্য তো উকিলদের জিভেও জল আসত। যুগটা ছিল এমন যখন ইংরেজি শিক্ষা আর খ্রিস্ট ধর্মকে লোকে ভাবত একই জিনিস। ফারসির প্রাবল্য ছিল। প্রেমের উপাখ্যান আর শৃঙ্গার রসের কাব্য পড়ে ফারসি-জানা মানুষেরা সর্বোচ্চ পদগুলোয় বহাল হয়ে যেতেন। মুনশি বংশীধরও জুলেখার বিরহগাথা শেষ করে মজনু ও ফরহাদের প্রেম-বৃত্তান্তকে নল ও নীলের লড়াই এবং আমেরিকা আবিষ্কারের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিয়ে রোজগারের খোঁজে বেরোলেন। তবে তাঁর পিতা ছিলেন একজন অভিজ্ঞ পুরুষ। ছেলেকে বোঝালেন—বাবা! সংসারের দুর্দশা তো দেখতে পাচ্ছ, ধারদেনার বোঝার নীচে চাপা পড়ে আছি। মেয়েগুলো রয়েছে, ওরা তো দুর্বাঘাসের মত বেড়ে উঠছে। আমি হচ্ছি নদীর ধারের গাছ, জানি না কবে পড়ে যাব এখন তুমিই কার্যত বাড়ির কর্তা। চাকরির বেলায় পদটার দিকে তাকিয়ো না, ও তো পিরের দরগা। লক্ষ্য রাখবে ঢাকা-দেওয়া চাদরটার ওপর কে কী ফেলছে। এমন চাকরি খুঁজবে যেখানে কিছু উপরি আয় আছে। মাসকাবারি মাইনে তো পূর্ণিমার চাঁদ, যা একটি দিন দেখা দিয়ে তারপর ক্ষইতে ক্ষইতে শেষে উবে যায়। উপরি আয় বহমান স্রোত, যা দিয়ে সব সময় তেষ্টা মেটে। বেতন দেয় মানুষে, তাই তাতে বৃদ্ধি নেই। উপরি রোজগার দেন ভগবান, তাই তার ক্ষয় নেই। তুমি নিজে বিদ্বান, তোমাকে আর কী বলব? এ ব্যাপারে বুদ্ধি-বিবেচনার বড়ো দরকার। মানুষকে দেখবে, তার প্রয়োজনটাকে দেখবে আর সুযোগ দেখবে, তারপর যা ভালো মনে হয় করবে। গরজওয়ালা লোকের সঙ্গে কড়াকড়ি করলেই লাভ। তবে বেগরজি লোককে নিজের কবজাতে পাওয়াটা একটু কঠিন। আমার কথাগুলোকে মনে গেঁথে নাও। এ আমার সারাজীবনের উপার্জন।

এভাবে উপদেশ দিয়ে পিতা আশীর্বাদ করলেন। বংশীধর আজ্ঞাবহ পুত্র। কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বাড়ি থেকে রওনা হলেন। বিরাট এই সংসার-ক্ষেত্রে শুধু ধৈর্য তাঁর বন্ধু, বুদ্ধি তাঁর পথপ্রদর্শক এবং স্বাবলম্বন তাঁর সহায়। তবে শুভক্ষণে যাত্রা করেছিলেন, যেতেই নিমক-দপ্তরের দারোগাপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। বেতন ভালো, আর উপরি আয়ের তো ঠিকঠিকানাই নেই। শুভ সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ মুনশিজির আনন্দের আর সীমা রইল না, মহাজনেরা খানিকটা নরম হল, আশালতা দুলে উঠল। পাড়াপড়শিদের হৃদয়ে শূল বিঁধতে লাগল।

দুই

শীতকাল, রাতের বেলা। নিমকের সেপাই, চৌকিদারগুলো সব নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। মুনশি বংশীধর এ জায়গায় এসেছেন এখনও ছমাসের বেশি হয়নি, কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর কর্মদক্ষতা এবং উত্তম আচরণে অফিসারদের মোহিত করে ফেলেছেন। অফিসাররা তাঁকে খুব বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

নিমকের দপ্তর থেকে মাইল খানেক পূর্ব দিক দিয়ে যমুনা নদী বয়ে চলেছে, ওর উপরে নৌকা দিয়ে একটি পুল বানানো। দারোগা সাহেব দরজা বন্ধ করে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে নদীর জলকল্লোলের জায়গায় গাড়িঘোড়ার গড়গড়ানি এবং মাল্লাদের কোলাহল শুনতে পেলেন। উঠে বসলেন তিনি। এত রাতে গাড়ি নদী পেরোচ্ছে কেন? নির্ঘাত কিছু না কিছু গোলমাল আছে। যুক্তিতর্ক সন্দেহটাকে বাড়িয়ে তোলে। ইউনিফর্ম পরে, পিস্তলটাকে পকেটে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে নিমেষের মধ্যে তিনি পুলে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন গাড়ির একটা লম্বা সারি পুল পেরিয়ে যাচ্ছে। ধমক দিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—এসব গাড়ি কার?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। লোকগুলোর মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হল। তারপর সামনের লোকটি বললে—পণ্ডিত অলোপিদিনের।

— কে পণ্ডিত অলোপিদিন?

— দাতাগঞ্জের।

মুনশি বংশীধর চমকে উঠলেন। পণ্ডিত অলোপিদিন এ এলাকার সবচেয়ে মানী জমিদার। লাখ লাখ টাকার তাঁর লেনদেন, এ অঞ্চলে কী ছোটো কী বড়ো কে এমন আছে যে তাঁর কাছে ঋণী নয়। ব্যাবসাটাও বেশ বড়োসড়ো। বড়ো ধড়িবাজ লোক। ইংরেজ অফিসাররা তাঁর এলাকায় শিকার করতে এসে তাঁরই অতিথি হন। বারোটি মাস তাঁর সদাব্রত চলে।

মুনশিজি জিজ্ঞেস করেন, গাড়ি যাবে কোথায়? উত্তর আসে, কানপুর। গাড়িতে কী আছে, এ প্রশ্নে আবার নীরবতা ছেয়ে যায়। দারোগাসাহেবের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে চেঁচিয়ে বলেন—তোমরা কি সব বোবা নাকি? আমি জিজ্ঞেস করছি, এ গাড়িগুলোতে কী চাপানো আছে?

এবারেও কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ঘোড়াটাকে একটি গাড়ির গা ঘেঁসে দাঁড় করিয়ে বস্তা হাতড়ে দেখেন। সন্দেহ দূর হয়ে যায়। সবই নুনের ডেলা বোঝাই।

তিন

পণ্ডিত অলোপিদিন তাঁর সুসজ্জিত শকটটিতে চড়ে খানিকটা ঘুমুতে ঘুমুতে খানিকটা জাগতে জাগতে আসছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন গাড়োয়ান ঘাবড়ে গিয়ে এসে তাঁকে জাগিয়ে বলে—মহারাজ! দারোগা গাড়ি আটকে দিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে আপনাকে ডাকছেন।

লক্ষ্মীঠাকরুনের উপরে পণ্ডিত অলোপিদিনের অগাধ আস্থা। তিনি বলতেন, ইহসংসারের কথা তো ছার, স্বর্গেও লক্ষ্মীরই রাজত্ব। তাঁর কথাটা যথার্থও বটে। ন্যায়-নীতি সবই তো লক্ষ্মীর হাতের পুতুল, ওদের তিনি যেমন খুশি নাচান। অলোপিদিন শুয়ে শুয়েই গর্বভরে বললেন, চলো,

আমি যাচ্ছি। একথা বলে পণ্ডিতজি খুবই নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে পানের খিলি সেজে খেলেন। তারপর গায়ে বালাপোশ জড়িয়ে দারোগার কাছে এসে বললেন—বাবুজি, আশীর্বাদ। বলুন, কী এমন অপরাধ করলাম যে গাড়িগুলো সব আটক করা হয়েছে? আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের উপরে তো আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকা উচিত।

বংশীধর রুক্ষস্বরে বললেন—সরকারি হুকুম।

পণ্ডিত অলোপিদিন হেসে বললেন—আমি সরকারি হুকুম জানিনা, সরকারকেও চিনি না। আমার সরকার তো আপনিই। এ তো আমার আপনার ঘরোয়া ব্যাপার। আমি কি আপনার পর হতে পারি? আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন। এখান দিয়ে যাব আর এ ঘাটের দেবতাকে পূজা দেব না, এ কি একটা কথা নাকি? আমি নিজেই তো আপনার সেবায় আসছিলাম।

বংশীধরের মনে ঐশ্বর্যের মোহন বাঁশি কোনো দোলা দেয় না। সততার নবীন উচ্ছ্বাস। গর্জে উঠে বলেন—যারা কানাকড়ির দামে ধর্ম বেচে দেয় সে নিমকহারামদের দলে আমি নেই। আপনাকে আটক করা হল। আইন অনুসারে আপনাকে চালান করা হবে। ব্যস, বেশি কথা বলার সময় নেই আমার। জমাদার বদলু সিংহ! এঁকে হাজতে নিয়ে চলো, আমি হুকুম দিচ্ছি।

পণ্ডিত অলোপিদিন স্তম্ভিত হয়ে যান। গাড়োয়ানদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম পণ্ডিতজিকে এতটা কড়া কথা শুনতে হল। বদলু সিংহ এগিয়ে যায় বটে কিন্তু পণ্ডিতজির প্রতিপত্তির কথা ভেবে তাঁর হাত ধরতে সাহস করে না। ধর্মের হাতে অর্থের এমন অনাদর পণ্ডিতজি জীবনে দেখেননি। ভাবেন, ও এখনও একগুঁয়ে যুবক। মায়ামোহের জালে এখনো জড়ায়নি। ছেলেমানুষ, তাই সংকোচ করছে। বড়ো করুণভাবে বলেন—বাবুসাহেব! অমন করবেন না, আমি শেষ হয়ে যাব। ইজ্জত সব ধুলোয় মিশে যাবে। আমাকে অপমান করে আপনার কী লাভ হবে? আমাকে পর ভাববেন না।

বংশীধর কঠোর স্বরে কলেন—আমি এসব কথা শুনতে চাই না।

অলোপিদিন যে অবলম্বনটিকে কঠিন শিলাখণ্ড বলে ভেবেছিলেন, সেটি পায়ের নীচ থেকে সরে গেছে বলে মনে হল। তাঁর আত্মাভিমান এবং ধন-ঐশ্বর্য প্রচণ্ড আঘাত পায়। তবে এখনো মুদ্রার সংখ্যাগত শক্তিতে তাঁর পুরো ভরসা রয়েছে। গোমস্তাকে বলেন—লালাজি, হাজারটি টাকার নোট বাবুসাহেবকে নজরানা দাও, উনি এখন ক্ষুধার্ত সিংহ হয়ে আছেন।

বংশীধর গরম হয়ে বললেন—এক হাজার কেন, এক লাখও আমাকে ন্যায়ের পথ থেকে টলাতে পারবে না।

ধর্মের নির্বোধ দৃঢ়তা এবং দেবদুর্লভ ত্যাগ দেখে অর্থ খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তারপর উভয় শক্তির মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। অর্থ লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে। এক থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে পনেরো তারপর শেষে পনেরো থেকে বিশহাজার পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু ধর্ম অলৌকিক বীরত্বের সঙ্গে এই বহুসংখ্যক সেনাদলের সম্মুখে একাকী একটি পর্বতের মত অটল, অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অলোপিদিন হতাশ হয়ে বলেন—এর চাইতে বেশি আর আমার সাহস নেই। এরপর আপনার বিচার।

বংশীধর জমাদারকে হাঁক দেন। বদলু সিংহ মনে মনে দারোগা সাহেবের মুণ্ডুপাত করতে করতে পণ্ডিত অলোপিদিনের দিকে এগিয়ে যায়। পণ্ডিতজি ভয় পেয়ে দু-তিন পা পিছিয়ে যান। একান্ত কাতর মিনতি করে বলেন—বাবুসাহেব, ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন, পঁচিশ হাজারে রফা করতে আমি রাজি আছি।

— সে অসম্ভব।

— তিরিশ হাজারে?

— কোনো মতেই সম্ভব নয়।

— চল্লিশ হাজারেও কি নয়?

— চল্লিশ হাজার কেন, চল্লিশ লাখেও অসম্ভব। বদলু সিংহ, এই লোকটাকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার কর। আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না।

ধর্ম অর্থকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে। অলোপিদিন একজন হৃষ্টপুষ্ট মানুষকে হাতকড়া নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেন। চারদিকে হতাশ ও কাতর নয়নে তাকান। তারপর হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান।

চার

জগৎসংসার সে সময় ঘুমোচ্ছিল বটে, কিন্তু তার জিভটা জেগে ছিল। সকাল হতেই দেখা গেল বালক বৃদ্ধ সবার মুখেই খবরটা শোনা যাচ্ছে। যাকেই দেখুন সেই পণ্ডিতজির এই কাণ্ড নিয়ে টিপ্পনী কাটছে। নিন্দার বৃষ্টি হচ্ছে যেন পৃথিবী থেকে এখন পাপীর পাপতাপ শেষ হয়ে গেছে। জলকে দুধ বলে চালায় যে গয়লা, ভুয়া রোজনামচা লিখে খাতা ভর্তি করে যে সব অফিসার, রেলে বিনা টিকিটে সফর করে যেসব বাবু, জাল দলিল দস্তাবেজ তৈরি করে যেসব শেঠ সাহুকার—তারা সবাই ঘাড় নেড়ে নেড়ে কথাটা বলছে যেন তারা নিজেরা সব এক একটি দেবতা।

পরদিন পণ্ডিত অলোপিদিন যখন অভিযুক্ত হয়ে কনেস্টেবলদের সঙ্গে হাতে হাতকড়ি, মনে গ্লানি ও ক্ষোভ নিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করে আদালতের দিকে যান, তখন সারা শহরে হুলুস্থুল পড়ে যায়। মেলাতেও বোধহয় সবার চোখ এতটা ব্যাকুল থাকে না। ভিড়ের চোটে ছাদে আর দেওয়ালে কোনো তফাত ছিল না।

তবে আদালতে পৌঁছুতেই যেটুকু দেরি। পণ্ডিত অলোপিদিন এই বিশাল বনের সিংহ। অফিসাররা তাঁর ভক্ত, আমলারা তাঁর সেবক, উকিল-মোক্তাররা তাঁর আজ্ঞাবহ আর আরদালি, চাপরাশি ও চৌকিদাররা তো তাঁর বিনা মাইনের গোলাম। তাঁকে দেখেই লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে আসে। সবাই অবাক, অবাক একথা ভেবে নয় যে অলোপিদিন কেন একাজ করলেন, বরং একথা ভেবে যে আইনের হাতে উনি ধরা পড়লেন কী করে। অসাধ্য সাধন করে এমন সম্পদ এবং অনন্য বাক্‌পটুতা যার করায়ত্ত, এমন একজন মানুষ কেন আইনের হাতে ধরা পড়বে? প্রতিটি লোক তাঁকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে। এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য খুবই তৎপরতার সঙ্গে উকিলদের একটি বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। ন্যায়বিচারের রণাঙ্গনে ধর্ম ও অর্থের সংগ্রাম শুরু হয়।

বংশীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে সত্য ছাড়া না আছে কোনো শক্তি, স্পষ্ট ভাষণ ছাড়া না আছে কোনো হাতিয়ার। সাক্ষীরা রয়েছে বটে, তবে তারাও লোভে টলোমলো।

এমনকী, মুনশিজিরও মনে হল ন্যায়ও তাঁর প্রতি কিছুটা রুষ্ট। এটি ন্যায়বিচারের দরবার হলেও এখানকার কর্মচারীদের উপরে পক্ষপাতিত্বের নেশা চেপেছে। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব আর ন্যায়বিচারের মধ্যে মিল কোথায়? যেখানে পক্ষপাতিত্ব, সেখানে ন্যায়বিচারের কল্পনাও করা যায় না। মোকদ্দমা শিগগিরই মিটে যায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে লেখেন—পণ্ডিত অলোপিদিনের বিরুদ্ধে পেশ করা সমস্ত প্রমাণ ভিত্তিহীন এবং ভ্রমাত্মক। তিনি একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক। সামান্য লাভের জন্য এমন দুঃসাহস করবেন এটা কল্পনাতীত। যদিও নিমকের দারোগা মুনশি বংশীধরের দোষ বেশি নেই তবু এটা বড়ো দুঃখের বিষয় যে, তাঁর একগুঁয়েমি এবং অবিচারের ফলে একজন ভালোমানুষকে হয়রানি সহ্য করতে হল। আমরা সন্তুষ্ট এজন্য যে, তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন, তবে নিমক দপ্তরের দিনে দিনে বেড়ে চলা নিমকহালালি তাঁর বিবেক ও বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁর হুঁশিয়ার হয়ে চলা উচিত।

উকিলরা এই রায় শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। পণ্ডিত অলোপিদিন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। স্বজন বান্ধবেরা টাকার হরির লুট দিলেন। উদারতার সাগর উথলে উঠল। তার ঢেউগুলো আদালতের ভিতটাকেও নাড়িয়ে দেয়। বংশীধর যখন বাইরে এলেন তখন চারদিক থেকে তাঁর উপরে ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হতে থাকে। চাপরাশিরা খুব ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম করতে থাকে। এই সময়ের একটি কটুবাক্য, এক একটি ইঙ্গিত বংশীধরের অহংকারের আগুনকে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। এই মোকদ্দমায় জিতলেও বোধ হয় তিনি এতটা মাথা উঁচু করে চলতেন না। আজ সংসারে একটা দুঃখজনক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল তাঁর। দেখলেন ন্যায়নিষ্ঠা এবং বিদ্যাবত্তা, লম্বা চওড়া উপাধি, বড়ো বড়ো দাড়ি আর ঢোলা আচকান কোনোটিই সত্যিকারের সম্মানের পাত্র নয়।

বংশীধর অর্থের সঙ্গে শত্রুতা যেচে নিয়েছেন। তার মূল্য তাকে পরিশোধ করতেই হবে। বড়োজোর একটি সপ্তাহ কেটেছে কি কাটেনি, সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা এসে পৌঁছায়। কর্তব্যপরায়ণতার দণ্ড মেলে। বেচারা ভগ্নহৃদয়ে, শোকে দুঃখে ব্যথিত মনে বাড়ি ফিরে যান। বুড়ো মুনশিজি তো আগে থেকেই গজর গজর করছিলেন যে, যাবার সময় ছেলেটাকে পইপই করে বোঝালাম কিন্তু ছেলেটা একটা কথাও শুনল না। সবই নিজের খেয়াল খুশিমতো করছে। আমি এদিকে মহাজন আর সুদখোর বেনের তাগাদার ঝক্কি পোয়াব, বুড়ো বয়সে ভক্ত সেজে বসব আর ওখানে শুধু ওই শুকনো বেতন। আমরাও তো চাকরি করেছি, কোনো উঁচু পদেও ছিলাম না, কিন্তু রোজগার যা করেছি, চুটিয়ে করেছি। আর উনি ইমানদার হতে চলেছেন। নিজের ঘর অন্ধকার, মসজিদে বাবুর বাত্তি চাই। ধিক্ অমন বুদ্ধিকে। লেখাপড়া সবই ভস্মে ঘি ঢালা।

এর অল্প কদিন পরেই মুনশি বংশীধর এই দুরবস্থা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। বুড়ো বাবা তখন সব খবর শুনে নিজের কপাল চাপড়াতে থাকেন। বলেন—ইচ্ছে করছে তোমার আমার দুজনেরই মাথায় বাড়ি মারি। অনেকক্ষণ ধরে ক্ষোভে-দুঃখে হাত কামড়াতে থাকেন। রেগেমেগে কিছু কড়া কথাও বলে ফেলেন। বংশীধর যদি ওখান থেকে চলে না যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই ক্রোধটা বিকট রূপ ধারণ করত। বৃদ্ধা মায়েরও দুঃখ হয়। তাঁর জগন্নাথধাম আর রামেশ্বর যাত্রার সাধ ধুলোয় মিশে যায়। গিন্নি তো কদিন ভালো করে কথাই বলেন না।

এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা, বুড়ো মুনশিজি বসে বসে রামনামের মালা জপছেন। এমন সময় তাঁদের দরজায় একটি সাজানো রথ এসে দাঁড়াল। সবুজ আর গোলাপি পর্দা। একজোড়া পশ্চিমা বলদ, তাদের গলায় নীল সুতো, শিংগুলো পেতল দিয়ে মোড়া। লাঠি-কাঁধে কয়েকজন চাকর সঙ্গে। মুনশিজি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করতে ছুটলেন। দেখেন পণ্ডিত অলোপিদিন। নত হয়ে দণ্ডবৎ করে খোশামুদি করে কথা বলতে শুরু করেন— কী ভাগ্য আমাদের! তাই আপনার শ্রীচরণের ধুলো আমাদের দুয়ারে পড়েছে। আপনি আমাদের পূজনীয় দেবতা, আপনাকে কী করে মুখ দেখাব, আমাদের মুখে তো চুনকালি পড়েছে। কিন্তু কী করব, কুসন্তান হতভাগা ছেলে আমার, না হলে আপনার কাছে কেন আমার মুখ লুকোতে হবে? হায়! এমন পুত্র না দিয়ে ঈশ্বর যদি আমায় নিঃসন্তান রাখতেন।

অলোপিদিন বললেন—না দাদা, ও কথা বলবেন না।

মুনশিজি অবাক হয়ে বললেন—এমন সন্তানকে কী আর বলব?

অলোপিদিন বাৎসল্য-মাখা স্বরে বললেন—কুলতিলক ও বংশের কীর্তি উজ্জ্বল করে এমন ন্যায়পরায়ণ মানুষ কজন পৃথিবীতে হয়, যাঁরা ধর্মের জন্য নিজেদের সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন?

পণ্ডিত অলোপিদিন বংশীধরকে বললেন—দারোগা সাহেব, খোশামুদি করছি ভাববেন না। খোশামুদি করার জন্য আমার এতটা কষ্ট করার দরকার ছিল না। সেদিন রাতে আপনি আপনার ক্ষমতাবলে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, আর আজ আমি স্বেচ্ছায় আপনার কাছে গ্রেপ্তার হতে এসেছি। আমি হাজার হাজার ধনী মানী দেখেছি, হাজার হাজার উঁচু পদাধিকারীর সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন শুধু আপনি। আমি সবাইকে আমার আর আমার অর্থের ক্রীতদাস বানিয়ে ছেড়েছি। আমাকে অনুমতি দিন আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করি।

বংশীধর অলোপিদিনকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন বটে, তবে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে। ভেবেছেন এই মহাশয়টি তাঁকে লজ্জা দিতে আর জ্বালাতন করতে এসেছেন। ক্ষমাপ্রার্থনার চেষ্টা করেন নি, উলটে তাঁর বাবার ওই তেলমাখানো কথাগুলো তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। এখন পণ্ডিতজির কথা শুনে মনের ময়লা দূর হয়ে যায়। ভাসা ভাসা চোখে পণ্ডিতজির দিকে তাকান। সদ্ভাবের আভাস চোখে পড়ে। আত্মাভিমান এবার লজ্জার কাছে নতি স্বীকার করে। লজ্জা পেয়ে বলেন— আপনি মহৎ তাই একথা বলছেন। আমি যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছি, তার জন্য ক্ষমা করুন। আমি ধর্মের শৃঙ্খলে বন্দী ছিলাম, তা নইলে তো আপনার সেবক। যা আদেশ করবেন, তাই আমার শিরোধার্য।

অলোপিদিন বিনীতভাবে বলেন—নদীর ধারে সেদিন আপনি আমার প্রার্থনা স্বীকার করেন নি, কিন্তু আজ স্বীকার করতেই হবে।

বংশীধর বলেন—আমি কীসের যোগ্য, তবু আমার দ্বারা যেটুকু সেবা সম্ভব, তাতে ত্রুটি হবে না।

অলোপিদিন একখানি স্ট্যাম্প লাগানো কাগজ বের করে বংশীধরের সামনে রেখে বলেন—এই পদটি আপনি গ্রহণ করুন আর এতে আপনার স্বাক্ষর করে দিন। আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ না আপনার সম্মতি পাই, আমি দরজা ছেড়ে নড়ব না।

কাগজখানা পড়ে কৃতজ্ঞতায় মুনশি বংশীধরের দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। পণ্ডিত অলোপিদিন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির স্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন তাঁকে। ছয় হাজার টাকা বার্ষিক বেতন ছাড়াও দৈনন্দিন খরচ আলাদা — চড়বার জন্য ঘোড়া, থাকবার জন্য বাংলো, চাকরবাকর মুফতে। কম্পিত স্বরে বলেন—পণ্ডিতজি, আপনার উদারতার প্রশংসা করতে পারি আমার এমন ভাষা নেই। কিন্তু আমি যে এই উচ্চপদের যোগ্য নই।

অলোপিদিন হেসে বলেন—এখন আমার একজন অযোগ্য মানুষই দরকার।

বংশীধর গম্ভীরভাবে বলেন—এমনিতেই আমি আপনার সেবক। আপনার মতো কীর্তিমান, সজ্জন পুরুষের সেবা করা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমার না আছে বিদ্যা, না বুদ্ধি, না তেমন চরিত্রগুণ যা এসব অভাবগুলোকে পূরণ করে দেয়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য একজন বড়ো অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মানুষের প্রয়োজন।

অলোপিদিন কলমদান থেকে কলম বের করে সেটিকে বংশীধরের হাতে দিয়ে বলেন— আমার পাণ্ডিত্যের দরকারে নেই, নেই অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বা কার্যকুশলতার চাহিদা। এসব গুণের মাহাত্ম্যের পরিচয় আমার পাওয়া হয়ে গেছে। এবার সৌভাগ্য এবং শুভ যোগাযোগ আমাকে এমন একটি রত্নের সন্ধান দিয়েছে যার কাছে যোগ্যতা এবং বিদ্যাবত্তার উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়। এই নিন কলম, বেশি চিন্তা ভাবনা করবেন না। দস্তখতটি করে দিন। পরমেশ্বরের কাছে শুধু এটাই প্রার্থনা — তিনি আপনাকে যেন চিরকাল নদীতীরের সেই স্পষ্টভাষী, উদ্ধত, কঠোর অথচ ধর্মনিষ্ঠ দারোগা করে রাখেন। বংশীধরের চোখ ছলছল করে ওঠে। কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয়ের ক্ষুদ্র পাত্রখানি ছাপিয়ে পড়ে। আর একবার পণ্ডিতজির পানে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান, তারপর কাঁপা হাতে ম্যানেজারির কাগজখানিতে হস্তাক্ষর দিয়ে দেন।

আলোপিদিন আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

(নমক কা দারোগা) অনুবাদ ননী শূর

শঙ্খনাদ

ভানু চৌধুরি গাঁয়ের মোড়ল। গাঁয়ে তাঁর খুব মানসম্মান। দারোগাসাহেব আসন ছাড়া ওঁকে মাটিতে বসতে দেন না। মোড়লমশাইর এত দাপট যে ওঁর ইচ্ছে ছাড়া গাঁয়ের একটা পাতাও নড়তে পায় না। যে কোনো ঘটনা তা সে শাশুড়ি-বউয়ের কলহই হোক আর জমি বা জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়াই হোক, চৌধুরিমশাইর কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। উনি অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন, তদন্ত শুরু হয়, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই কোনো অভিযোগকে সফলভাবে বিচার করতে যেসব বিষয়ের দরকার, সে সব নিয়ে ভেবে দেখা হয় আর চৌধুরিমশাইয়ের দরবার থেকে ফয়সালা হয়ে যায়। কারোই আদালতে যাবার দরকার পড়ে না। হ্যাঁ, এই কষ্ট স্বীকারের জন্য চৌধুরিমশাই কিছু ফি অবশ্যই নিয়ে থাকেন। যদি কখনও ফি পাবার অসুবিধায় ওঁকে ধৈর্যসহকারে কাজ করতে হয় তাহলে গাঁয়ে অনর্থ ঘটে, কেননা চৌধুরিমশাইয়ের ধৈর্য আর দারোগাসাহেবের ক্রোধের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মোটমাট কথা এই যে, চৌধুরিমশাইয়ের শত্রুমিত্র সবাই চৌধুরিমশাই সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে চলেন।

দুই

চৌধুরিমশাইয়ের তিনটি উপযুক্ত ছেলে। বড়ো ছেলে বিতান একজন সুশিক্ষিত মানুষ। ডাকপিয়োনের রেজিস্টারে সই করা পর্যন্তই তার বিদ্যে। বড়ো অভিজ্ঞ, বড়ো অনুভূতিপ্রবণ, সাংসারিক বুদ্ধিতে সুদক্ষ। ফতুয়ার বদলে শার্ট গায়ে দেয়, মাঝেমধ্যে সিগারেটও টানে, যার ফলে ওর মানটা বাড়ে। যদিও বিতানের এসব বাবুগিরি বুড়ো চৌধুরিমশাইয়ের আদৌ পছন্দ নয়, তবু বেচারা নিরুপায়, কেননা আদালত আর আইনকানুনের মামলা মোকদ্দমাগুলো বিতানের হাতে। সে নিজেই এক মূর্তিমান অইনকানুন। আইনের সবগুলো ধারা বিতানের জিভের ডগায়। মিথ্যা সাক্ষী বানাতে পুরোপুরি ওস্তাদ। মেজো ছেলে শান চৌধুরি কৃষি বিভাগের একজন কর্মকর্তা। বুদ্ধিতে মোটা, তবে শারীরিক দিক থেকে বেশ পরিশ্রমী। যেখানে ঘাসও জন্মায় না সেখানেও সে সোনা ফলিয়ে ছাড়ে। তৃতীয় ছেলেটির নাম গুমান। ছেলেটি যেমন রসিক, ঠিক তেমনই গোঁয়ারগোবিন্দ। মহরমের সময় এত জোরে জোরে ঢোল বাজায় যে কানের পর্দা ফেটে যাবার জো। মাছ ধরবার বড়ো শখ। খুব আমুদে যুবক। খঞ্জনি বাজিয়ে যখন সে মিষ্টিগলায় খেয়াল গায় তখন আসর জমে ওঠে। ওর কুস্তি লড়ার এমন বাতিক যে মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতে

পারে। কিন্তু বাড়ির লোকগুলো এমনই কাঠখোট্টা যে, গুমানের এসব শখের ওপর ওদের তিলমাত্র সহানুভূতিও নেই। বাপ আর ভাইয়েরা তো ওকে এখন বন্ধ্যা জমি বলেই ধরে রেখেছে। ধমক-ধামক, শিক্ষা, উপদেশ, স্নেহ-ভালোবাসা, কাকুতিমিনতি কোনো কিছুতেই তার মনে কোনো দাগ কাটে না। তবে হ্যাঁ, বউদিরা এখনও ওর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেয়নি। ওরা এখনও ওকে তেতো ওষুধ গিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কুঁড়েমি এমনি এক রাজসিক ব্যাধি যার হাত থেকে রোগী কখনও নিজেকে বাঁচাতে পারে না। এমন একটা দিন খুব কমই যায় যে দিন বউদিদের কটুকথা গুমানকে শুনতে না হয়। সেসব বিষাক্ত তীর মাঝে মাঝে ওর কঠিন হৃদয়কে বিদ্ধ করলেও, সে ব্যথা এক রাতের বেশি কখনও স্থায়ী হয় না। ভোর হওয়া মাত্রই ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে এই পীড়ারও উপশম হয়ে যায়। ভোর হয়, গুমান হাত মুখ ধোয়, তারপর ছিপ হাতে করে পুকুরের দিকে রওনা হয়। বউদিরা পুষ্পবৃষ্টিকরে, বুড়ো চৌধুরিমশাই পাঁয়তারা কষতে থাকেন, আর দাদারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু আপন খেয়ালে মশগুল গুমানবাবু ওদের মাঝখান দিয়ে এমনভাবে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যায়, দেখে মনে হয় যেন একটি মস্ত হাতি একপাল কুকুরের মাঝখান দিয়ে চলে বেরাচ্ছে। ওকে সঠিক পথে আনবার জন্য কত কী চেষ্টাই না করা হয়েছে। বাপ বুঝিয়ে বলেন—বাবা, এমনভাবে চলো যাতে তুমিও দুটো পয়সা রোজগার করতে পার আর সংসারেরও কিছু সুরাহা হয়। দাদাদের ভরসায় কতদিন থাকবে? আমি তো পাকা আম—আজ না হয় কাল টুপ করে খসে পড়ব। তারপর তোমার চলবে কী করে? দাদারা পুছবেও না, বউদিদের রকমসকম তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমরাও বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে, ওদের খাওয়াবে পরাবে কী করে? চাষবাসে মন না লাগে তো বলো পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই? শৌখিন গুমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা শোনে, কিন্তু পাথরের দেবতা, কখনও গলে না। বাবুমশাইয়ের অত্যাচারের দণ্ড ভুগতে হয় ওর স্ত্রী বেচারিকে। সংসারে মেহনতের যতগুলো কাজ সবগুলো ওরই ঘাড়ে চাপানো হয়। সে ঘুঁটে দেয়, কুয়ো থেকে জল তুলে আনে, আটা পেষে, আর এত সব করা সত্ত্বেও জায়েরা ভালো মুখে কথা বলে না, বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। একবাব যখন একনাগাড়ে কয়েকদিন সে স্বামীর উপর রাগ করে থাকে তখন গুমানবাবু কিছুটা নরম হয়। বাপকে গিয়ে বলে—আমাকে একটা দোকান খুলে দিন। চৌধুরিমশাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। আনন্দের সীমা থাকে না। কয়েকশো টাকা খরচ করে কাপড়ের একটা দোকান খুলে দেন। গুমানের বরাত খোলে। মলমলের গিলেকরা পাঞ্জাবি বানায়। মলমলের পাগড়িটাকে হালকা সবুজ রঙে ছোপায়। সওদা বিকোক বা না বিকোক, ওর পোয়াবারো! দোকান খোলে, পাঁচ-দশটি প্রাণের বন্ধু এসে আড্ডা জমায়, গাঁজার দম আর খেয়ালের তান চলে—

চল ঝটপট রী, যমুনা তটরী, খড়ো নটখটরী।

এমনি করে তিন মাস সুখে-শান্তিতে কাটে। ফুলবাবু গুমান প্রাণখুলে মনের সাধ মেটায়, শেষ পর্যন্ত পুঁজিপাটা সব উড়ে যায়। চটের টুকরো ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকে না। বুড়ো চৌধুরিমশাই কুয়োতে ঝাঁপ দিতে যান। বউদিরা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেয়—হায়রে হায়! আমাদের ছেলেপুলে আর আমরা একটুকরো কাপড়ের জন্য হা-হুতাশ করে মরছি, মোটা খদ্দরের একটা জামাও জুটছে না, আর এদিকে এতবড়ো একখানা দোকান এই অকর্মার ধাড়ির কফন হয়ে গেল। এখন কী করে কালা মুখ দেখাবে? অনামুখো, কোন মুখে বাড়ি আসবে? ফুলবাবু গুমানের মুখ

কিন্তু একটুও মলিন হয় না। ওই মুখ নিয়েই আবার বাড়ি আসে এবং আবার সেই পুরনো ঢঙেই চলতে থাকে। আইনজ্ঞ বিতান ওর অমন সাজগোজ দেখে জ্বলতে থাকে। সারাদিন আমি গায়ের ঘাম ঝরাব, একটা নয়নসুখের পাঞ্জাবিও আমার জুটবে না, আর এই অপদার্থটা সারাটা দিন বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমুবে আর এভাবে ফুলবাবুটি সেজে বেরোবে? এমন জামাকাপড় তো বোধহয় আমি আমার বিয়েতেও পাইনি। শান্ত সরল শানের মনের ভাবটাও অনেকটা এমনিতর। শেষ পর্যন্ত এই জ্বালা আর সহ্য হয় না, আগুন জ্বলে ওঠে। আইনবিশারদ বিতানের বউ গুমানের সব জামাকাপড় তুলে এনে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে ওঠে, দেখতে না দেখতে সব কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গুমান কেঁদে ফেলে, দুই দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। বুড়ো চৌধুরি এই দৃশ্য দেখে কপাল চাপড়ান। এ যে বিদ্বেষের আগুন। সংসারটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে তবে নিভবে।

তিন

কাপড়ের আগুনটা তো কিছুক্ষণের মধ্যে নিভে যায়, কিন্তু মনের আগুন আগের মতোই ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। শেষে একদিন বুড়ো চৌধুরিমশাই বাড়ির সব মেম্বারদের জড়ো করে এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বসেন যে, কী করে এ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিতানকে বলেন—বাবা, তুমি তো দেখলে, দেখতে না দেখতে কয়েকশো টাকা কীভাবে জলে গেল। এভাবে আর তো চলা অসম্ভব। তুমি বুদ্ধিমান, মামলা মোকদ্দমা কর, এমন একটা কিছু রাস্তা বের করো যাতে সংসারটা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচে। আমি তো চাইছিলাম যে, যে-কটা দিন বাঁচব, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা দেখছি অন্যরকম।

বিতানের সাংসারিক বুদ্ধি তার চতুরা সহধর্মিণীর সামনে লোপ পেয়ে যায়। সে কী বলবে না বলেবে ভাবছে ততক্ষণে তার গৃহিণী বলে ওঠে—বাবা! বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর কাজ হবে না। সইতে সইতে আমাদের বুকটা পাথর হয়ে গেছে। ছেলের জন্য যতখানি টান বাবার মনে থাকবে, ভাইদের তত কেন, তার অর্ধেকও থাকতে পারে না। আমি তো পষ্টাপষ্টি বলছি—আপনার রোজগারে গুমানের হক আছে, ওকে সোনার গ্রাসই খাওয়ান আর রুপোর দোলনাতেই দোলান, আমাদের অত বুকের পাটাও নেই, ক্ষমতাও নেই। আমাদের কুঁড়ে আমরা আলাদা তুলে নেব। হ্যাঁ, আমাদের যা কিছু পাওনা তা আমাদের পাওয়া চাই। ভাগবাঁটোয়ারা করে দিন। একটু লোক হাসাহাসি হবে তো হোক গে, আর কতদিন দুনিয়ার সামনে মান বাঁচিয়ে চলব?

নীতিবিশারদ বিতান যে এই জোরালো বক্তৃতায় বেশ অভিভূত হয়েছে তা তার খুশি খুশি চেহারাতেই প্রকাশ পায়। ওর নিজের এতখানি সাহস ছিল না যে এই প্রস্তাবটাকে এতটা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করতে পারে। নীতিজ্ঞ মহাশয় গম্ভীরভাবে বলেন—স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপনি বেঁচে থাকতে থাকতেই ভাগবাঁটোয়ারা করে যেতে পারেন, এর নজির রয়েছে। স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো ক্ষমতা জমিদারের নেই।

এরপর মোটাবুদ্ধি শানের পালা আসে। তবে ও বেচারা চাষাভুষো, বলদের পিছনে পিছনে চোখ বুজে চলার লোক,এমন গুরুতর বিষয়ে কী করে মুখ খোলে। দোটানায় পড়ে যায়। তখন ওর

স্পষ্টবাদিনী ধর্মপত্নী বড়ো জায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই কঠিন কার্যটি সম্পন্ন করে। বলে—বড়দি যা বলেছেন, এছাড়া আর কোনো পথ নেই। একজন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রোজগার করবে অথচ একটা পয়সাও নিজে ভোগ করতে পারবে না, গায়ের কাপড়টুকুনও জুটবে না, ওদিকে আরেকজন আরাম করে শুয়ে থাকবে, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিলবে, এমন অরাজক সংসারে আর আমাদের পোষাবে না।

শান চৌধুরিও এই প্রস্তাবে মুক্তকণ্ঠে সায় দেয়। এবারে বুড়ো চৌধুরিমশাই গুমানকে জিজ্ঞেস করেন—কী বাবা, তুমিও কি এতে রাজি? এখনও কিছু বিগড়ায়নি। এ আগুন এখনও নিভতে পারে। মুখ দেখতে কেউ চায় না, সবাই কাজ চায়। বলো, কী বলবে? কাজকর্ম কিছু করবে, না এখনও চোখ খোলেনি?

গুমানের মধ্যে ধৈর্যের অভাব নেই। এক কানে কথা শুনে আরেক কানে তা উড়িয়ে দেওয়া তার নিত্য কর্ম। কিন্তু দাদাদেরকে বউদের এমন আঁচলধরা হতে দেখে ওর মাথাটা গরম হয়ে যায়, বলে—দাদাদের যা ইচ্ছা আমার মনেও তাই। আমিও এই জঞ্জাল থেকে মুক্তি চাইছি। খাটাখাটুনি আমার দ্বারা হয়নি আর হবেও না। যার ভাগ্যে জাঁতাপেষা লেখা আছে, সে পিষুক গে। আমার ভাগ্যে আরাম করা লেখা আছে, আমি কেন ঝঞ্ঝাটে যাব? আমি তো কাউকে কাজ করতে বলি না। আপনারা কেন আমার পেছনে লেগে রয়েছেন? নিজেদের চরকায় তেল দিন না। আধ সের আটার অভাব আমার হবে না।

এমনতর সভা যে কতবার হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সভাগুলোর মতো এতেও কোনও উদ্দেশ্য সিধ্ব হয় না। দু-তিন দিন গুমান বাড়িতে খেতে আসে না। জতনসিং ঠাকুর শৌখিন লোক, ওঁরই বৈঠকখানায় পড়ে থাকে। শেষে বুড়ো চৌধুরিমশাই গিয়ে সেধে-সুধে নিয়ে আসেন। তারপর আবার সেই পুরানো গাড়ি ঢিমে তেতালায় হেলেদুলে চলতে থাকে।

চার

বামুনের বাড়ির ইঁদুরগুলো যেমন চতুর, চৌধুরিবাড়ির ছেলেপিলেগুলোও তেমনি। ওদের কাছে ঘোড়া বলতে মাটির ঘোড়া আর নৌকো বলতে কাগজের নৌকো। ফলের সম্বন্ধে ওদের অসীম জ্ঞান। ডুমুর আর বুনো কুল ছাড়া এমন কোনো ফলই নেই যাকে ওরা রোগের ডিপো মনে না করে। কিন্তু ফেরিওলা গুরদিনের খোমচায় এমন একটা প্রবল টান রয়েছে যে ওর হাঁক শুনলেই ওদের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি ব্যর্থ হয়ে যায়। ওরা যদি ঘুমিয়েও থাকে তবু আর পাঁচটা ছেলের মতো চমকে উঠে বসে। গুরদিন ঐ গাঁয়ে হপ্তায় হপ্তায় ফেরি নিয়ে আসে। ওর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আর আকাঙ্ক্ষায় কত ছেলের কিন্ডারগার্টেনের রঙচঙে গুলি ছাড়াই সবগুলো সংখ্যা আর দিনের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে। বুড়ো গুরদিন মলিন ও অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু আশেপাশে ওর নামটা ডানপিটে ছেলেদের কাছে হনুমানমন্ত্রের চেয়ে কম নয়। ওর গলা শুনলেই ওর ঝাঁকার উপর ছেলেদের এমন হামলা হয় যে মাছির অসংখ্য সেনাকেও রণে ভঙ্গ দিতে হয়। গুরদিনের কাছে একদিকে যেমন বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য থাকে মিঠাই অন্য দিকে বাচ্চাদের মায়েদের জন্য থাকে তার চেয়েও মিষ্টি মিষ্টি কথা। মায়েরা যতই না-না করুন না কেন, বারে বারে পয়সা না থাকার অজুহাত দেখান না

কেন, গুরদিন চটপট মিষ্টির ঠোঙা বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে—গিন্নিমা, পয়সার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না, আবার তো দেখা হবে, পালিয়ে তো আর যাচ্ছে না। নারায়ণ তোমাদের কোলে ছেলে দিয়েছেন, তাই তো আমিও ওদের ছিটেফোঁটা অনুগ্রহ পেয়ে যাচ্ছি, ওদের জন্যে আমরা ছেলেপিলেগুলোও তো বেঁচে আছে। এখনই কী, ভগবান যদি বিয়ে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন, দেখবেন তখন কেমন রং ঢং করি। গুরদিনের এই আচরণ ব্যাবসার ক্ষেত্রে যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তেরো টাকা ধারের চাইতে ন টাকা নগদে কেনা—কথাটা বাস্তব হলেও মিষ্টভাষী গুরদিনকে কখনও তার এই ব্যবহারের জন্য পস্তানোর বা তা সংশোধন করার দরকার পড়ে না।

আজ শুভ মঙ্গলবার। ছেলেরা খুবই অস্থির হয়ে নিজের নিজের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে গুরদিনের পথ চেয়ে আছে। কয়েকটি উৎসাহী ছেলে গাছে গিয়ে উঠছে আর কেউ কেউ অনুরাগে আকুল হয়ে গাঁয়ের বাইরে চলে গেছে। সূর্যঠাকুর তাঁর সোনালি থালাখানা নিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। এমন সময় গুরদিনকে আসতে দেখা যায়। ছেলেরা ছুটে গিয়ে ওর কাপড় ধরে নিজেদের মধ্যে টানাটানি শুরু করে দেয়। এ বলে, আমাদের বাড়ি চলো, ও ওদের বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানায়। সবার আগে পড়ে ভানু চৌধুরির বাড়ি। গুরদিন তার খোমচাটি নামায়। মিষ্টি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। ছেলেপুলেদের আর তাদের মায়েদের ভিড় জমে যায়। হর্ষ-বিষাদ, সন্তোষ-লোভ, ঈর্ষা-ক্ষোভ, হিংসা-দ্বেষের নাট্যশালা তৈরি হয়ে যায়। আইন বিশারদ বিতানের পত্নী তার ছেলে তিনটেকে নিয়ে বেরিয়ে অসে। শানের বউও তার ছেলে দুটিকে নিয়ে হাজির হয়। গুরদিন মিষ্টি কথা বলতে শুরু করে। পয়সা থলেতে রাখে, আধ পয়সার মিষ্টি দেয় আর আধপয়সার আশীর্বাদ। ঠোঙা হাতে নাচতে নাচতে ছেলেরা গিয়ে বাড়িতে ঢোকে। সারা গাঁয়ে যদি এমন কোনো শিশু থাকে যে গুরুদিনের এ উদারতা থেকে বঞ্চিত, তবে সে হল বিলাসী গুমানের ছেলে ধান।

ভাইবোনদের হেসে হেসে নেচে নেচে মিষ্টি খেতে দেখে আত্মসংবরণ করতে পারা ছোট্ট ছেলে ধানের পক্ষে খুব কঠিন। তার উপর আবার ওরা ওকে মিষ্টি দেখিয়ে দেখিয়ে লোভ দেখাচ্ছে আর রাগাচ্ছে। ধান বেচারা কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের আঁচল ধরে দরজার দিকে টানতে শুরু করে, কিন্তু ওই বেচারি কী করবে? ছেলেটার জন্য ওর বুকটা মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। হাতে ওর একটা কানাকড়িও নেই। নিজের পোড়া কপালের জন্য, জায়েদের নিষ্ঠুরতায় আর সবচেয়ে বেশি তার স্বামীর অকর্মণ্যতায় সে গুমরে গুমরে মরে। স্বামীটি তার এমন নিষ্কর্মার ঢেঁকি না হলে কেন অন্যের মুখ চেয়ে থাকতে হবে, কেন অন্যের খোঁটা সইতে হবে। ধানকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে সে তাকে বোঝায়—বাবা, কাঁদে না, এর পরের বার গুরদিন এলে আমি তোমাকে আরও বেশি মিষ্টি কিনে দেব। এর চেয়েও ভালো মিষ্টি আমি তোমাকে বাজার থেকে আনিয়ে দেব। কত মিষ্টি খাবে তুমি? বলতে বলতে ওর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। আজ আবার সেই অলুক্ষনে মঙ্গলবার, আজ আবার এসব ছুতোই দেখাতে হবে। হায়, আমার কচি সোনা ছেলেটা আধ পয়সার মিষ্টির জন্য কান্নাকাটি করবে আর এ বাড়িতে একটি লোকেরও পাথরের মতো বুকটা একটুও গলবে না। বেচারি এদিকে এসব কথা ভাবছে আর ওদিকে ধান কোনো মতেই চুপ করছে না! কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না দেখে মায়ের কোল থেকে নেমে ধান মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে। আর চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে দুনিয়া মাথায় করে তোলে। মা অনেক বোঝায়, ভোলাতে চায়, শেষ পর্যন্ত ছেলের এত জেদ দেখে প্রচণ্ড রাগ হয়। মানুষের মনের রহস্য বোঝা ভার। এই তো ছেলেকে আদর করে বুকে টেনে নিল, আর এখন এমন রেগে উঠল যে জোরসে দু-তিনটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল—চুপ! চুপ কর হতচ্ছাড়া! তুই আবার মিষ্টি খাবি? নিজের দিন চলে না মিষ্টি খাবেন।

ফুলবাবু গুমান তার ঘরের দরজায় বসে বসে এসব কৌতুক মন দিয়ে দেখছিল। ছেলেটাকে সে খুব ভালোবাসত। এখনকার এই থাপ্পড়টা গুমানের মর্মস্থলে একটা সুতীক্ষ্ণ বর্শার মতন গিয়ে বেঁধে। হয়তো থাপ্পড়টার উদ্দেশ্যটাও ছিল তাই। ধুনুরি তুলোকে ধুনবার জন্যই তো তাঁতে চোট লাগায়।

পাথরে আর জলে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, মানুষের মনেও তেমনি সুন্দর সুকুমার বৃত্তিগুলি লুকিয়ে থাকে, তা মানুষটি যতই ক্রূর এবং কঠোর হোক না কেন। গুমানের চোখদুটি জলে ভরে ওঠে। এই চোখের জল অনেক সময় আমাদের হৃদয়ের মলিনতাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। গুমানের চৈতন্যোদয় হয়। ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে সে বুকে তুলে নেয়, নিয়ে স্ত্রীকে কাতরকণ্ঠে বলে—ছেলেটার উপর এত রাগ কেন করছ? আসল দোষী তো আমি, আমাকে যা খুশি সাজা দেবার দাও। ভগবান যদি মুখ তুলে চান তাহলে কাল থেকে এই সংসারে আমার আর আমার ছেলেপুলেদেরও আদরযত্ন হবে। তুমি আজ আমাকে চিরকালের জন্য এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছ যে, আমার কানে তা শাঁখের আওয়াজের মতো বেজে উঠে বলছে: 'এবার কাজে লাগো হে!'

(শঙ্খনাদ) অনুবাদ ননী শূর

পঞ্চ-পরমেশ্বর

জুম্মন শেখ আর অলগু চৌধুরির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ভাগে চাষবাস হয়। কিছু লেনদেনও চলে। একের উপর অপরের অটল বিশ্বাস। জুম্মান যেবার হজ করতে যায় সেবার তার বাড়িঘর অলগুর হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল, আর অলগু যখনই বাইরে যেত, জুম্মনের উপর তার ঘরবাড়ির ভার দিয়ে যেত। ওদের মধ্যে না আছে খাওয়াদাওয়ার সম্পর্ক, না আছে ধর্মের মিল, আছে শুধু চিন্তাভাবনার মিল। বন্ধুত্বের মূলমন্ত্রও তাই।

এই বন্ধুত্বের জন্ম সেই ছেলেবেলায়, যখন দুই বন্ধুই ছোটো ছিল আর জুম্মনের পূজনীয় পিতা জুমরাতি ওদের বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। অলগু গুরুমশাইয়ের অনেক সেবাযত্ন করেছিল—খুব রেকাবি মেজেছিল, খুব পেয়ালা ধুয়েছিল। গুরুমশায়ের হুঁকোটা এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নিতে পেত না, কেননা প্রতিটি ছিলিম অলগুকে আধঘন্টা ছুটি মিলিয়ে দিত। অলগুর বাবা ছিলেন পুরোনো চিন্তাধারার মানুষ। শিক্ষা অপেক্ষা গুরুর সেবা-শুশ্রূষার উপরে তাঁর বেশি বিশ্বাস। তিনি বলতেন—বিদ্যা পড়াশোনা করে হয়না, যেটুকু হয় গুরুর আশীর্বাদে হয়। এজন্য গুরুমশাইয়ের কৃপাদৃষ্টি চাই। অতএব জুমরাতি শেখের আশীর্বাদ কিংবা সৎসঙ্গের কোনো ফল যদি অলগুর উপরে না ফলে, তাহলে এই ভেবে মনকে তিনি সান্ত্বনা দেবেন যে, বিদ্যা উপার্জনে সাধ্যমতো কোনো ত্রুটি আমি রাখিনি। বিদ্যালাভ ওর ভাগ্যে নেই তো কী করে হবে?

স্বয়ং জুমরাতি শেখ কিন্তু আশীর্বাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের বেতের উপরেই তাঁর বেশি আস্থা ছিল, আর এই বেতের প্রতাপেই আশপাশের সব গাঁয়ে জুম্মনের আজ খাতির। জুম্মনের মুসাবিদা করা বন্ধকিপত্র-স্বত্বপাট্টার উপর কাছারির মুহুরিও কলম চালাতে পারে না। এ এলাকার ডাকপিয়োন, কনস্টেবল আর তহশিলের চাপরাশি—সবাই জুম্মনের কৃপাকাঙ্ক্ষী। তাই অলগুর খাতির যেখানে তার পয়সাকড়ির জন্য, সেখানে জুম্মন শেখ তার অমূল্য বিদ্যার গুণেই সবার সমাদরের পাত্র।

দুই

এক বুড়ি মাসি ছিল জুম্মন শেখের। মাসির সামান্য কিছু জমিজমা ছিল। নিকট আত্মীয় বলতে মাসির কেউ ছিল না। লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেসমস্ত জমিজমা জুম্মন নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। যদ্দিন দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়নি, তদ্দিন মাসির খুব যত্নআত্তি হয়েছে, খুব মুখরোচক জিনিস তাকে খাওয়ানো হয়েছে। হালুয়া-পোলাওর যেন বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু রেজিস্ট্রির সিলমোহর

এসব আদর-যত্নের উপরেও যেন সিলমোহর মেরে দিয়েছে। জুম্মনের স্ত্রী করিমন বুটির সঙ্গে কিছু তেতো কথার কড়া ঝাল-তরকারিও দিতে শুরু করেছে। জুম্মন শেখও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। বেচারি মাসিকে আজকাল প্রায় রোজই এমনতর শুনতে হয়।

বুড়িবেটি কে জানে কদ্দিন বাঁচবে? দু-তিন বিঘা নোনাজমি দিয়েছে কি না দিয়েছে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। সম্বরা দেওয়া ডাল ছাড়া গলা দিয়ে বুটি নামে না। যে টাকা ওর পেটে গোঁজা হয়ে গেছে তা দিয়ে তো অ্যাদ্দিনে একখানা গাঁ কিনে ফেলতাম।

মাসি কিছুদিন সহ্য করে, কিন্তু আর যখন সহ্য হয় না তখন জুম্মনের কাছে গিয়ে নালিশ করে। কর্ত্রীর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করাটা জুম্মন উচিত মনে করে না। আরও কিছুদিন এমনি করেই কেঁদেকেটে চলে যায়। অবশেষে একদিন মাসি এসে জুম্মনকে বলে—বাপু! তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। তুমি আমাকে টাকা ধরে দিও, আমি আলাদা রেঁধে খাব।

জুম্মন নির্লজ্জভাবে জবাব দেয়—টাকা কি এখানে গাছে ধরে?

মাসি নরম গলায় বলে—আমারও দুটো রুখাশুখা চাই কিনা বল?

জুম্মন গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়—তা, কেউ কি ভেবেছিল যে তুমি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে এসেছ?

মাসি চটে যায়। পঞ্চায়েত করার হুমকি দেয়। জুম্মান হাসে, হরিণকে জালের দিকে এগোতে দেখলে শিকারি যেভাবে হাসে। বলে—হ্যাঁ, পঞ্চায়েত করবে বই কী। ফয়সালা হয়ে যাক। আমারও রাতদিনের এই খিটিমিটি ভালো লাগে না।

পঞ্চায়েতে কার জিত হবে এ বিষয়ে জুম্মনের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আশপাশের গাঁয়ে এমন কে আছে যে তার অনুগ্রহের ঋণী নয়? এমন কে আছে যে তাকে শত্রু করতে সাহস করবে? কার এতটা সাধ্যি আছে যে তার বিরুদ্ধাচারণ করবে? আসমান থেকে ফেরেশতা তো আর পঞ্চায়েত করতে আসবে না?

তিন

এরপর কদিন ধরে বুড়ি মাসি লাঠিতে ভর দিয়ে আশপাশের সব গাঁয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। কোমর বেঁকে যেন ধনুক, এক এক পা চলা মুশকিল। কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন একটা সমাধান হয়ে যাওয়া দরকার।

এমন ভদ্রলোক কমই আছে যার সামনে বুড়ি তার দুঃখের কাঁদুনি গায় না। কেউ তো এমনি হুঁ হাঁ করে এড়িয়ে যায়। কেউ এই অন্যায় দেখে দিনকালকে গালাগালি দিয়ে বলে—কবরে পা ঝুলছে, আজ মরুক বা কাল, কিন্তু খাঁই মিটছে না। তোমার এখন কী চাই? বুটি খাও, আল্লার নাম নাও। জমিজমা দিয়ে তোমার কী কাজ? কিছু এমন লোকও আছে যারা বেশ হাস্যরসের খোরাক পেয়ে যায়। নুয়ে পড়া কোমর, ফোকলা মুখ, শণের মতো চুল—এতগুলো সামগ্রী এক জায়গায় জুটলে হাসি পাবে না কেন? ন্যায়নিষ্ঠ, দয়ালু, দীনবৎসল এমন মানুষ খুবই কম যারা এই অবলার দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনবে কিংবা তাকে সান্ত্বনা দেবে। চারদিকে ঘুরে ফিরে বেচারি অলগু

চৌধুরির কাছে আসে। লাঠিগাছাকে ফেলে দম নিয়ে বলে—বাবা, তুমিও কিছুক্ষণের জন্য পঞ্চায়েতে এসো।

অলগু—আমাকে ডেকে কী করবে? অনেক গাঁয়ের মানুষজন তো আসবেই।

মাসি—বিপদের কথা তো সবার কাছেই বলে এসেছি, আসা না আসা ওদের হাতে।

অলগু—তা যেতে বলছ আমি যাব, তবে পঞ্চায়েতে কিন্তু মুখ খুলব না।

মাসি—কেন বাবা?

অলগু—এর আর কী জবাব দেব? আমার খুশি! জুম্মন আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওর সঙ্গো মন কষাকষি করতে পারিনা।

মাসি—বাছা, মন কষাকষির ভয়ে কি ন্যায়ের কথা বলবে না?

আমাদের সুপ্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ তার সমস্ত সম্পদ লুট হয়ে গেলেও টের পায় না। কিন্তু আহ্বান শুনলে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন আর কেউ সেই ন্যায়-অন্যায় বোধকে পরাজিত করতে পারে না। বুড়ির এ প্রশ্নের কোনো জবাব অলগু দিতে পারে না। তবে হৃদয়ে এই কথাগুলো যেন গুঞ্জিত হয়ে চলে—মনকষাকষির ভয়ে কি ন্যায়ের কথা বলব না?

চার

সন্ধ্যার সময় একটা গাছের নীচে পঞ্চায়েত বসে। শেখ জুম্মন আগে থেকেই ফরাশ পেতে রেখেছে। পান, এলাচ, হুঁকো, তামাক ইত্যাদির ব্যবস্থাও করেছে। হ্যাঁ, নিজে অবশ্য সে অলগু চৌধুরির সঙ্গো একটু দূরে বসে আছে। কেউ পঞ্চায়েতে এলে চাপা গলায় সেলাম করে তাকে অভ্যর্থনা করে। সূর্য অস্ত গেলে গাছের উপর পাখপাখালির কলরবযুক্ত পঞ্চায়েত বসে যায়, গাছের নীচেও তখন পঞ্চায়েত আরম্ভ হয়। ফরাশের প্রতি আঙুল জায়গা ভরে ওঠে, তবে বেশির ভাগই দর্শক। নিমন্ত্রিত মহোদয়দের মধ্যে শুধু তাঁরাই পদার্পণ করেছেন, যাঁদেব জুম্মনের প্রতি কিছু প্রতিশোধ স্পৃহা আছে। এক কোণে আগুন জ্বলছে। নাপিত চটপট কলকে সাজছে। এটা বোঝা অসম্ভব যে পোড়া ঘুঁটে দিয়ে বেশি ধোঁয়া বেরোচ্ছে না কলকের দম থেকে। ছেলেছোকরারা এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে। কেউ নিজেদের মধ্যে গালিগালাজ করছে, কেউ কাঁদছে, চারদিকে হই হই। গাঁয়ের কুকুরগুলো এই জমায়েতকে ভোজ ভেবে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জুটেছে।

পঞ্চের লোকজন বসে পড়লে বুড়ি মাসি ওদের কাছে মিনতি জানায়—পঞ্চের বাবুমশায়রা, আজ তিন সাল হল আমি আমার সমস্ত জমিজমা আমার বোনপোর নামে লিখে দিয়েছি। একথা হয়তো আপনারা জানেন। আমাকে সারাজীবন ভাতকাপড় দেবে বলে জুম্মন কবুল করেছে। এক বছর আমি ওরে সঙ্গো কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়েছি, কিন্তু এখন দিনরাত এই কান্নাকাটি আর সয় না। না পাই আমি পেট পুরে খেতে, না পাই একখানা কাপড় পরতে। অসহায় বিধবা আমি। কাছারি-আদালত করতে পারি না। আপনাদের কাছে ছাড়া আর কার কাছে আমার দুঃখের কথা বলব? আপনারা যে পথ বাতলে দেবেন, সে পথেই চলব। আমার যদি কোনো দোষ দেখেন, আমার মুখে থাপ্পড় মারুন। জুম্মনের মধ্যে যদি দোষ দেখেন তাহলে ওকে বোঝান। কেন এক অসহায় বুড়ির শাপ কুড়োচ্ছে? পঞ্চের হুকুম আমি মাথা পেতে নেব।

রামধন মিশ্র, যার কজন প্রজাকে জুম্মন নিজের গাঁয়ে এনে বসিয়েছে, বলে ওঠে—জুম্মন মিএগা, কাকে পঞ্চ মানছ? এখনই এর মীমাংসা করে নাও। তারপর পঞ্চ যা বলবে, তাই মানতে হবে।

সদস্যদের মধ্যে জুম্মনের এখন বিশেষ করে সেসব মানুষই চোখে পড়ে যাদের সঙ্গে কোনো না কোনো কারণে ওর শত্রুতা রয়েছে। জুম্মন বলে—পঞ্চের হুকুম আল্লার হুকুম। মাসি যাকে ইচ্ছে পঞ্চ মানুন, আমার কোনো আপত্তি নেই।

মাসি চেঁচিয়ে বলে ওঠে—ওরে আমার আল্লার বান্দা রে! পঞ্চের নাম কেন বলছিস না? আমিও তো একটু জানতে পারি।

জুম্মন রেগে বলে—এখন আর আমার মুখ খুলিয়ো না। তোমার এখন সময় পড়েছে, যাকে খুশি পঞ্চ মানো।

জুম্মনের আক্ষেপটা মাসি বুঝতে পারে। বলে—বাপু! খোদাকে ভয় করো। পঞ্চ কারুর দোস্তও নয়, দুশমনও নয়। এ কেমন কথা বলছিস? তোর যদি কারুর উপরই বিশ্বাস না হয় তো ঠিক আছে অলগু চৌধুরিকে তো মানবি? নে, আমি ওকেই সরপঞ্চ মানছি। জুম্মন শেখ আনন্দে উৎফুল্ল হয় উঠে, কিন্তু মনোভাব গোপন করে বলে—বেশ চৌধুরিই সই। আমার কাছে রামধন মিশ্র যা, অলগুও তাই।

অলগু এসব ঝামেলায় জড়াতে চাইছিল না। সে গাঁইগুঁই করে—মাসি, তুমি তো জানো জুম্মনের সঙ্গে আমার খুব দোস্তি।

মাসি গম্ভীর গলায় বলে—বাব! দোস্তির জন্য কেউ তার ইমান বেচে দেয় না। পঞ্চের অন্তরে খোদা বাস করে। পঞ্চের মুখ থেকে যে বাত বের হয় তা খোদার তরফ থেকে বের হয়।

অলগু চৌধুরি সরপঞ্চ হয়। রামধন মিশ্র এবং জুম্মনের আর সব বিরোধীরা বুড়িকে মনে মনে খুব গালাগালি দেয়।

অলগু চৌধুরি বলে—জুম্মন শেখ! তুমি আর আমি অনেক দিনের বন্ধু। যখন দরকার পড়েছে, তুমি আমাকে সাহায্য করেছ আর আমিও যতখানি পেরেছি তোমাকে সেবা করে এসেছি। কিন্তু এখন তুমি আর বুড়ি মাসি দুজনই আমার চোখে সমান। পঞ্চের কাছে তোমার যা কিছু আরজি আছে বল।

জুম্মনের পুরো বিশ্বাস এবার বাজি তার। অলগু এসব লোকদেখানো কথা বলছে, অতএব শান্ত মনে বলে—পঞ্চের মশাইরা! আজ তিন সাল হল, মাসি তাঁর সম্পত্তি আমার নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। আমি ওঁকে আজীবন ভাতকাপড় দিতে কবুল করেছি। খোদা সাক্ষী আছেন, আজ পর্যন্ত আমি মাসিকে কোনো তকলিফ দিই নি। মাসিকে আমি নিজের মায়ের মতো মানি। ওঁর খিদমত করা আমার কর্তব্য, কিন্তু মেয়েছেলেদের মধ্যে কিছু না কিছু অবনিবনা লেগেই থাকে। এতে আমার কতটুকু হাত? মাসি আমার কাছে আলাদা করে মাসোহারা চাইছেন। জমিজমা যেটুকু আছে তা পঞ্চের কাছে গোপন নেই। তা থেকে এত আয় হয় না যে আমি মাসোহারা দিতে পারি। এছাড়া দানপত্রেও মাসোহারার কোনও উল্লেখ নেই, থাকলে ভুলেও আমি এই ঝামেলায় জড়াতাম না। ব্যস, শুধু এটুকুই আমার বলার আছে। এখন পঞ্চের ইচ্ছা, যেমন খুশি ফয়সালা করুন।

অলগু চৌধুরির প্রায়ই কাছারিতে কাজ পড়ে, অতএব পুরোপুরি কায়দাকানুন জানা মানুষ সে। জুম্মনকে জেরা করতে শুরু করে দেয়। একটার পর একটা প্রশ্ন জুম্মনের হৃদয়ে যেন হাতুড়ির আঘাতের মতো পড়ে। রামধন মিশ্র এসব প্রশ্ন শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। জুম্মন একথা ভেবে অবাক হয় যে অলগুর আজ হল কী! এই খানিক আগেও আমার সঙ্গে বসে কত রকমের কথা বলছিল। এরই মধ্যে এমন বদলে গেল যে আমার শেকড় ওপড়াতে উঠে পড়ে লেগেছে। কী জানি কবেকার কোন গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে? এতদিনের দোস্তি কি কোনো কাজে আসবে না?

এসব ভাবনাচিন্তায় জুম্মন শেখ মগ্ন, এরই মধ্যে অলগু ফয়সালা শোনায়—জুম্মন শেখ! পঞ্চায়েত এই মামলার বিচার করেছে। পঞ্চের কাছে এটাই ন্যায়সংগত বলে মনে হচ্ছে যে মাসিকে মাসোহারা দেওয়া হোক। আমাদের ধারণা হল মাসির জমিজমা থেকে এতটা আয় অবশ্যই হচ্ছে যে মাসোহারা দেওয়া যেতে পারে। ব্যস, এই আমাদের বিচার। মাসোহারা দিতে জুম্মন যদি রাজি না হয়, তাহলে দানপত্র রদ বলে ধরে নেওয়া হবে।

পাঁচ

বিচার শুনেই জুম্মন থ মেরে যায়। দোস্ত যদি দুশমনের মতো ব্যবহার করে, যদি গলায় ছুরির পোঁচ দেয় তাহলে তাকে সময়ের ফের ছাড়া আর কী বলব? যার উপর পুরো ভরসা ছিল, সে সময় বুঝে ধোঁকা দিল। এমন সময়েই তো আসল আর মেকি বন্ধুর যাচাই হয়। এই হল কলিকালের দোস্তি। মানুষ এমন কপট, ধোঁকাবাজ না হলে দেশে বিপদ আপদের প্রকোপ হবে কেন? কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি যত সব ব্যাধি তো এসব দুষ্কর্মেরই দণ্ড।

এদিকে রামধন মিশ্র আর পঞ্চায়েতের সবাই অলগু চৌধুরির এই নীতিপরায়ণতাকে মন খুলে প্রশংসা করছে। বলছে—একেই বলে পঞ্চায়েত। একেবারে দুধকে দুধ জলকে জল। দোস্তির জায়গায় দোস্তি, কিন্তু ধর্মপালন করা সবার আগে। এমন সত্যবাদীদের জন্যই জগৎটা টিকে আছে, নইলে কবেই সব রসাতলে চলে যেত।

এই বিচার অলগু আর জুম্মনের বন্ধুত্বের একেবারে শেকড় ধরে নাড়া দেয়। আজকাল ওদের একসঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় না। এতদিনের প্রাচীন বন্ধুত্বরূপী বৃক্ষটি সত্যের মৃদু আঘাতও সইতে পারল না। সত্যিসত্যিই সেটি বালির উপরে দাঁড়িয়েছিল।

ওদের মধ্যে আজকাল শিষ্টাচারেরই বেশি চলন হয়েছে। একজন আর একজনের আদর অভ্যর্থনা বেশি করে করতে শুরু করেছে। ওরা মেলামেশা করে বটে, তবে ঠিক তেমনি করে যেমনি করে ঢাল মেশে তলোয়ারের সঙ্গে। বন্ধুর কুটিলতা জুম্মনের মনকে অষ্টপ্রহর খোঁচা দিতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তার চিন্তা—কোনোমতে বদলা নেবার সুযোগ যদি পেতাম!

ছয়

সৎ কাজের অভীষ্টসিদ্ধিতে বড়ো দেরি হয়, কিন্তু অসৎ কাজে সিদ্ধি লাভে তা হয় না। জুম্মনেরও বদলা নেবার সুযোগ তাড়াতাড়ি মিলে যায়। গেল বছর অলগু চৌধুরি বটেসর থেকে একজোড়া খুব ভালো বলদ কিনে এনেছিল। বলদ দুটো পশ্চিমা জাতের — সুন্দর, বড়ো বড়ো শিংওয়ালা।

কয়েক মাস ধরে আশপাশের গাঁয়ের লোক ওদের দর্শন করতে থাকে। দৈবযোগে জুম্মনের পঞ্চায়েতের মাস খানেক বাদেই বলদ জোড়ার একটি বলদ মরে যায়। জুম্মন বন্ধুদের কাছে বলে—এ হল গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। মানুষ সবুর করলেও খোদা ভালোমন্দ সবই দেখেন।

অলগুর সন্দেহ হয় জুম্মনই বলদটাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। চৌধুরি-বউ জুম্মনের ঘাড়েই এই দুর্ঘটনার দোষারোপ করে। বলে—জুম্মন কিছু করিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে চৌধুরিগিন্নি আর করিমনের মধ্যে একদিন খুবই বচসা হয়। দুই দেবীই শব্দবাহুল্যের বন্যা বইয়ে দেয়। ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি, অপশব্দ আর উপমা ইত্যাদি অলংকারের সাহায্যে কথা হয়। জুম্মন কোনো রকমে শান্ত করে। বিবিকে ধমকধামক দিয়ে বোঝায়। তাকে সে রণভূমি থেকে সরিয়েও নিয়ে যায়। ওদিকে অলগু চৌধুরি বোঝানো শোনানোর কাজটা সারে তার যুক্তিপূর্ণ বেতের সাহায্যে।

একটা বলদ এখন কোন কাজে লাগে? ওর জুড়ি অনেক খোঁজা হয়, কিন্তু মেলে না। শেষমেষ এটাই ঠিক হয় যে ওটাকে বেচে দেওয়াই ভালো। গাঁয়ে আছে এক সমঝু সাহু, এক্কা গাড়ি হাঁকায়। গাঁ থেকে গুড়, ঘি চাপিয়ে সে হাটে যায় আর হাট থেকে তেলনুন চাপিয়ে এনে গাঁয়ে বেচে। বলদটাকে দেখে তার মনটা দুলে উঠে। ভাবে, বলদটাকে পেলে সারাদিনে হয়তো তিন খেপ দেওয়া যাবে। আজকাল তো এক খেপ দেওয়াই ভার। বলদটাকে দেখে, গাড়িতে জুতে দৌড়োয়, লক্ষণ বিচার করায়, দরদাম করে, তারপর ওটাকে নিয়ে এসে বাড়ির দরজায় বেঁধেই দেয়। এক মাস বাদে দাম চুকানোর কথা দেয়। চৌধুরিরও গরজ তো আছেই, লোকসানের চিন্তা করে না।

সমঝু সাহু নতুন বলদ পেয়ে সেটাকে খুব ছোটাতে লাগল, দিনে তিন-তিন চার-চার খেপ দিতে শুরু করে। না খড়বিচালির চিন্তা, না জলের, কাজ শুধু খেপ নিয়ে। হাটে নিয়ে যায়, সেখানে কিছু শুকনো ভূষি সামনে ফেলে দেয়। জানোয়াব বেচারা একটু দম নিতে না নিতেই আবার এনে জুতে দেয়। অলগু চৌধুরির বাড়িতে যখন ছিল তখন মনের সুখে দিন কাটত। ছমাসে নমাসে কখনও গাড়িতে জোতা হলে খুব লাফঝাঁপ দিত আর ক্রোশের পর ক্রোশ দৌড়ে যেত। বলদ সেখানে খুব সুখে ছিল। সেখানে খড়বিচালি, পরিষ্কার জল, অড়হর ডালবাটা, ভূষির সঙ্গে খোল, শুধু তাই নয় মাঝেমাঝে ঘিয়ের স্বাদও চাখতে পেত। সকাল-সন্ধে একজন লোক দলাইমলাই করত, গা মুছে দিত আর হাত বুলিয়ে দিত। কোথায় সেই সুখ আর আরাম আর কোথায় এই অষ্ট প্রহরের খাটুনি। মাস খানেকের মধ্যেই বলদটি কাহিল হয়ে পড়ল। গাড়ির জোয়াল দেখলেই ওর প্রাণ শুকিয়ে যায়। হাড়গোড় সব বেরিয়ে পড়েছে, তবে বলদটি বড়ো তেজি, মার সয় না।

একদিন চতুর্থ খেপে সাহু দুনো বোঝা চাপায়। সারাদিনের শ্রান্তক্লান্ত জানোয়ার, পা আর চলে না। তার উপর সাহু হাঁকড়াতে শুরু করে। ব্যস, আর কি, বলদ বুক ফাটিয়ে ছোটে। খানিক দূর সে ছুটে যায় তারপর চায় যে একটু দম নিয়ে নেবে, কিন্তু সাহুর বাড়ি পৌঁছনোর তাড়া, তাই সে কয়েক ঘা চাবুক বড়ো নির্দয়ভাবে হাঁকড়ায়, বলদ আর একবার জোর লাগায়, কিন্তু এবারে তার দম ফুরিয়ে যায়। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, আর এমনভাবে পড়ে যে আর ওঠে না। সাহু খুব পেটায়, পা ধরে টানে, নাকের ভেতর ছড়ি ঠুঁসে দেয়। কিন্তু মরা কি কখনও ওঠে? সাহুর তখন কিছুটা সন্দেহ হয়। বলদটাকে ভালো করে দেখে, জোয়াল খুলে আলাদা করে, তারপর ভাবতে থাকে গাড়ি কী করে বাড়ি পৌঁছবে। খুব চিৎকার-চেঁচামেচি করে, কিন্তু গাঁয়ের রাস্তা বাচ্চা ছেলেদের

চোখের মতো, সন্ধে হতে না হতেই বন্ধ হয়ে যায়, কাউকে দেখা যায় না। আশেপাশে কোনও গাঁও নেই। রাগের চোটে সে মরা বলদের উপর আরও চাবুক চালায় আর গালাগালি দিতে থাকে, হতভাগা! মরবিই যদি তো বাড়ি গিয়েই মরতিস। শালা মাঝ রাস্তাতেই মরলি! এখন গাড়ি কে টানে? এভাবে সাহু রেগে জ্বলে যায়। কয়েক বস্তা গুড় আর কয়েক পিপে ঘি সে বেচেছে, দুশো-আড়াইশো টাকা কোমরে বাঁধা। এছাড়া গাড়িতে বেশ কয়েক বস্তা নুন, কাজেই ফেলে রেখে যেতেও পারছে না। বাধ্য হয়ে বেচারা গাড়িতেই শুয়ে পড়ে। ওখানেই রাতটা জেগে কাটানো মনস্থ করে, কলকে টানে, গান গায়, তারপর হুঁকো টানে। এভাবে সাহু মাঝরাত অবধি ঘুমটাকে আটকে রাখে। আপন জ্ঞানমতো তো সে জেগেই থাকে, কিন্তু আলো ফুটে উঠলে ঘুম ভাঙতে কোমরে হাত দিয়ে দেখে থলে গায়েব। ভয় পেয়ে এদিকে ওদিকে তাকায়, দেখে কয়েক ক্যানেস্তারা তেলও উধাও। আপশোশ করতে করতে বেচারা মাথা চাপড়ায়, আছাড়ি পিছাড়ি খায়। সকাল বেলা বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায়। সাহুগিন্নি এই দুঃসংবাদ শুনে প্রথমে তো কাঁদে, তারপর অলগু চৌধুরিকে গালাগালি দিতে থাকে, হতভাগা এমন অলক্ষুনে বলদ দিল যে সারাজীবনের রোজগার মাঠে মারা গেল।

এই ঘটনার পরে কয়েক বছর কেটে গেছে। যখনই অলগু বলদের দাম চায়, সাহু আর তার গিন্নি দুজনেই খ্যাপা কুকুরের মতো তেড়ে আসে আর আজেবাজে বকতে শুরু করে—বাঃ! এদিকে সারাজীবনের রোজগার লুট হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল, ওঁর দামের চিন্তা। মরা বলদ দিয়ে তার উপর দাম চাইতে আসছে। চোখে ধুলো দিয়েছে, সর্বনাশা বলদ গছিয়ে দিয়েছে, আমাদের একেবারে বুদ্ধু ঠাওরেছে। আমরাও বেনের বাচ্চা, বুদ্ধু নই। আগে কোনো ডোবায় গিয়ে মুখটা ধুয়ে এসো, তারপর দাম নিয়ো। মন যদি না মানে তবে আমাদের বলদটাকে খুলে নিয়ে যাও, এক মাসের জায়গায় দুমাস খাটিয়ে নাও। টাকা নেবে কী?

চৌধুরির অহিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। এসব ক্ষেত্রে ওরাও একজোটে সাহুর বকবকানিকে সমর্থন করে। এভাবে ভর্ৎসনা শুনে চৌধুরি বেচারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু দেড়শো টাকা এভাবে ছেড়ে দেওয়াও সহজ কথা নয়। একবার সেও মাথা গরম করে উঠে। সাহু রেগেমেগে লাঠি খুঁজতে ঘরে ঢোকে। সাহুগিন্নি রণক্ষেত্রে নেমে পড়ে। কথা কাটাকাটি হতে হতে হাতাহাতির অবস্থা এসে পড়ে। সাহুগিন্নি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেয়। শোরগোল শুনে গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা জড়ো হয়ে যান। ওঁরা দুজনকেই বোঝান। সাহুকে আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বের করেন। ওঁরা পরামর্শ দেন এভাবে মাথা ফাটাফাটি করে কাজ হবে না। পঞ্চায়েত করাও। যাই সাব্যস্ত হবে মেনে নাও। সাহু রাজি হয়ে যায়। অলগুও মেনে নেয়।

সাত

পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি চলতে থাকে। উভয় পক্ষ নিজের নিজের দল বানাতে শুরু করে। তৃতীয় দিনে সেই একই গাছের নীচে আবার পঞ্চায়েত বসে। সেই সন্ধ্যার সময়। খেতগুলোতে কাকেরা পঞ্চায়েত করছে। বিবাদের বিষয়টা হল এই—মটর শুঁটির উপর ওদের স্বত্ব আছে কি নেই আর যতদিন এই প্রশ্নটার মীমাংসা না হয়, ততদিন ওরা পাহারাদারের চিৎকারে নিজেদের অপ্রসন্নতা প্রকট করা

আবশ্যক মনে করে। গাছের ডালের উপরে বসে থাকা শুকমণ্ডলীতে এই প্রশ্ন উঠেছে যে, মানুষ নিজেই যখন আপন বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন কী আর আমাদের হৃদয়হীন বলার অধিকার থাকে?

পঞ্চায়েত বসলে রামধন মিশ্র বলে—আর দেরি কেন? পঞ্চের নির্বাচন হয়ে যাওয়া দরকার। বলো চৌধুরি কাকে কাকে পঞ্চ মানছ?

অলগু বিনীতভাবে বলে—সমঝু সাহুই বেছে নিক?

সমঝু উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে—আমার দিক থেকে জুম্মন শেখ।

জুম্মনের নাম শুনেই অলগু চৌধুরির বুকটা ধকধক করতে থাকে। যেন কেউ হঠাৎ থাপ্পড় মেরে বসেছে। রামধন অলগুর বন্ধু। ব্যাপারটা যেন অনুমান করে নেয়। জিজ্ঞেস করে, কী হে চৌধুরি, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

চৌধুরি হতাশ হয়ে বলে—না, আমার আর কী আপত্তি হবে?

আমাদের দায়িত্ববোধ অনেক সময় আমাদের সংকীর্ণতা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পথ ভুলে আমরা যখন এদিক ওদিকে ঘুরতে থাকি, তখন এই দায়িত্ববোধই আমাদের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক হয়ে উঠে।

পত্রিকার সম্পাদক তার শান্ত কুটিরে বসে কতখানি ধৃষ্টতা এবং স্বাধীনতার সঙ্গে তার শক্তিশালী লেখনী দিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর আক্রমণ করেন, তারপর হয়তো এমন সময়ও আসে যেদিন সে স্বয়ং মন্ত্রিমণ্ডলীর শরিক হন। মন্ত্রিমণ্ডলের ভবনে পা রাখামাত্রই ওর লেখনী অনেকখানি মর্মজ্ঞ, অনেকখানি চিন্তাশীল, অনেকখানি ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠবে—এর কারণ হল সেই দায়িত্ববোধ। যুবক যৌবন বয়সে কত উদ্ধত থাকে। তাকে নিয়ে মা-বাবার কত দুশ্চিন্তা। তাঁরা তাকে কুলকলঙ্ক বলে মনে করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংসারের বোঝা মাথায় চাপামাত্রই সেই অস্থিরচিত্ত, বাতুল যুবক কত ধৈর্যশীল, কত শান্তচিত্ত হয়ে উঠে। এও দায়িত্ববোধের ফল।

জুম্মন শেখের মনেও সরপঞ্চের উচ্চ পদে আসীন হওয়া মাত্রই আপন দায়িত্ববোধের ভয় জাগে। ভাবে, আমি এখন ন্যায় ও ধর্মের সর্বোচ্চ আসনে বসে আছি। আমার মুখ দিয়ে এখন যা কিছু বের হবে, তা দেববাণীর মতো—আর দেববাণীর মাঝে আমার মনোবিকারের প্রকাশ কদাপি হওয়া উচিত নয়। আমি যেন সত্য থেকে একচুলও বিচ্যুত না হই।

পঞ্চের লোকেরা উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে উভয় দল আপন আপন পক্ষ সমর্থন করতে থাকে। এ ব্যাপারে তো সবাই একমত যে বলদের দাম সমঝুর দেওয়া উচিত। কিন্তু বলদ মরে যাওয়ায় সমঝুর ক্ষতি হয়েছে বলে তাকে কিছুটা রেয়াত করার কথা দুই ভদ্রলোক বললেন। অপর পক্ষে আর দুজন সভ্য দাম দেওয়া ছাড়াও সমঝুকে কিছু দণ্ড দিতে চাইলেন যাতে পশুদের সঙ্গে এমন নির্দয় ব্যবহার করার সাহস আর কারুর না হয়। অবশেষে জুম্মন রায় দিল—অলগু চৌধুরি আর সমঝু সাহু! পঞ্চ তোমাদের মামলাটাকে ভালো করে বিচার বিবেচনা করে দেখেছে। সমঝুর উচিত বলদের পুরো দাম দেওয়া। যখন সে বলদ নিয়েছে, তখন বলদের কোনো রোগ ছিল না। যদি সে সময়ই দাম দেওয়া হত, তাহলে আজ সমঝু ওটা ফেরত নেওয়ার জন্য আগ্রহ করত না। বলদের মৃত্যু হয়েছে শুধু এজন্যই যে

ওকে নিয়ে বড্ড কঠিন পরিশ্রম করানো হয়েছে অথচ ওর খড়বিচালির কোনো ভালো ব্যবস্থা করা হয়নি।

রামধন মিশ্র বলে—সমঝু বলদটাকে জেনেশুনে মেরেছে, অতএব ওর শাস্তি হওয়া উচিত।

জুম্মন বলে—এটা অন্য প্রশ্ন। এর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ নেই।

ঝগড়ু সাহু বলে—সমঝুকে কিছুটা রেয়াত করা উচিত।

জুম্মন বলে—এটা অলগু চৌধুরির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উনি যদি রেয়াত করেন সেটা তাঁর ভালোমানুষি।

অলগু চৌধুরির আনন্দের সীমা থাকে না। উঠে দাঁড়িয়ে জোরে ধ্বনি দেয়—পঞ্চ-পরমেশ্বর কী জয়!

চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে—পঞ্চ-পরমেশ্বর কী জয়!

প্রতিটি মানুষ জুম্মনের নীতির প্রশংসা করে—একেই বলে ন্যায়। মানুষের কর্ম নয় এটা; পঞ্চে পরমেশ্বর বাস করেন। এটা তাঁরই মহিমা। পঞ্চের সামনে খারাপকে কে ভালো বলতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে জুম্মন অলগুর কাছে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—ভাই, যেদিন তুমি আমার পঞ্চায়েত করেছিলে সেই থেকে আমি তোমার প্রাণঘাতী শত্রু হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারলাম যে, পঞ্চের আসনে বসে কেউ কারুর দোস্ত নয়, দুশমনও নয়। ন্যায় ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। আজ আমার বিশ্বাস হয়েছে যে পঞ্চের মুখ দিয়ে খোদা কথা বলেন।

অলগু কেঁদে ফেলে। চোখের জলে দুজনেরই হৃদয়ের গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। বন্ধুত্বের শুকিয়ে যাওয়া লতাটি আবার সজীব হয়ে উঠে।

(পঞ্চ পরমেশ্বর / ১৯১৬)

অনুবাদ ননী শূর

মহাতীর্থ

মুনশি ইন্দ্রমণির আয় ছিল কম, খরচ বেশি। নিজের সন্তানের জন্য দাই রাখার খরচ যদিও তিনি কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না, তবু একদিকে বাচ্চার দেখাশোনার ঝামেলা ও অন্যদিকে তার সমকক্ষ লোকদের চোখে ছোটো হয়ে যাবার অপমান, এই দুয়ে মিলে তাকে এই খরচ বহন করতে বাধ্য করছিল। বাচ্চা দাইকে খুবই পছন্দ করত, সব সময় তার কাছেই থাকতে চাইত। এই জন্য দাইয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হত। তবে, সম্ভবত সব থেকে বড়ো কারণ ছিল এই যে, ইন্দ্রমণি চক্ষুলজ্জার খাতিরে দাইকে জবাব দেবার সাহস পাচ্ছিলেন না। বুড়ি দাই তার এখানে তিন বছর যাবৎ কাজ করে আসছে। সে তার একমাত্র পুত্রসন্তানের লালনপালন করেছে। তার কাজ সে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গেই করেছে। তাকে ছাড়িয়ে দেবার কোনো কারণই ছিল না এবং অনর্থক দোষ দেখে বেড়ানো ইন্দ্রমণির মতো ভালো লোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তবে এই ব্যাপারে তার স্বামীর মতের সঙ্গে সুখদার মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল না। তার সন্দেহ ছিল, দাই দুহাতে লুট করছে। দাই যখন বাজার করে ফিরত সুখদা তখন দালানের কোনো জাগয়ায় লুকিয়ে থেকে দেখত দাই কোথাও আটা লুকিয়ে রাখছে কিনা, লাকড়ি লুকিয়ে রাখছে কিনা। তার কেনা জিনিস অনেকক্ষণ ধরে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করত। বারে বারে বলত, এত দাম কেন? ভাও কত? কী, এত দাম হয়ে গেছে? দাই কখনও কখনও এইসব সন্দেহাত্মক প্রশ্নের জবাব নম্রতার সঙ্গেই দিত, কিন্তু সুখদা যদি বেশি রেগে যেত তাহলে সেও রেগে উত্তর দিত। দিব্যি গালত। তার জবাবের পক্ষে প্রমাণ পেশ করত। বাদবিবাদে অনেক সময় চলে যেত। প্রায় প্রতিদিন এই অবস্থার সৃষ্টি হত এবং প্রতিদিন এই নাটক দাইয়ের অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হত। এত কষ্ট সহ্য করে দাইয়ের এখানে পড়ে থাকার ব্যাপারটা সুখদার সন্দেহকে আরও বেশি করে পুষ্ট করত। সে কখনও বিশ্বাস করত না যে, শুধুমাত্র বাচ্চার প্রতি ভালোবাসার জন্যই বুড়ি এখানে পড়ে আছে। সে বুড়িকে অতটা স্নেহবৎসল মনে করত না।

দুই

ঘটনাচক্রে একদিন বাজার থেকে ফিরতে দাইয়ের কিছু দেরি হয়ে গেল। বাজারে দুই তরকারিওয়ালির মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, তর্কবিতর্ক, ব্যঙ্গবিদ্রূপ সবই ছিল দেখার মতো। ওরা যেন দুই বিষের নদী কিংবা দুই আগ্নেয়গিরি, উভয়েই ফুঁসে উঠে মুখোমুখি সংঘর্ষে মেতেছে। কথার কী তোড়, কী বিচিত্র বিশ্লেষণ! তাদের বাগাড়ম্বর, তাদের

অন্তর্ভেদী বিচার বিবেচনা, অলংকৃত শব্দবিন্যাস এবং তাদের উপমার নতুনত্ব—এমন কোন কবি আছেন যিনি এসবে মুগ্ধ হবেন না? তাদের ধৈর্য ও প্রশান্তি ছিল বিস্ময়কর। দর্শকদের এক বড়ো ভিড়ও জমে গিয়েছিল। লজ্জাকে পর্যন্ত লজ্জিত করার মতো তাদের সেই অঙ্গভঙ্গি, সেই অশ্লীল শব্দব্যবহার যাতে মলিনতা পর্যন্ত রোমাঞ্চিত বোধ করে, তা সহস্র রসিকজনের পক্ষে মনোরঞ্জনের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল।

দাইও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দেখতে যে, ব্যাপারটা কী। তামাশা এমনই জমে উঠেছিল যে, তার সময়ের আর কোনো খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ যখন নটা বাজার ঘন্টা কানে এল তখন সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে বাড়ির দিকে রওনা হল। সুখদা মুখ ভার করে বসেছিল। দাইকে দেখেই ভ্রূকুটি করে বলল—কী, বাজারে হারিয়ে গিয়েছিলে?

দাই বিনীতভাবে উত্তর দিল—এক চেনা দাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে শুরু করল—।

সুখদা এই জবাবে আরও রেগে গিয়ে বলল—এদিকে অফিসে যাওয়ার বেলা হয়ে যাচ্ছে আর তুমি মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

দাই তখন চুপ করে যাওয়াই সমীচীন মনে করে ছেলেকে কোলে নিতে গেলে সুখদা ঝাঁঝিয়ে উঠল—রেখে দাও, তোমাকে না দেখে ও মরে যাচ্ছিল আর কী!

দাই, এই আদেশ পালন করা আবশ্যক মনে করল না। বউদির রাগ ঠান্ডা করার জন্য এর থেকে ভালো আর কোনো উপায় না পেয়ে সে রুদ্রমণিকে ইশারায় তার কাছে ডাকল। সে দুহাত বাড়িয়ে টলে টলে তার দিকে এগিয়ে গেলে দাই তাকে কোলে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোতেই সুখদা চিলের মতো ছোঁ মেরে রুদ্রকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল—তোমার এই চালাকি অনেক দিন থেকে লক্ষ করছি। এসব তামাশা অন্য কোথাও গিয়ে দেখিও। আমি ঢের দেখে নিয়েছি।

দাই রুদ্রর জন্য পারলে প্রাণ দিত। তার ধারণা ছিল, সুখদা সে কথা জানে। তার মনে হত সুখদা ও তার মধ্যে এমন একটা দৃঢ় বন্ধন ছিল যা সাধারণ একটা ঝটকায় নষ্ট হবার নয়। এই জন্যই সুখদার কটু বচন শুনেও তার এই বিশ্বাস হত না যে সুখদা তাকে তাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সুখদা এমন কঠোরভাবে কথাগুলো বলল এবং রুদ্রকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যে, দাই আর সহ্য করতে পারল না। বলল—বউদি, আমার তো তেমন কোনো অপরাধ হয়নি। বড়োজোর মিনিট পনেরো দেরি হয়ে থাকবে। এতেই আপনি এত রেগে গেলেন! সোজাসুজি বলে দিলেই তো পারেন যে, অন্য জায়গা দেখ। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। গতর খাটাতে পারলে কাজের আকাল হবে না।

সুখদা বলল—তা, এখানেই বা কে তোমার পরোয়া করছে? তোমার মতো মেয়েছেলে গলি গলি ভিক্ষে করে ফিরছে।

দাই উত্তর দিল—ঠিক আছে, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ঝি-দাই আপনার অনেক জুটবে। আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। আমি চললাম।

সুখদা—যাও, গিয়ে বাবুর কাছ থেকে তোমার পাওনা মিটিয়ে নাও।

দাই—আমার হয়ে বুদ্রবাবুকে তা থেকে মিষ্টি কিনে দেবেন।

এরই মধ্যে ইন্দ্রমণিও বাইরে থেকে এসে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কী, হল কী?

দাই বলল—কিছু না। বউদি আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন, আমি চলে যাচ্ছি।

ইন্দ্রমণি সংসারের দৈনন্দিন ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। নগ্নপদ মানুষ যেমন কাঁটা থেকে দূরে থাকে তেমনি। তাই তাকে সারাদিন এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেও সই, কিন্তু কাঁটায় পা রাখার সাহস তার ছিল না। দুঃখিত হয়ে বললেন—কী হয়েছিল?

সুখদা বলল—কিছু না। আমি চাই না, রাখব না। আমার খুশি। কারো কাছে তো মুচলেকা লিখে দিইনি।

ইন্দ্রমণি বিরক্তি ভরে বললেন—তুমি বসে বসে একটা না একটা খিটকেল বাধিয়েই চলেছ।

সুখদা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—হ্যাঁ, আমার তো এই রোগ। কী করব, স্বভাবই এরকম। তোমার যদি এত প্রেম হয়ে থাকে তবে গলায় ঝুলিয়ে রাখো। আমার ওকে দিয়ে কাজ নেই।

তিন

দাই জলভরা চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুদ্রমণির জন্যে তার মন ছটফট করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল, ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে আদর করে, কিন্তু মনের ইচ্ছে মনে রেখে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হল।

বুদ্রমণি দাইয়ের পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এল; কিন্তু দাই যখন বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল তখন সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে 'আন্না' 'আন্না' বলে কাঁদতে লাগল। সুখদা তাকে চুমু খেল, আদর করল, কোলে তুলে নিতে চাইল, মিষ্টি দেবে বলে লোভ দেখাল, মেলায় নিয়ে যাবে বলল। এতেও যখন কাজ হল না তখন বাঁদর, পুলিশ, ভূত ও জুজুবুড়ির ভয় দেখাল; কিন্তু বুদ্র সেই যে রৌদ্র ভাব ধারণ করেছিল তা আর কিছুতেই শান্ত হল না। শেষ পর্যন্ত সুখদা রাগ করে ছেলেকে ওখানেই ফেলে রেখে সংসারের কাজে মন দিল। কাঁদতে কাঁদতে বুদ্রর মুখচোখ লাল হয়ে গেল, চোখ ফুলে উঠল। তবু শেষ পর্যন্ত সে ওখানেই মাটির উপর শুয়ে ফোঁপাতে লাগল।

সুখদা ভেবেছিল, ছেলে কেঁদেকেটে কিছুক্ষণের মধ্যে শান্ত হয়ে যাবে। বুদ্র কিন্তু জেগে উঠেই 'আন্না' 'আন্না' করে চিৎকার শুরু করে দিল। তিনটের সময় ইন্দ্রমণি অফিস থেকে ফিরে ছেলের এই দশা দেখে স্ত্রীর প্রতি কুপিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্রর যখন এই বিশ্বাস হল যে দাই মিষ্টি আনতে গেছে, তখন সে আশ্বস্ত হল।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই সে আবার চিৎকার শুরু করে দিল—আন্না, মিষ্টি দে।

এভাবে দু-তিন দিন গেল। আন্নার জন্য চিৎকার করা ও কাঁদা ছাড়া বুদ্রর আর কোনো কাজ নেই। সেই অচঞ্চল কুকুর যা তার কোল থেকে মুহূর্তের জন্যও নামানো যেত না, সেই মৌনব্রতধারী বিড়াল যাকে সাজানো দেখে তার আনন্দ ধরত না, সেই পক্ষবিহীন পাখি যার জন্য সে প্রাণ দিতে পারত—এই সবই তার মন থেকে সরে গিয়েছিল। সে আর ওসবের দিকে চোখ তুলেও তাকাত

না। তার আন্নার মতো জীবন্ত, জাগ্রত একজন মানুষ যে তাকে ভালোবসত, তাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াত, ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াত, গান গেয়ে খুশি করত, তার অভাব ওই নির্জীব বস্তুগুলো আর কী করে পূরণ করবে! সে প্রায়ই ঘুমের মধ্যে থেকেও চমকে উঠত এবং 'আন্না' 'আন্না' করে চিৎকার করে হাত দিয়ে ইশারা করত, মনে হত তাকে ডাকছে। বুদ্র আন্নার ফাঁকা ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত। তার মনে হত, আন্না হয়তো আসবে। এই ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনলেই 'আন্না' করে দৌড়ে যেত। ভাবত আন্না এসে গেছে। তার নাদুসনুদুস শরীর রোগা হয়ে গেল; গোলাপের মতো চেহারা শুকিয়ে গেল। তার মা-বাবা তার মোহন হাসির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকত। যদি বা অনেক কাতুকুতু ইত্যাদির পরে হাসত, মনে হত ভিতর থেকে হাসছে না, কেবল মন রক্ষার জন্য হাসছে।

এখন সে দুধ ভালোবাসে না, মিছরি ভালোবাসে না, কিসমিস ভালোবাসে না, মিষ্টি বিস্কুট ভালোবাসে না, টাটকা অমৃতি ভালোবাসে না। যখন আন্না হাতে করে তাকে এসব খাওয়াত তখন তার ভালো লাগত। এখন সে তার কোনো স্বাদ পায় না। দু-বছরের লকলকে সুন্দর গাছ শুকিয়ে গিয়েছে। সেই ছেলে যাকে কোলে নিলে তুলতুলে ও ভারী বোধ হত, সে আজ শুকিয়ে কাঠ। সুখদা নিজের ছেলের এই দশা দেখে মনে মনে কষ্ট পেত এবং নিজের মূর্খতার জন্য পস্তাত। শান্তিপ্রিয় ইন্দ্রমণি এখন আর ছেলেকে কোল থেকে নামান না, রোজ সঙ্গে করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যান। রোজই নতুন নতুন খেলনা নিয়ে আসেন; কিন্তু সেই নিস্তেজ বৃক্ষ কিছুতেই আর বাড়ছিল না। দাই ছিল বুদ্রর জগতের সূর্য। তার স্বাভাবিক তাপ ও কিরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার শ্যামলিমা বিকশিত হবে কী করে? দাই ছাড়া তার চারদিক এখন শুধুই শূন্য। দ্বিতীয় আর একজন 'আন্না' তৃতীয় দিনই রাখা হয়েছিল; কিন্তু বুদ্র তাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিত যেন সে ডাইনি কিংবা পেতনি।

প্রত্যক্ষরূপে দাইকে সামনে না দেখে বুদ্র এখন তার কল্পনায় মগ্ন থাকত। কল্পনায় তার আন্নাকে সে চলাফেরা করতে দেখত। তার সেই কোল, সেই স্নেহ, সেই মিষ্টি কথা, সেই সুন্দর গান, সেই লোভনীয় মিঠাই, সেই মনোরম জগৎ, সেই আনন্দময় জীবন। একা একা বসে সেই কাল্পনিক আন্নার সঙ্গে কথা বলত : 'আন্না, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। আন্না, গাই দুধ দেয়। আন্না, ধবধবে ঘোড়া দৌড়ায়। সকাল হতেই ঘটি নিয়ে দাইয়ের ঘরে গিয়ে বলত—আন্না, জল। দুধের গ্লাস নিয়ে তার ঘরে রেখে আসত আর বলত—আন্না খাবে। আন্না এখন তার কাছে এক স্বর্গের বস্তু, যার ফিরে আসার কোনো আশাই আর ছিল না। বুদ্রের চরিত্রে ধীরে ধীরে শিশুর চাপল্যের পরিবর্তে এক নিরাশাজনিত ধৈর্য এবং একটা নিরানন্দ শিথিলতা দেখা দিতে লাগল। এইভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। বর্ষার সময় এল। কখনও কখনও মারাত্মক গরম আবার কখনও ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা। সর্দিজ্বর বেশ দেখা দিল। বুদ্রের দুর্বল শরীর এই ঋতু পরিবর্তনের ধাক্কা সইতে পারল না। সুখদা তাকে ফ্লানেলের জামা পরিয়ে রাখত; জলের কাছে যেতে দিত না; খালি পায়ে এক পাও হাঁটতে দিত না। তবু সর্দি লেগে গেল। বুদ্রর কাশি ও জ্বর হল।

চার

সকালবেলা। রুদ্র খাটিয়ায় চোখে বুঁজে শুয়ে ছিল। ডাক্তারের চিকিৎসা নিষ্ফল হল। সুখদা খাটিয়ায় বসে রুদ্রর বুকে তেল মালিশ করছিল আর ইন্দ্রমণি বিষাদের মূর্তির মতো করুণ চোখে ছেলের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আজকাল তিনি সুখদার সঙ্গে খুব কম কথা বলতেন। তার প্রতি তাঁর এক ধরনের ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাকেই তিনি রুদ্রর অসুখের একমাত্র কারণ বলে মনে করছিলেন। সে তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত নীচ স্বভাবের স্ত্রীলোক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সুখদা ভয়ে ভয়ে বলল—আজ বড়ো হাকিম সাহেবকে ডাকলে হত। বোধ হয় তাঁর ওষুধে ভালো হয়ে যাবে।

ইন্দ্রমণি বাইরের কালো মেঘের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন—বড়ো হাকিম সাহেব কেন, স্বয়ং ধন্বন্তরী এলেও কোনো লাভ হবে না।

সুখদা বলল—তা হলে এখন কি আর কোনো ওষুধ খাওয়ানো হবে না?

ইন্দ্রমণি—ব্যস, এর একটাই ওষুধ, আর সে ওষুধ পাওয়া দুষ্কর।

সুখদা—তোমার তো সেই এক কথা। বুড়ি এসে কি অমৃত খাওয়াবে?

ইন্দ্রমণি—তোমার কাছে বিষ হলেও ছেলের তাই অমৃত।

সুখদা—ওর হাতেই যে ভগবানের ইচ্ছা সে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্রমণি—যদি না বুঝতে পার কিংবা এখন পর্যন্ত না বুঝে থাক তাহলে কাঁদতে হবে। ছেলের আশা ছাড়তে হবে।

সুখদা—চুপ করো, কী অলক্ষুনে কথা মুখ দিয়ে বের করছ? যদি এরকম খারাপ কথাই শোনাবে তবে বাইরে চলে যাও।

ইন্দ্রমণি—তা আমি যাচ্ছি। তবে মনে রেখো ছেলের মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী হবে। যদি ছেলের মঙ্গল চাও তো সেই দাইয়ের কাছে যাও। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক্ষমা চাও। তোমার ছেলের জীবন তারই দয়ার উপর নির্ভর করছে।

সুখদা কোনো উত্তর দিল না। তার চোখ থেকে জল ঝরছিল।

ইন্দ্রমণি জিজ্ঞাসা করল—কী ইচ্ছা তোমার? যাব, গিয়ে ডেকে আনব?

সুখদা—তুমি কেন যাবে? আমি নিজেই যাব।

ইন্দ্রমণি—না, মাপ করো। তোমার উপর আমার বিশ্বাস নেই। কে জানে তোমার মুখ থেকে আবার কী বেরিয়ে পড়বে? সে হয়তো তখন আসতে গিয়েও আসবে না।

সুখদা তার স্বামীর প্রতি আবার তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, তাই বই কী! আমার তো আর নিজের ছেলের অসুখের কোনো চিন্তা নেই! আমি লজ্জায় তোমাকে বলতে পারিনি। তবে বারেবারেই একথা আমার মনে হয়েছে। আমি যদি দাইয়ের বাসা চিনতাম, তবে কবেই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে নিয়ে আসতাম। সে আমার প্রতি যতই বিরক্ত হোক না কেন, রুদ্রকে তো সে ভালোবাসত। আমি আজই তার কাছে যাব। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলতে বলছ, আমি তার পা ধরতে রাজি। তার পা আমি চোখের জলে ভিজিয়ে দেব, আর যে ভাবে পারি তাকে রাজি করাব।

সুখদা অনেক ধৈর্য ধরে এত কথা বললেও জোর করে আটকে রাখা অশ্রু আর চাপতে পারল না। ইন্দ্রমণি সহানুভূতির চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে বলল—তোমার যাওয়া আমি সঠিক মনে করছি না। আমি নিজেই যাচ্ছি।

পাঁচ

কৈলাসী ছিল সংসারে একা। এক সময় তার সংসারও ছিল গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত; কিন্তু একে একে সব পাপড়িই ঝরে পড়ল। তার সব সজীবতাই এখন নষ্ট প্রায়; তার শেষ চিহ্নটুকুই শুধু রয়ে গেছে।

তবে রুদ্রকে পেয়ে এই রিক্ততার মধ্যেও যেন প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল। শুষ্ক বৃক্ষে যেন নতুন পাতার উদ্‌গম হয়েছিল। কৈলাসীর জীবন যা ছিল এতদিন নীরস ও শুষ্ক তা হয়ে উঠল সরস ও সজীব। অন্ধকার বনে ভ্রান্ত পথিক যেন আলোর নিশানা খুঁজে পেল। তার জীবন আর নিরর্থক নয়, সার্থক।

রুদ্রর আধো-আধো কথা শোনার জন্য কৈলাসী আকুল থাকত। তবে সে তার স্নেহ সুখদার কাছ থেকে গোপন রাখত, যাতে মার মনে ঈর্ষার সঞ্চার না হয়। সে সুখদাকে বুঝিয়ে রুদ্রর জন্য মিষ্টি কিনে আনত এবং তাকে খাইয়ে আনন্দ পেত। সে তাকে দিনে দু-তিন বার মালিশ করত যাতে বাচ্চা পুষ্ট হয়। পাছে নজর লেগে যায় এই ভয়ে অন্য লোকের সামনে তাকে কিছু খাওয়াতো না। সর্বদাই বলে বেড়াত যে বাচ্চা খুব কম খায়। কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য মালা ও তাবিজ পরিয়ে রাখত। এ ছিল তার পবিত্র ভালোবাসা, এর মধ্যে স্বার্থের লেশ ছিল না।

এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কৈলাসীর এখন সেই অবস্থা হল যা হয় থিয়েটার হলে দর্শকদের হঠাৎ আলো নিভে গেলে। তার দৃষ্টির সামনে সেই কায়া তখনও নেচে চলেছে, আধো-আধো সেই কথা তখনও শোনা যাচ্ছে। নিজের বাসা তার কন্টকাবাস। সেই কালকুঠরিতে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

রাতটা তো যেমন-তেমন কাটল। সকালে কৈলাসী ঘর ঝাঁট দিচ্ছে এমন সময় টাটকা হালুয়া বিক্রির হাঁক শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল আজ হালুয়া কে খাবে? কোলে বসে আজ কে বকর বকর করবে? হালুয়া খেতে খেতে রুদ্রর চোখে-মুখে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে ভাবান্তর হত তার মাধুরী পান করবার জন্য কৈলাসীর হৃদয় অধীর হয়ে উঠল। সে ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবল রুদ্রকে দেখে আসবে; কিন্তু অর্ধেক রাস্তা গিয়ে ফিরে এল।

এক মুহূর্তের জন্যও কৈলাসী রুদ্রর চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। সে ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠত, দেখত রুদ্র যেন একটা লাঠিকে ঘোড়া করে ছুটে আসছে। প্রতিবেশীদের কাছে গেলেও সে রুদ্রর কথাই আলোচনা করত। রুদ্র ছিল তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সুখদার নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারের কথা তার মনে ঠাঁই পায়নি। সে রোজ ভাবত যে রুদ্রকে দেখতে যাবে। তার জন্য বাজার থেকে মিষ্টি ও খেলনা এনে রেখে দিত। ঘর থেকে বেরিয়েও আবার রাস্তায় গিয়ে ফিরে আসত।

কখনও দু-চার পা গিয়ে আর এগোতে পারত না। কোন মুখে যাবে? যে ভালোবাসাকে শঠতা মনে করে তার সামনে কী করে যাবে। কখনও ভাবত, বুদ্র যদি তাকে চিনতে না পারে। শিশুর ভালোবাসায় কী বিশ্বাস! নতুন দাইয়ের সঙ্গে হয়তো তার ভাব হয়ে গেছে। এই চিন্তা তার পায়ে শেকলের মতো কাজ করত।

এইভাবে দু-সপ্তাহ কেটে গেল। কৈলাসীর মন উতলা হয়ে থাকত, যেন সে কোনো দীর্ঘ যাত্রায় বেরোবে। ঘরের জিনিস যেমন খুশি পড়ে থাকত। খাওয়াপরার কথা খেয়ালই থাকত না। দিনরাত সে বুদ্রর চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকত। যোগাযোগ ঘটে যাওয়ায় এরই মধ্যে তার বদ্রিনাথ যাবার সুযোগ এসে গেল। পাড়ার কিছু লোক যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কৈলাসীর দশা তখন ছিল সেই পোষাপাখির মতো যে পাখি খাঁচা থেকে পালিয়ে অন্য কোনো জায়গার সন্ধান করছে। ভুলে থাকবার এই চমৎকার সুযোগ মিলে গেল। সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল।

ছয়

কালো মেঘে আকাশ ঢেকে আছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দিল্লি স্টেশনে প্রচুর যাত্রীর ভিড়। কেউ গাড়িতে বসে; কেউ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। চারদিকে হইচই চলছে। এখনও সবাই সংসারের মায়ায় আবদ্ধ! কেউ তার স্ত্রীকে বলছে যেন ধানকাটা হয়ে গেলে পুকুরপাড়ের খেতে মটর বুনে দেওয়া হয় আর বাগানের পাশের খেতে গম। আর কেউ তার যুবক ছেলেকে বুঝিয়ে বলছে যে, যারা টাকা শোধ করেনি তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যেন দেরি করা না হয় আর শতকরা দু-টাকা সুদ যেন অবশ্যই কেটে নেওয়া হয়। এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী তার গোমস্তাকে বোঝাচ্ছিলেন যে, জিনিস পেতে দেরি হচ্ছে বুঝলে যেন সে নিজেই চলে যায় এবং বাজার-চালু জিনিস যেন নেয়, নয়তো টাকা ফেঁসে যেতে পারে। তবে কিছু কিছু ধর্মভীরু যাত্রীও ছিলেন। তারা হয় চুপচাপ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন কিংবা তন্ময় হয়ে মালা জপ করছিলেন। কৈলাসীও এক গাড়িতে বসে চিন্তা করছিল—এইসব লোক, এরা এখনও সংসারচিন্তা ছাড়তে পারছে না! সেই ব্যাবসার কথা, সেই লেনদেনের চর্চা! এখন যদি বুদ্র এখানে থাকত তাহলে খুব কাঁদত। আমার কোল থেকে কিছুতেই নামত না। ফিরে এসে ওকে অবশ্যই দেখতে যাব। হা ঈশ্বর! এখন গাড়ি কোনোরকমে ছাড়লে হয়; গরমের চোটে প্রাণ বেরোবার উপক্রম। এত ঘটা করে মেঘ জমেছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ার নাম নেই। জানি না, এই রেলওয়ালারা গাড়ি ছাড়তে কেন দেরি করছে। মিছামিছি এদিকওদিক ছুটছে অথচ তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়ছে না। গাড়ি ছাড়লে যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

হঠাৎ কৈলাসী দেখল, ইন্দ্রমণি এক সাইকেল নিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে আসছেন। বিষণ্ণ চেহারা, জামা ঘামে জবজবে। তিনি এসে গাড়ির ভিতর উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। সেও যে যাচ্ছে কেবল এটা জানাবার জন্যই কৈলাসী গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল এবং ইন্দ্রমণি তাকে দেখেই দৌড়ে কাছে গিয়ে বলল—কী, কৈলাসী, তুমিও রওনা হলে?

কৈলাসী নম্রভাবে অথচ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল—হ্যাঁ, এখানে কী করব? জীবনের ঠিকঠিকানা কী? কে জানে কবে চোখ বন্ধ হবে। বুদ্রবাবু ভালো আছে তো?

ইন্দ্রমণি—এখন তো চলেই যাচ্ছ। বুদ্রর কথা জিজ্ঞাসা করে কী করবে? তাকে আশীর্বাদ কর।

কৈলাসীর বুক ধক করে উঠল। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল—তার শরীর কি ভালো নেই?

ইন্দ্রমণি—তুমি যেদিন থেকে চলে এসেছে সেই দিন থেকেই তো সে অসুস্থ। দু-সপ্তাহ পর্যন্ত তো সে 'আম্মা'-'আম্মা' করেছে। আজ এক সপ্তাহ হল কাশি আর জ্বরে পড়েছে। সমস্ত রকম ওষুধ হার মেনেছে, কোনো লাভ হল না। আমি ভেবেছিলাম, এসে তোমাকে অননুয়-বিনয় করে নিয়ে যাব। কে জানে হয়তো তোমাকে দেখে সে সুস্থ হয়ে উঠবে; কিন্তু তোমার ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম তুমি তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছ। এখন আর কোন মুখে ফিরে যেতে বলব। তোমার সঙ্গো আর ব্যবহারটাই বা কী এমন করেছি যে এতটা সাহস করব। তার উপর আবর পুণ্য কাজে বিঘ্ন ঘটাবার ভয়ও রয়েছে। তুমি যাও, ঈশ্বরই সব। পরমায়ু থাকলে বেঁচে যাবেই, নয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছায় কে বাধা দেবে!

কৈলাসী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। সামনের সবকিছু ঝাপসা বলে মনে হতে লাগল। ভারী অশুভ আশঙ্কায় তার মন ভেঙে পড়ল। তার মন থেকে বেরিয়ে এল—হা ঈশ্বর! আমার বুদ্রর যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, আমার হৃদয় কত কঠোর! এমন ছেলে কেঁদেকেঁদে শেষ হয়ে গেল, অথচ আমি তাকে দেখতে পর্যন্ত গেলাম না! সুখদার স্বভাব ভালো নয়, না হোক; কিন্তু বুদ্র আমার কী করেছিল যে আমি মার বদলা ছেলেকে দিয়ে নিলাম! ঈশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করো। আমার আদরের বুদ্র আমার জন্যে হাপিত্যেশ করছে। (একথা মনে হতেই কৈলাসীর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং চোখ জলে ভরে এল)। আমি কী করে জানব সে আমাকে এত ভালোবাসে! কে জানে ছেলে এখন কেমন। ভয়ে ভয়ে বলল—দুধ খাচ্ছে তো?

ইন্দ্রমণি—তুমি দুধ খাবার কথা বলছ, দুদিন হল সে চোখ পর্যন্ত খুলছে না।

কৈলাসী—হা, ভগবান! আরে, এই কুলি, কুলি! বাবা, এসে আমার মাল গাড়ি থেকে নামিয়ে দে। এখন আমি তীর্থযাত্রার কথা ভাবতে পারছি না। হ্যাঁ, বাবা, তাড়াতাড়ি কর্। বাবুজি, একটা এক্কা তো ঠিক করে ফেলো।

এক্কা রওনা হল। সামনে রাস্তায় গাড়ি ছিল বলে ঘোড়া আস্তে আস্তে চলছিল। কৈলাসী বিরক্ত হয়ে বারেবারে এক্কাওয়ালাকে বলছিল—বাবা, তাড়াতাড়ি কর্। আমি তোকে কিছু বেশি পয়সা দেব। রাস্তায় লোকের ভিড় দেখে তার রাগ হল। তার মন চাইছিল, ঘোড়ার যদি পাখনা থাকত। যাই হোক, ইন্দ্রমণির বাড়ি প্রায় এসে গেলে কৈলাসীর বুক টিপটিপ করতে লাগল। বারে বারে মন থেকে বুদ্রর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ বেরিয়ে আসছিল। ঈশ্বর করেন যেন সব কুশল হয়। এক্কা ইন্দ্রমণির গলির দিকে মোড় নিল। হঠাৎ কৈলাসীর কানে কান্নার আওয়াজ গেল। তার বুক ধড়ফড় করে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হচ্ছিল, নদীতে ডুবে যাচ্ছে। মন চাইছিল, এক্কা থেকে লাফিয়ে পড়ে; কিন্তু একটু পড়েই বোঝা গেল, কোনো মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। মন আশ্বস্ত হল। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রমণির বাড়ি এসে গেল। কৈলাসী ভয়েভয়ে দরজার দিকে তাকাল, যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো অনাথ ছেলে সন্ধ্যাবেলায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত

হয়ে ফিরে এসেছে আর দরজার দিকে লজ্জিত চোখে তাকিয়ে দেখছে কেউ বসে আছে কিনা। অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজায় বসে রাঁধুনি ঠাকুর খইনি পাকাচ্ছিল। কৈলাসীর কিছুটা সাহস হল। ঘরে ঢুকে দেখল, নতুন দাই পুলটিস বানাচ্ছে। তার মনে সাহস সঞ্চার হল। সুখদার ঘরে ঢুকতেই তার মন গ্রীষ্মের দুপুরের মতো কাঁপতে লাগল। সুখদা রুদ্রকে কোলে নিয়ে এক দৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। যেন শোক ও করুণার প্রতিমা।

কৈলাসী সুখদাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। রুদ্রকে তার কোল থেকে নিয়ে তার দিকে সজল চোখে তাকিয়ে বলল—বাবা রুদ্র! চোখ খোল।

রুদ্র চোখ মেলে কিছুক্ষণ দাইকে দেখল। তারপর হঠাৎ দাই-এর গলা জড়িয়ে ধরে বলল—আন্না এসেছে! আন্না এসেছে!

নিভন্ত প্রদীপে তেল পড়লে যেমন হয় তেমনি মুমূর্ষু রুদ্রর বিবর্ণ চেহারা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। মনে হল, যেন সে হঠাৎ কিছুটা বড়ো হয়ে গেছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সকালবেলা রুদ্র উঠোনে খেলা করছিল। ইন্দ্রমণি বাইরে থেকে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন—তোমার আন্নাকে মেরে তাড়িয়ে দিই?

রুদ্র মুখ গম্ভীর করে বলল—না, কাঁদবে।

কৈলাসী বলল—কেন, বাবা, তুমি তো আমাকে বদ্রিনাথ যেতে দিলে না। আমার তীর্থযাত্রার পুণ্যফল কে দেবে?

ইন্দ্রমণি হেসে বললেন—তার থেকে তোমার অনেক বেশি পুণ্য হয়ে গেছে। এই তীর্থই মহাতীর্থ।

(মহাতীর্থ / ১৯১৭) অনুবাদ অমলকুমার রায়

দুর্গামন্দির

ব্রজনাথবাবু আইনের বই পড়ায় ব্যস্ত, ওঁর বাচ্চা দুটো ঝগড়া করায়। শ্যামা চেঁচাচ্ছে, মুন্নু আমার পুতুলগুলো দিচ্ছে না। মুন্নু কাঁদছে, শ্যামা আমার মিষ্টি খেয়ে নিয়েছে।

ব্রজনাথবাবু রেগেমেগে ভামাকে বলেন—পাজি দুটোকে তুমি এখান থেকে নেবে কিনা বলো? নইলে আমি একটা একটা করে পেটাচ্ছি। ভামা উনুন ধরাচ্ছে, বলে—আরে, এখন এই সন্ধ্যার সময়ও পড়বে? একটুখানি জিরিয়ে নাও না।

ব্রজ—ওঠবার তো নাম নেই, ওখানে বসে বসেই উপদেশ দেবে! এখনই একটাকে তুলে যখন আছাড় মারব তখন ওখান থেকেই চেল্লাতে চেল্লাতে আসবে, হায় হায়! বাচ্চাটাকে মেরে ফেলল।

ভামা—তা আমি তো আর শুয়েবসে নেই। এক দণ্ড একটুখানি বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেললে কী হয়। আমি একা তো আর ওদের গোলামিতে নাম লেখাইনি।

ব্রজনাথের কোনো জবাব মুখে আসে না। রাগ যদি জলের মতো বয়ে যাবার রাস্তা না পায় তাহলে আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রজনাথ যদিও কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন, তবুও এখন সেসব পালনে তৎপরতা দেখান না। বাদী আর বিবাদী দুজনের প্রতিই সম ব্যবহার করে দুজনকেই কান্নাকাটির মধ্যে ফেলে রেখে আইনের বইখানাকে বগলদাবা করে কলেজ-পার্কের দিকে রওনা হন।

দুই

শ্রাবণ মাস। আজ কদিন বাদে মেঘ কেটেছে। সবুজ সবুজ গাছগুলো সোনালি চাদর পরে দাঁড়িয়ে। মৃদুমন্দ সমীর শ্রাবণের রাগিণী আলাপ করছে। বকগুলো গাছের ডালে ডালে বসে দোলনায় দোল খাচ্ছে। ব্রজনাথ একখানি বেঞ্চিতে এসে বসে বইখানা খোলেন। তবে এই গ্রন্থের চেয়ে প্রকৃতি-গ্রন্থকে অবলোকন করা বেশি চিত্তাকর্ষক। তিনি একবার আকাশকে পড়ছেন, একবার পাতাকে, কখনও ছবির মতো শ্যামলিমাকে, কখনও সামনের মাঠে খেলায় মেতে থাকা ছেলেগুলোকে।

হঠাৎ সামনে ঘাসের উপর কাগজের একটি মোড়ক ওঁর চোখে পড়ে। প্রলোভন বলে ওঠে—আড়ালে চলো তো, দেখি ওতে কী আছে? বুদ্ধি বলে—তোমার তাকে কী? থাক না পড়ে।

কিন্তু জিজ্ঞাসারূপী প্রলোভনের জয় হয়। ব্রজনাথ উঠে গিয়ে মোড়টাকে তুলে নেন। হয়তো কারো পয়সা মোড়কে জড়ানো পড়ে গেছে। খুলে দেখেন, গিনি। গুনে দেখেন, আটখানা। কৌতূহলের সীমা থাকে না।

ব্রজনাথের বুক ধড়ফড় করতে থাকে। গিনি আটখানা হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন, এগুলোকে নিয়ে কী করি? যদি এখানেই ফেলে রাখি, তাহলে না জানি কার নজরে পড়বে, না জানি কে তুলে নিয়ে যাবে। না, এখানে রাখা ঠিক নয়। যাই থানায় গিয়ে খবর দিই আর দারোগার হাতে গিনিগুলোকে সঁপে দিই। যার জিনিস সে নিয়ে যাবে কিংবা সে না পেলেও আমার কোনো দোষ থাকবে না, আমি তো আমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হব।

প্রলোভন পর্দার অন্তরাল থেকে মন্ত্রণা দিতে শুরু করে। ব্রজনাথ থানায় যান না। ভাবেন—ভামার সঙ্গে একটু মজা করি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার রান্নাবান্না শেষ। কাল ধীরেসুস্থে থানায় যাব।

গিনি দেখে ভামার হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগে। জিজ্ঞেস করে—এগুলো কার?

ব্রজ—আমার।

ভামা—যাও, বলো না গো।

ব্রজ—পড়ে ছিল, কুড়িয়ে পেয়েছি।

ভামা—মিথ্যে কথা। অতই যদি ভাগ্যবান হবে তাহলে সত্যি করে বলো তো কোথায় পেয়েছ? কার?

ব্রজ—সত্যি বলছি, পড়ে ছিল, কুড়িয়ে পেয়েছি।

ভামা—আমার দিব্যি?

ব্রজ—তোমার দিব্যি।

ভামা গিনিগুলোকে স্বামীর হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

ব্রজনাথ বলেন—কেড়ে নিচ্ছ যে?

ভামা—দাও, আমার কাছে রেখে দিই।

ব্রজ—থাক, এগুলোর খবর দিতে আমি থানায় যাচ্ছি।

ভামার মুখখানা অন্ধকার হয়ে যায়। বলে—পড়ে পাওয়া ধন, তার আবার কীসের খবর?

ব্রজ—হ্যাঁ, তা নয় তো কী? এই গিনি আটখানার জন্য ধর্মটাকে নষ্ট করব, তাই না?

ভামা—বেশ, তাহলে সকালে যেও। এখন গেলে ফিরতে রাত হবে।

ব্রজনাথও ভাবেন—সেই ভালো। থানার লোকেরা রাতে তো কোনো কাজ করবে না। আশরফিগুলো যখন পড়েই থাকবে তখন যেমন থানা, তেমনি আমার ঘর। গিনিগুলোকে সিন্ধুকে তুলে রাখেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পরে ভামা হেসে বলে—ঘরে আসা ধন কেন ছাড়ছ? দাও, আমার একগাছি ফাঁসি হার বানিয়ে নিই, অনেক দিন ধরে মনে বড়ো সাধ।

প্রলোভন এবারে হাস্যের রূপ ধারণ করে।

ব্রজনাথ তিরস্কার করে বলেন—হারের লোভে গলায় ফাঁস লাগাতে চাও নাকি?

তিন

সকালে ব্রজনাথ থানায় যাবার জন্য তৈরি হন। আইনের ক্লাসের একটা লেকচার বাদ পড়বে, কোনো ক্ষতি নেই। উনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুবাদক। চাকরিতে উন্নতির কোনো আশা নেই

দেখে বছর খানেক ধরে ওকালতি পড়তে ব্যস্ত। কাপড়চোপড় পরছেন এমন সময় ওঁর এক বন্ধু মুনশি গোরেলাল এসে হাজির। তারপর তাঁর পারিবারিক যত দুশ্চিন্তার বিস্তৃত দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে খুবই বিনীতভাবে বললেন—দাদা, এখন আমি এসব ঝঞ্ঝাটে এমন ফেঁসে গেছি যে বুদ্ধি কোনো কাজ করছে না। তুমি বড়ো লোক। এসময় কিছু সাহায্য কর। বেশি না, তিরিশটা টাকা দাও। কোনো মতে কাজ চালিয়ে নেব, আজ মাসের তিরিশ তারিখ। কাল বিকেলে তুমি টাকাটা পেয়ে যাবে।

ব্রজনাথ বড়ো লোক নন, কিন্তু বড়োলোকি ভাব দেখান। এই লোকদেখানো ভাব ওঁর চরিত্রের একটি দুর্বলতা। শুধুমাত্র তাঁর ঐশ্বর্যের প্রভাব দেখানোর জন্যেই উনি প্রায় বন্ধুবান্ধবদের ছোটোখাটো প্রয়োজন মেটাতে নিজের সত্যিকারের প্রয়োজনগুলোকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন। ভামার কিন্তু এ সব ব্যাপারে কোনো সহানুভূতি নেই। তাই যখন ব্রজনাথের উপরে এ ধরনের সঙ্কট এসে পড়ে, তখন কিছুক্ষণের জন্য পারিবারিক শান্তি অবশ্যই বিঘ্নিত হয়। অস্বীকার করবার বা এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা ব্রজনাথের নেই।

উনি সসংকোচে ভামার কাছে গিয়ে বলেন—তোমার কাছে তো তিরিশটা টাকা হবে, তাই না? মুনশি গোরেলাল চাইছেন।

ভামা রুক্ষভাবে বলে—আমার কাছে তো টাকা নেই।

ব্রজ—আছে তো ঠিকই, মিথ্যে কেন বলছ।

ভামা—বেশ, মিথ্যেই বলছি।

ব্রজ—আমি তাহলে ওঁকে গিয়ে কী বলি।

ভামা—বলে দাও যে ঘরে টাকা নেই, তুমি বলতে না পার, পর্দার আড়াল থেকে আমি বলে দিচ্ছি।

ব্রজ—বলবার সে তো আমি বলে দেব, তবে ওঁর বিশ্বাস হবে না। ভাববেন বানিয়ে বলছি।

ভামা—ভাববেন, তো ভাবুন গে।

ব্রজ—আমার দ্বারা এতটা অভদ্রতা হবে না। দিনরাত একসঙ্গে কাটাই, কী করে 'না' করব?

ভামা—বেশ, তাহলে যা মন চায় করো গে। আমি একবার বলে দিয়েছি, আমার কাছে টাকা নেই।

ব্রজনাথ মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর বিশ্বাস, ভামার কাছে টাকা আছে, তবু শুধু তাকে বিড়ম্বিত করার জন্য অস্বীকার করছে। জেদ সংকল্পকে দৃঢ় করে তোলে, সিন্দুক থেকে দুটো গিনি বের করে গোরেলালকে দিয়ে বলেন—ভাই, কাল বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই টাকাটা দিয়ে যাবে। এগুলো একজন জমা রেখে গেছে, আমি এখনই বেরোচ্ছিলাম দিয়ে আসতে। কাল টাকা না পেলে আমাকে খুব লজ্জায় পড়তে হবে, মুখ দেখাতে পারব না।

গোরেলাল মনে মনে বলেন—জমা টাকা বউয়ের ছাড়া আবার কার হবে। গিনি দুটোকে পকেটে ফেলে উনি বাড়ির পথ ধরেন।

চার

আজ পয়লা তারিখের সন্ধ্যা। ব্রজনাথ দরজায় বসে গোরেলালের জন্য অপেক্ষা করছেন।

পাঁচটা বেজে গেছে, গোরেলাল এখনো আসেননি। ব্রজনাথের চোখ দুটো রাস্তার পানে চেয়ে আছে। হাতে একখানা চিঠি, কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। তিন মিনিট বাদে বাদে রাস্তার দিকে তাকান আর মনে মনে ভাবেন—আজ মাইনের তারিখ তাই আসতে দেরি হচ্ছে। বোধ হয় আসছেন। ছটা বাজে, গোরেলালের পাত্তা নেই। অফিসের কর্মচারীরা এক একজন করে চলে আসছে। ব্রজনাথের কয়েকবার ভুল হয়। ওই যে আসছেন। নিশ্চয়ই উনি। সেই আচকান। সেই টুপি। হাঁটার ভঙ্গিও তেমনি, হ্যাঁ, উনিই। এদিকেই আসছেন। বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় যে অন্য লোক। আশার কাল্পনিক মূর্তিখানি হতাশায় বদলে যায়। ব্রজনাথের মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠতে থাকে। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। বারান্দার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দুধারে দৃষ্টি ফেলেন। কোথাও চিহ্ন নেই। দু-তিনবার দূর থেকে আসা এক্কাগুলোকে দেখে গোরেলাল বলে ভুল করেন। আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাই তার কারণ।

সাতটা বাজে। ঘরে ঘরে সন্ধেবাতি জ্বলে ওঠে। রাস্তায় অন্ধকার ঘনাতে থাকে। ব্রজনাথ উদ্‌বিগ্নভাবে রাস্তায় পায়চারি করতে থাকেন। ইচ্ছে হয়, গোরেলালের বাড়িতে যান। ওদিকে পা বাড়ান, কিন্তু বুক কাঁপে পাছে রাস্তায় না ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ভাববেন যে কটা টাকার জন্য এত অস্থির হয়ে পড়েছে। খানিকটা যেতেই কাউকে আসতে দেখেন। ভুল হয় গোরেলাল বলে। ফিরে আসেন, এসে সোজা একেবারে বারান্দায় উঠে নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু এবারেও সেই ধোঁকা। আবার সেই ভুল! তারপর ভাবতে শুরু করেন, কেন এত দেরি হচ্ছে? এখনো কি অফিস থেকে আসেন নি? তা কিছুতেই হতে পারে না। ওঁর অফিসের লোকেরা অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। দুটোই শুধু কারণ হতে পারে — এক, উনি কাল আসবেন বলে ঠিক করেছেন, হয়তো মনে করেছেন রাতে আর কে যায় কিংবা জেনেশুনে ইচ্ছে করে বসে রয়েছেন। দেবার ইচ্ছে নেই বোধ হয়। কাল ওঁর গরজ ছিল, আজ আমার গরজ। আমিই বরং কাউকে কেন পাঠিয়ে দিই না? কিন্তু পাঠাই কাকে? মুন্নাটা যেতে পারে। রাস্তার উপরই বাড়ি। একথা মনে আসতে ঘরে গিয়ে ঢোকেন, ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেন, তবে চোখ দুটো দরজার দিকেই চেয়ে থাকে। অকস্মাৎ কারো পায়ের শব্দ শোনা যায়। তাড়াতাড়ি করে চিঠিটাকে একখানি বইয়ের নীচে চাপা দিয়ে বারান্দায় চলে অসেন। দেখেন পাশের এক সবজিওয়ালা টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁকে দিয়ে পড়াতে এসেছে। তাকে বলেন, ভাই এখন ফুরসত নেই, একটু বাদে এসো। সে মিনতি করে—বাবুমশাই, বাড়িসুদ্ধ সবাই ভয় পেয়ে গেছে, একটু এক নজর দেখে দিন। শেষ পর্যন্ত ব্রজনাথ গজগজ করতে করতে ওর হাত থেকে তারখানাকে নিয়ে এক নজর উপরে উপরে চোখ বুলিয়ে বলেন—কলকাতা থেকে এসেছে। মাল পৌঁছায় নি। সবজিওয়ালা ভয়ে ভয়ে বলে—বাবুমশাই, আর একটু দেখুন না কে পাঠিয়েছে। ব্রজনাথ তারটা ছুঁড়ে ফেলে বলেন—আমার এখন সময় নেই।

আটটা বেজে গেছে। ব্রজনাথ হতাশ হতে থাকেন—মুন্নু এত রাতে যেতে পারবে না। মনে মনে ঠিক করেন, নিজেরই যাওয়া উচিত, তা যাই মনে করুন গে, আর কত দুশ্চিন্তা করব? সাফসাফ বলব, আমার টাকাটা দিয়ে দাও। ভালোমানুষের সঙ্গে ভালোমানুষি করা যেতে পারে। এমন ধড়িবাজদের সঙ্গে ভালোমানুষি করা বোকামি, আচকান পরে ভেতরে গিয়ে ভামাকে বলেন—একটা কাজে একটু বাইরে যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

যেতে হয় তাই যান; তবে পদে পদে থেমে থেমে হাঁটেন। গোরেলালের বাড়ি দূর থেকে চোখে পড়ে, ল্যাম্প জ্বলছে। দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে থাকেন, গিয়ে কী বলব? উনি যদি যেতে না যেতে টাকাটা বের করে দিয়ে দেন আর দেরি হবার জন্য ক্ষমা চান তাহলে আমার খুব লজ্জা করবে। উনি আমাকে ছোটোলোক, ওঁছা, অধৈর্য ভাববেন। না, টাকার কথা তুলতে যাবই বা কেন? বলব— ভাই, বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে পেটব্যথা করছে। তোমার কাছে পুরানো আরক আছে না! কিন্তু না, এই অজুহাতটা খানিকটা বাজে মনে হচ্ছে। আসল মতলবটা বুঝে ফেলবে। উহুঁ! এই ঝঞ্ঝাটের দরকারই বা কী। আমাকে দেখলে উনি আপনা থেকেই বুঝে ফেলবেন। এ নিয়ে কথা বলার কোনো দরকারই হবে না। ব্রজনাথ এসব কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছেন, নদীর ঢেউ যেদিকে খুশি যাক না কেন স্রোত যেমন তার গতি বদলায় না সেরকম।

গোরেলালের বাড়ি আসে। দরজা বন্ধ। ওঁকে ডাকবার সাহস হয় না ব্রজনাথের। ভাবেন হয়ত খেতে বসেছেন। দরজার সামনে দিয়ে এগিয়ে যান, তারপর আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে মাইলখানেক চলে যান, নটা বাজার আওয়াজ কানে আসে। গোরেলাল হয়ত খাওয়া সেরে নিয়েছেন, ভেবে ফিরে আসেন, কিন্তু বাড়ির দরজায় যখন আসেন, অন্ধকার। আশারূপী প্রদীপটি নিভে গেছে। এক মিনিট দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। কী করি? এখনও সবে সন্ধে। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়ে না। পা টিপে টিপে বারান্দায় ওঠেন। দরজায় কান পেতে শোনেন, চারদিকে তাকিয়ে দেখেন কেউ আবার দেখে না ফেলে। কথাবার্তার কিছু কিছু শব্দ ওঁর কানে আসে। মন দিয়ে শোনেন। বউ বলছে—টাকা তো সবটা খরচ হয়ে গেল, ব্রজনাথকে কোথা থেকে দেবে? গোরেলাল জবাব দেন—এমন কীসের তাড়া, পরে দিয়ে দেব। আজ ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়ে এসেছি, কাল মঞ্জুর হয়ে যাবেই। তিন মাস বাদে ফিরব, তখন দেখা যাবে।

ব্রজনাথের মনে হল, কেউ যেন মুখের উপর থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে। ক্রোধে হতাশায় বারান্দা থেকে নেমে আসেন। বাড়ির দিকে যাবার সময় পা দুটো সোজা পড়ছে না, যেন সারাদিনের শ্রান্ত ক্লান্ত এক পথিক।

পাঁচ

সারাটা রাত ব্রজনাথ এপাশ ওপাশ করেন। কখনও গোরেলালের ধূর্ততায় রাগ হয়, কখনও নিজের বোকামিতে। কে জানে কোন গরিব বেচারার টাকা। ওর মনে না জানি কী হচ্ছে। তবে এখন আর রাগ করে বা দুঃখ করে কী লাভ? ভাবেন—টাকা কোত্থেকে জোগাড় হবে? ভামা আগেই নেই বলেছে, বেতন থেকে এতটা বাঁচানো সম্ভব নয়। পাঁচ-দশ টাকার ব্যাপার হত তাহলে খরচ কাটছাঁট করে দেখা যেত। তাহলে এখন কী করি? কারও কাছ থেকে ধার নেব? কিন্তু আমাকে কে ধার দেবে? আজ অবধি কারুর কাছে হাত পাতবার দরকার হয়নি, আর আমার এমন কোনো বন্ধুও তো নেই। যারা আছে, তারা আমাকেই বিরক্ত করে, আমাকে আবার কী দেবে? হ্যাঁ, যদি কিছুদিন আইনের ক্লাস ছেড়ে অনুবাদের কাজে খাটি, তাহলে টাকার জোগাড় হতে পারে। কম করেও একটা মাসের হাড়ভাঙা খাটুনি। সস্তা অনুবাদকের জন্য দরও তো পড়ে গেছে! হায়রে শয়তান! তুই এমন দাগা দিলি! না জানি কোন জন্মের শত্রুতার প্রতিশোধ নিলি। পথে বসিয়ে দিলি একেবারে।

পরদিন থেকে ব্রজনাথের মাথায় টাকার ভাবনা ভর করে, সকালবেলা আইনের ক্লাসে যান, সন্ধেবেলা অফিস থেকে মামলার রায়ের পুলিন্দা বাড়িতে নিয়ে আসেন আর মাঝরাত অবধি জেগে অনুবাদ করেন। মাথা তোলারও সময় পান না। কখনও কখনও রাত একটা-দুটোও বেজে যায়। মস্তিষ্ক যখন একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে তখন বাধ্য হয়ে খাটিয়াতে পড়ে থাকেন।

কিন্তু এতটা পরিশ্রমের অভ্যাস নেই বলে মাঝে মাঝে মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে। কখনও হজমে বিঘ্ন হয়, কখনও জ্বর এসে যায়। তা সত্ত্বেও উনি মেশিনের মতো কাজ করে যান। ভামা কখন কখন রেগেমেগে বলে—কী গো, একটু শোও না, বড়ো ধর্মাত্মা হয়েছ। তোমার মতো পাঁচ-দশটা লোক আরও থাকলে সংসারের কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যেত। ব্রজনাথ এই বিঘ্নকারী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কোনো উত্তর দেন না। ভোর হতে না হতেই আবার সেই একই রকম কাজ শুরু করেন।

এমনি করে তিন তিনটে সপ্তাহ কেটে যায় আর এদিকে মাত্র পঁচিশটা টাকা হাতে আসে। ব্রজনাথ ভাবেন—আর দু-তিন দিনের মধ্যে তরি তীরে ভিড়বে। কিন্তু একুশ দিনের দিন ওঁর প্রচণ্ড জ্বর আসে। তিন দিন পর্যন্ত সে জ্বর ছাড়ে না। ছুটি নিতে হয়, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ভাদ্র মাস। ভামা মনে করে, পিত্তের প্রকোপ। কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে ডাক্তারের ওষুধ খেয়েও যখন জ্বর কমে না তখন ভয় পেয়ে যায়। ব্রজনাথ প্রায়ই জ্বরের মধ্যে বকাঝকা করতে থাকেন। শুনে ভয়ের চোটে ভামা ঘর থেকে পালিয়ে যায়। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে গিয়ে অন্য ঘরে বন্ধ করে রাখে। এবারে ওর মনে হয় এই যন্ত্রণাটা ওই টাকাগুলোর জন্য ভুগতে হচ্ছে না তো! কে জানে, যার টাকা সে হয়তো কিছু করে দিয়েছে। ঠিকই তাই হয়েছে, তা নইলে ওষুধে কাজ হচ্ছে না কেন।

সঙ্কটে পড়লে আমরা ধর্মভীরু হয়ে পড়ি। ওষুধপত্রে হতাশ হয়ে দেবতাদের শরণ নিই। ভামাও দেবতাদের শরণ নেয়। জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি আর তৃতীয়ার উপোস ছাড়া সে এতদিন আর কোনো ব্রত করত না। এবারে সে নবরাত্রের কঠিন ব্রত শুরু করে।

আট দিন পুরো হয়। শেষ দিন আসে। প্রভাত বেলা, ভামা ব্রজনাথকে ওষুধ খাওয়ায়, তারপর বাচ্চা দুটোকে নিয়ে মা দুর্গার পুজো দিতে যায়। ওর হৃদয় আরাধ্যা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপুর। মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছায় সে। পূজারিরা আসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছেন। ধূপ আর চন্দনের সুগন্ধ আসছে। ভামা মন্দিরে প্রবেশ করে। সম্মুখে দুর্গার বিশাল প্রতিমা শোভা পাচ্ছে। দেবীর মুখারবিন্দে এক অপূর্ব দীপ্তি। বিশাল নেত্রদ্বয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি। পবিত্রতার এক জ্যোতির্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত। ভামা এই দীপ্তবর্ণা মূর্তির সামনে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। ওর অন্তঃকরণে একটা নির্মল, বিশুদ্ধ ভাবমিশ্রিত ভয়ের উদয় হয়। চোখ দুটি সে বুজে ফেলে। নতজানু হয়ে বসে জোড়হাত করে করুণ কণ্ঠে সে মিনতি করে—মা গো, আমাকে দয়া করো।

ওর যেন মনে হয় দেবী হাসছেন। দেবীর নেত্রদ্বয় থেকে একটা যেন জ্যোতি এসে তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। দেবীর মুখ থেকে নির্গত এই কথাগুলো সে শুনতে পায়—পরের ধন ফিরিয়ে দে, তোর মঙ্গল হবে।

ভামা উঠে বসে—ওর চোখ দুটিতে নির্মল ভক্তির আভাস ফুটে উঠেছে। মুখমণ্ডল থেকে পবিত্র ভক্তি ঝরে পড়ছে। দেবী বোধ হয় ভামাকে তাঁর আপন প্রভার রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন।

ইতিমধ্যে আরেকজন স্ত্রীলোক আসে। উজ্জ্বল কেশরাশি তার শুষ্ক মুখখানির দুপাশ থেকে ঝুলছে। শরীরে শুধু একখানি শ্বেতশুভ্র শাড়ি। হাতে চুড়ি ছাড়া আর কোনো অলংকার নেই। শোক আর হতাশার যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। সেও দেবীর সামনে মাথা নত করে দুহাতে আঁচলখানা মেলে ধরে বলে—মা, যে আমার টাকা নিয়েছে তার সর্বনাশ কর।

সেতার যেমন মেজ্‌রাপের আঘাতে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, ভামার মনটাও তেমনি অনিষ্ট আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে ওঠে। কথাগুলো তীক্ষ্ণ শরের মতো ওর বুকে বিঁধ হয়। সে মা দুর্গার দিকে কাতর নেত্রে তাকায়। দেবীর জ্যোতির্ময় প্রতিমা ভয়ংকর, নেত্রদ্বয় থেকে ভীষণ অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে। আকাশ থেকে, মন্দিরের সামনেকার বৃক্ষগুলি থেকে, মন্দিরের সমস্ত স্তম্ভ থেকে, সিংহাসনের প্রজ্বলিত প্রদীপ থেকে এবং দেবীর করাল মুখ থেকে এ কথাগুলো নির্গত হয়ে ভামার অন্তঃকরণে সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—পরের ধন ফিরিয়ে দে, নইলে তোর সর্বনাশ হবে। ভামা উঠে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধাকে বলে—তোমার টাকা কি কেউ নিয়ে নিয়েছে?

বৃদ্ধা এমনভাবে ওর দিকে তাকায়, যেন ডুবন্ত মানুষ কুটোর অবলম্বন পেয়েছে।

বলে—হ্যাঁ, মা!

বৃদ্ধা—এই মাস দেড়েক।

ভামা—কত টাকা ছিল?

বৃদ্ধা—পুরো একশো বিশ টাকা।

ভামা—কী করে হারাল?

বৃদ্ধা—কী জানি কোথায় পড়ে গেছে। আমার স্বামী পলটনে চাকরি করতেন। আজ কয়েক বছর হল উনি মারা গেছেন। আমি এখন সরকার থেকে বছরে ষাট টাকা করে পেনশন পাই। এবারে দু-বছরের পেনশন একসঙ্গেই পেয়েছিলাম। খাজানাখানা থেকে টাকা নিয়ে আসছিলাম। টের পাইনি কখন কোথায় পড়ে গেছে। আটখানা গিনি ছিল।

ভামা—গিনিগুলো যদি পেয়ে যাও তাহলে কী দেবে?

বৃদ্ধা—বেশি না, ও থেকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দেব।

ভামা—টাকা কী হবে, ওর চেয়ে ভালো কোনো জিনিস দাও।

বৃদ্ধা—মা, আর কী দেব, যদ্দিন বাঁচব তোমার সুখ্যাতি করব।

ভামা—না, তার দরকার নেই আমার।

বৃদ্ধা—মা, এ ছাড়া আমার কাছে আর কী আছে?

ভামা—আমাকে আশীর্বাদ দাও। আমার স্বামী অসুস্থ, উনি যেন ভালো হয়ে যান।

বৃদ্ধা—টাকা কি উনিই পেয়েছেন?

ভামা—হ্যাঁ, উনি সেদিন থেকেই তোমাকে খুঁজছেন।

বৃদ্ধা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ে আর আঁচল পেতে কম্পিত কণ্ঠে বলে—মা! এদের কল্যাণ করো।

ভামা আবার দেবীর দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকায়। দেবীর দিব্যরূপে স্নেহের প্রকাশ। দুচোখে করুণার আনন্দদায়িনী আভা। ভামার অন্তঃকরণে কোন এক স্বর্গলোক থেকে এ ধ্বনি কানে আসে—যা তোর কল্যাণ হবে।

ছয়

সন্ধ্যাবেলা। ব্রজনাথের সঙ্গে একায় ভামা তুলসীর বাড়িতে ওর টাকাটা ফেরত দিতে যাচ্ছে। ব্রজনাথের এত পরিশ্রমের রোজগার তো ডাক্তারের পায়ে উৎসর্গ হয়ে গেছে, তবে ভামা এক পড়শির হাত দিয়ে কানের ঝুমকো দুটোকে বেচে টাকার জোগাড় করেছে। ঝুমকো যেদিন তৈরি হয়ে এসেছিল ভামা খুব খুশি হয়েছিল। আজ ওগুলোকে বেচে দিয়ে তার চেয়েও বেশি খুশি।

ব্রজনাথ যখন গিনি আটটা ওকে দেখিয়েছিলেন, ওর মনে রোমাঞ্চ হয়েছিল, তবে সে আনন্দটা মুখে ফুটে ওঠার সাহস পায় নি। আজ সেই গিনিগুলো হাতছাড়া হবার সময় তার অন্তরের আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে চোখে ফুটে উঠছে, ঠোঁটে নাচছে, কপোল দুটিকে রাঙিয়ে তুলছে, আর অঙ্গে অঙ্গে খেলা করছে। ওই আনন্দ ছিল ইন্দ্রিয়ের, এ আনন্দ আত্মার। ওই আনন্দ কুণ্ঠার মধ্যে গোপন ছিল, এ আনন্দ গর্বিতভাবে বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে।

তুলসীর আশীর্বাদ ফলে যায়। আজ পুরো তিন সপ্তাহ বাদে ব্রজনাথ বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছেন। উনি বারবার ভামাকে প্রেমপূর্ণ নয়নে দেখছেন। ভামাকে আজ দেবী বলে মনে হচ্ছে। এতদিন উনি ভামার বাহ্য সৌন্দর্যের শোভা দেখেছেন, আজ উনি ভামার আত্মিক সৌন্দর্য দেখলেন।

তুলসীর বাড়ি একটি গলিতে। একা রাস্তার উপরে থাকে। ব্রজনাথ একা থেকে নেমে তাঁর ছড়িতে ভর দিয়ে ভামার হাত ধরে তুলসীর বাড়িতে যান। তুলসী টাকা নেয়, দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে, বলে—মা দুর্গা তোমাদের মঙ্গল করুন।

বর্ষার পরে গাছের পাতাগুলো যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তুলসীর ফ্যাকাশে মুখখানাও তেমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুখের বলিরেখাগুলো মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। মনে হয় যেন জীর্ণদেহ সতেজ হয়ে উঠেছে। সে নবজীবন লাভ করেছে।

সেখান থেকে ফিরে এসে ব্রজনাথ ঘরের দরজায় বসে আছেন এমন সময় গোরেলাল এসে বসেন। ব্রজনাথ মুখ ঘুরিয়ে নেন।

গোরেলাল বলেন—দাদা শরীর কেমন আছে?

ব্রজনাথ—খুব ভালো আছি।

গোরেলাল—আমাকে ক্ষমা করবে। আমার বড়ো দুঃখ যে তোমার টাকাটা দিতে এত দেরি হয়েছে। পয়লা তারিখেই বাড়ি থেকে একটা জরুরি চিঠি এসে গেল, আর আমি কোনো মতে তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি ছুটলাম। ওখানকার বিপত্তির কথা বলতে গেলে শেষ হবে না। তোমার অসুখের খবর শুনে আজ ছুটতে ছুটতে আসছি। এই নাও টাকাটা এনেছি। এই দেরির জন্য খুবই লজ্জিত।

ব্রজনাথের ক্রোধ শান্ত হয়ে যায়। বিনয়ের মধ্যে শক্তি। বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুস্থ ছিলাম বটে, তবে এখন ভালো হয়ে গেছি। তোমাকে আমার জন্য শুধু শুধু কষ্ট করতে হল। এখন যদি তোমার অসুবিধা থাকে, তাহলে পরে টাকা দিয়ে দেবে। আমি এখন ঋণমুক্ত হয়ে গেছি। এমন কিছু তাড়া নেই।

গোরেলাল বিদায় নিলে ব্রজনাথ টাকাটা নিয়ে ভেতরে এসে ভামাকে বলেন—এই নাও তোমার টাকা; গোরেলাল দিয়ে গেল।

ভামা বলে—এ আমার টাকা নয়, তুলসীর। পরের টাকা নেওয়ার শিক্ষা হয়ে গেছে।

ব্রজনাথ—কিন্তু, তুলসীর সব টাকা তো চুকিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে।

ভামা—চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তো কী হয়েছে? এ ওর আশীর্বাদের দান।

ব্রজ—কানের ঝুমকো কোথা থেকে আসবে?

ভামা—ঝুমকো না থাকে না থাকবে, চিরদিনের জন্য 'কান' তো রয়ে গেল।

অনুবাদ নলী শূর

(দুর্গা কা মন্দির / ১৯১৭)

বলিদান

মানুষের আর্থিক অবস্থার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে তার নামের উপর। বেলা গাঁয়ের মঙ্গারু ঠাকুর যেদিন থেকে কনস্টেবল হয়েছেন, সেদিন থেকে তাঁর নাম হয়েছে মঙ্গালসিংহ। এখন কেউ ওঁকে মঙ্গারু বলতে সাহস করে না। কাল্লু গয়লা যেদিন থেকে থানার দারোগা সাহেবের সঙ্গো বন্ধুত্ব পাতিয়েছে আর গাঁয়ের মোড়ল হয়ে বসেছে, সেদিন থেকে তার নাম কালিকাদিন হয়ে গেছে। এখন কেউ ওকে কাল্লু বললে ও চোখ কটমট করে তাকায়। ঠিক তেমনি হরখচন্দ্র কুর্মি এখন হরখু হয়ে গেছে। আজ থেকে বিশ বছর আগে ওর বাড়িতে চিনি তৈরি হত, কয়েকখানা লাঙল দিয়ে চাষবাস হত আর ব্যাবসাও খুব ফলাও ছিল। কিন্তু বিদেশি চিনি এসে ওর সর্বনাশ করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে কারখানা গেছে, জমি গেছে, খদ্দের গেছে আর সেও গেছে। সত্তর বছরের বুড়ো, যে একদিন তাকিয়া ঠেস দিয়ে পালঙ্কে বসে হুঁকো টানত, সে এখন মাথায় করে ঝুড়ি বয়ে নিয়ে সার ছিটিয়ে দিতে যায়। তবে ওর মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য, কথায় বার্তায় এক ধরনের অহংকার, চালচলনে এখনও এক রকমের দম্ভ রয়ে গেছে। এসবের উপর কালের প্রভাব পড়েনি। সুদিন মানুষের চরিত্রে চিরকালের জন্য তার ছাপ রেখে যায়। হরখুর হাতে এখন শুধু পাঁচ বিঘে জমি। শুধু দুটি বলদ। একটা লাঙলেই শুধু চাষ হয়।

তবে নিজেদের মধ্যে কলহবিবাদের সময় পঞ্চায়েতে ওর মতামতকে এখনও সমীহ করা হয়। সে যা বলে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে আর গাঁয়ের নিরক্ষর লোকগুলো ওর সামনে মুখ খুলতে পারে না।

হরখু জীবনে কোনোদিন ওষুধ খায়নি। অসুখ ওর হাত ঠিকই। আশ্বিন মাসে ম্যালেরিয়ার কবল থেকে কখনও রেহাই পেত না। তবে পাঁচ-দশ দিনে সে ওষুধপত্র ছাড়াই চাঙ্গা হয়ে উঠত। এ বছরও কার্তিক মাসে অসুখে পড়ল। ভালো তো হয়েই যাব একথা ভেবে সে কোনো পরোয়া করেনি, কিন্তু এবারের জ্বরটা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। এক সপ্তাহ যায়, দু-সপ্তাহ যায়, এক মাস কেটে যায়, কিন্তু হরখু বিছানা ছেড়ে ওঠে না। এবারে ওর মনে হল ওষুধের দরকার। ওর ছেলে গিরিধারী কখনও নিমের ক্বাথ খাওয়ায়, কখনও কুরচির ছালের রস, কখনও পুনর্নবার শেকড়। কিন্তু এসব ওষুধে কোনো কাজ হল না। হরখুর বিশ্বাস হয়ে গেছে যে এবারে সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার দিন এসে গেছে। একদিন মঙ্গালসিংহ ওকে দেখতে এল। বেচারা ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে রামনাম জপছে। মঙ্গালসিংহ বলে—দাদু, ওষুধ না খেলে ভালো হবেন না। কুইনিন কেন খাচ্ছেন না? হরখু উদাসীনভাবে বলে—বেশ, নিয়ে এসো।

পরদিন কালিকাদিন এসে বলে—দাদু, দু-চার দিন কিছু একটা ওষুধ খেয়ে নাও। এখন তোমার তো আর জোয়ান শরীর নেই যে ওষুধপত্র ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে।

হরখু তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—তাহলে নিয়ে এসো। কিন্তু রোগীকে দেখে আসা এক কথা আর ওষুধ এনে তাকে দেওয়া আরেক কথা। প্রথম ব্যাপারটা হয় শিষ্টাচারে আর শেষেরটা সত্যিকারের সমবেদনা থাকলে। না মঙ্গালসিংহ খোঁজখবর নেয়, না কালিকাদিন, না আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি। হরখু দালানে খাটের উপর পড়ে থাকে। মঙ্গালসিংহকে দেখতে পেলে বলে—কী রে ভাই, ওষুধটা আনলি না? মঙ্গালসিংহ পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কালিকাদিনকে দেখলে ওকেও এক প্রশ্ন করে; কিন্তু সেও নজর বাঁচিয়ে যায়। হয় হরখুর মনে এ কথাটা আসেই না যে ওষুধ পয়সা ছাড়া মেলে না, কিংবা হয়তো সে পয়সাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করে, কিংবা সে হয়তো জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে। ওষুধের দামের কথা সে কখনও তোলে না। ওষুধও আসে না। ওর অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। শেষে পাঁচ মাস ভুগে ঠিক হোলির দিনে সে দেহত্যাগ করে। গিরিধারী খুব ধুমধাম করে ওর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। শ্রাদ্ধশান্তি করল খুব জাঁক করে। কয়েকখানা গাঁয়ের বামুনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল।

বেলা গাঁয়ে হোলির উৎসব পালন করা হল না। না উড়ল আবির গুলাল, না বাজল খঞ্জনি, না বইল ভাঙের নদী। কিছু লোক মনে মনে হরখুকে গালাগালি দেয় এই বলে যে বুড়োটা মরতে আর দিন পেল না, দু-চার দিন বাদে না হয় মরত। তবে এতটা নির্লজ্জ কেউ নেই যে শোকের মধ্যে আনন্দ করবে। এ শহর নয়। যেখানে একজন আর একজনের ব্যাপারে শরিক হয় না, যেখানে প্রতিবেশীর কান্নাকাটির আওয়াজ কারও কানে এসে পৌঁছায় না।

দুই

হরখুর জমিগুলোর উপর গাঁয়ের লোকের নজর রয়েছে। পাঁচ-পাঁচ বিঘে জমি কুয়োর পাশে, সার-গোবরে বোঝাই, আল দিয়ে ভরা ওই জমিতে তিন-তিনটে ফসল হয়। হরখু মরতে না মরতে চারদিক থেকে জমিগুলের উপর হামলা হতে থাকে। গিরিধারী শ্রাদ্ধশান্তি নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে গাঁয়ের মতলববাজ চাষিরা লালা ওঙ্কারনাথকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, মোটা মোটা সেলামি দিচ্ছে। কয়েক বছরের খাজনা আগাম দিতেও কেউ কেউ রাজি, কেউ দ্বিগুণ সেলামি দিয়ে দস্তাবেজ লেখাতে উন্মুখ। কিন্তু ওঙ্কারনাথ সবাইকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কথা, গিরিধারীর দাবি সবার আগে। সে যদি অন্যদের চেয়ে কমও সেলামি দেয় তবু জমিগুলো ওকেই দেওয়া উচিত। যাই হোক, যখন শ্রাদ্ধশান্তি সারা হল আর চৈত্রমাসটা শেষ হয়ে এল তখন জমিদার মশাই গিরিধারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—জমিগুলোর ব্যাপারে কী বলিস? গিরিধারী কেঁদে বলে—ওই জমিগুলোই তো ভরসা, চাষ না করে কী করব?

ওঙ্কারনাথ—না, চাষ তো করবিই, জমি তোর, আমি তোকে ছাড়তে বলছি না। হরখু আজ বিশ বছর ওই জমি চাষ করেছে। ওই জমির উপর তোর দাবি রয়েছে। তবে তুই তো দেখছিস আজকাল জমির দর কত বেড়ে গেছে। বিঘে পিছু আট টাকা খাজনায় চাষ করতিস, এখন দশ টাকা পাচ্ছি। আর সেলামির একশো টাকা। সে তো আলাদা, তোকে খাতির করে আমি আগের খাজনাই রাখছি, তবে সেলামির টাকাটা তোকে দিতে হবে।

গিরিধারী— হুজুর, আমার ঘরে তো এখন খাওয়াই জুটছে না। এতগুলো টাকা কোত্থেকে দেব? যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল, বাবার কাজে শেষ হয়ে গেছে। ফসল তো এখনও খামারে। তার উপর বাবার অসুখের জন্য ফসলটাও ভালো হয়নি, টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব হুজুর?

ওঙ্কারনাথ— তা তো ঠিকই, তবে আমি কিন্তু এর চেয়ে বেশি ছাড়তে পারব না।

গিরিধারী— না, হুজুর অমন কথা বলবেন না। তাহলে আমি মারার আগেই মরে যাব। আপনি গুরুজন হয়ে যখন বলছেন তখন আমি গরুবাছুর বেচে পঞ্চাশ টাকা জোটাতে পারি। এর চেয়ে বেশি সাহস নেই।

ওঙ্কারনাথ রেগে গিয়ে বলেন — তুই বোধহয় ভাবছিস আমি এ টাকাগুলো নিয়ে আমার ঘরে জমিয়ে রাখি আর খোশ মেজাজে দিন কাটাই। আমার উপর দিয়ে যা যায় সে আমিই জানি, কোথাও অমুক চাঁদা দাও, কোথাও তমুক পুরস্কার দাও, এসবের চোটে নাকাল হয়ে যাচ্ছি। বড়োদিনে শয়ে শয়ে টাকা ভেট দিতে উড়ে যায়। যাকে ভেট দেব না, সেই গাল ফোলাবে। যেসব জিনিসের জন্য ছেলেপুলেরা হাপিত্যেশ করে থাকে সেসব জিনিস আনিয়ে ডালিতে সাজিয়ে তাঁদের পাঠাই। তার উপর কখনও কানুনগো আসছেন, কখনও তহশিলদার, কখনও ডেপুটি সাহেবের দলবল আসছেন। সবাই আমার অতিথি হন, এসব না যদি করি তাহলে সবাই দুষবে আর সবার চক্ষুশূল হয়ে পড়ব। তাঁদের খোরাক জোগাতে বছরে হাজার বারোশো তো মুদির খাতায় দিতে হয়। এসব কোথা থেকে আসে? ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই। কিন্তু ভগবান তো এই কাজের জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন — একজনকে নির্যাতন করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর অন্যকে তা কাঁদতে কাঁদতে দিয়ে দিই। এই তো আমার কাজ। তোকে এত ছাড় দিচ্ছি। কিন্তু তুই এতেও যদি খুশি না হোস তো সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেলামিতে একটা পয়সাও ছাড় হবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দাখিল করলে জমি চাষ করতে পাবি, নইলে নয়। আমি অন্য কোনো ব্যবস্থা করে ফেলব।

তিন

গিরিধারী মনের দুঃখে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। একশো টাকার ব্যবস্থা করা ওর ক্ষমতার বাইরে। ভাবতে থাকে — বলদ দুটোও যদি বেচে দিই তাহলে জমি নিয়েই বা কী করব? বাড়ি বেচতে চাইলে এখানে নেবার লোকই বা কোথায়? তার উপর বাপঠাকুরদার নাম ডুববে। চার-পাঁচটা গাছ আছে, ওগুলো বেচলে পঁচিশ কী তিরিশ টাকার বেশি পাওয়া যাবে না। ধার যে নেব, দেবে কে? এখনও বেনে দোকানের পঞ্চাশ টাকা বাকি পড়ে আছে। সে এক পয়সাও দেবে না। ঘরে গয়নাও তো নেই। তাহলে তাই বেচতাম। অনেক কষ্টে একটা হাঁসুলি বানিয়েছিলাম, তাও বেনের ঘরে বাঁধা পড়ে আছে। এক বছর হতে চলল ছাড়াবার মতো অবস্থা হয়নি। গিরিধারী আর তার বউ সুভাগী দুজনেই এই দুশ্চিন্তায় পড়েছে, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। গিরিধারীর খাওয়াদাওয়া ভালো লাগে না, রাতে ঘুম হয় না। জমি হাতছাড়া হয়ে যাবার কথা মনে হলেই ওর বুকটা যন্ত্রণায় মোচড়াতে থাকে। হায়! যে জমি আমি বছরের পর বছর ধরে চাষ করেছি, যাকে সার দিয়ে পরিপাটি করেছি, যার আল বেঁধেছি তার মজা লুটবে এখন আরেকজন। ওই জমি

গিরিধারীর জীবনের অঙ্গা হয়ে গেছে। ও জমির প্রতিটি ইঞ্চি ওর রক্তে রাঙা। ওর প্রতিটি পরমাণু ওর ঘামে ভেজা।

জমিগুলোর নাম ওর মুখস্থ; ঠিক যেমন তার তিন ছেলের নাম। কোনোটা চব্বিশা, কোনোটা বাইশা, কোনোটা খালপাড়ের, কোনোটা পুকুরপাড়ের। নামগুলো মনে পড়তেই জমিগুলোর ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খেতগুলোর কথা সে এমন ভাবে বলে যেন ওরা জীবন্ত। যেন ওরা ওর ভালোমন্দের সাথি। ওর জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত কল্পনা, মনের সব মাধুরী, সমস্ত আকাশকুসুম সব কিছুই এ জমিগুলোকে ঘিরে। এদের ছেড়ে বেঁচে থাকার কল্পনাই সে করতে পারে না। সেগুলোই এখন ওর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, ঘন্টার পার ঘন্টা জমিগুলোর আলের উপর বসে বসে কাঁদে, যেন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। গিরিধারী টাকার জোগাড় করে উঠতে পারল না। অষ্টম দিনে সে শোনে যে কালিকাদিন একশো টাকা সেলামি দিয়ে বিঘে পিছু দশ টাকা খাজনা দিয়ে জমিগুলো নিয়ে নিয়েছে। গিরিধারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পরমুহূর্তে সে তার বাবার নাম করে হু হু করে কাঁদতে থাকে। বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলে না। মনে হয় যেন হরখু আজই মারা গেছে।

চার

তবে সুভাগী এমনি এমনি চুপচাপ বসে থাকার পাত্রী নয়। সে রাগে গজগজ করতে করতে কালিকাদিনের বাড়ি চড়াও হয়ে ওর বউটাকে খুব একচোট কটুকাটব্য করে। কালকের বেনে, আজকের শেঠ। জমি চাষ করতে যাচ্ছেন। দেখব, কে আমার জমিতে লাঙল নিয়ে যায়? আমার রক্ত আর তার রক্ত একাকার করে ফেলব। পাড়াপড়শিরাও ওর পক্ষ নিল। বলে, সবই তো তার আছে, নিজেদের মধ্যে এভাবে দর হাঁকাহাঁকি করা ঠিক নয়। নারায়ণ ধন দিয়েছেন, তাই বলে কি গরিবদের পায়ে পিষবে। সুভাগী ভাবে— আমার জিত হয়েছে। ওর মনটা জুড়োয়। কিন্তু যে বাতাস জলে ঢেউ তোলে সে বাতাসই আবার গাছকে শেকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে। সুভাগী প্রতিবেশীদের বৈঠকে তার দুঃখের কাহিনি শোনায় আর কালিকাদিনের বউয়ের সঙ্গে খিটিমিটি করে। ওদিকে গিরিধারী তার ঘরের দরজায় বসে বসে ভাবে, এবারে আমার কী অবস্থা হবে? এ জীবনটা কাটবে কেমন করে? ছেলেগুলো কার দরজায় যাবে? জনমজুরি খাটার কথা মনে হলেই ওর বুকটা হুহু করে ওঠে। এতদিন স্বাধীনভাবে সম্মান নিয়ে সুখ ভোগ করার পর আজ জনমজুরের মতো গোলামি করার চাইতে মরে যাওয়া ভালো মনে হয়। এতদিন গিরিধারী গৃহস্থ ছিল, গাঁয়ের ভালো লোকদের মধ্যে ও একজন বলে গণ্য হত। গাঁয়ের ব্যাপারে ওর কথা বলার অধিকার ছিল। ওর ঘরে সম্পদ না থাকলেও সম্মান ছিল। নাপিত, ছুতোর, কুমোর, পুরুত, ভাট, চৌকিদার এরা সবাই ওর মুখ চেয়ে থাকত। সে মর্যাদা এখন কোথায়! এখন কে ওকে পয়সা দেবে। কে ওর দুয়ারে আসবে। এখন কারোর সঙ্গে একাসনে বসবার, কারও কথায় কথা বলবার অধিকার আর তার রইল না। পেটের দায়ে এখন ওকে অন্যের গোলামি করতে হবে। এক প্রহর রাত থাকতে উঠে কে এখন বলদগুলোকে ঘাসবিচালি খাওয়াবে। সেসব দিন এখন কোথায় যখন গান গেয়ে সে

লাঙল চালাত। মাথার ঘাম পায়ে পড়ত বটে, তবুও একটু ক্লান্তি আসত না। ঢেউ খেলে-যাওয়া জমিগুলো দেখে তার আনন্দের সীমা থাকত না। খামারে স্তূপাকার ফসল সামনে রেখে নিজেকে সে রাজা ভাবত। ঝুড়ি ভরে ভরে ফসল আর কে আনবে? এখন জমি কই? গোলা কই? এসব কথা ভাবতে ভাবতে গিরিধারীর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। গাঁয়ের দু-চারজন ভদ্রলোক, যারা কালিকাদিনের ওপর চটা, মাঝে মাঝে গিরিধারীকে সান্ত্বনা দিতে আসে, কিন্তু সে ওদের সঙ্গেও মন খুলে কথা বলে না। মনে হয় সে সবার চোখেই হেয় হয়ে গেছে।

যদি কেউ বলে, তুমি শ্রাদ্ধশান্তিতে শুধু শুধু অতগুলো টাকা উড়িয়ে দিয়েছ, শুনে ওর খুব দুঃখ হয়। তার ওই কাজের জন্য বিন্দুমাত্র সে অনুশোচনা করে না। ভাবে, আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে; তবে পিতৃঋণ থেকে তো মক্ত হয়েছি। বাবা বেঁচে থাকতে আমাদের চার বেলা খাইয়ে তবে খেয়েছেন। এখন মরবার পর উনি পিণ্ডজলের জন্য হা-হুতাশ করবেন!

এমনি করে তিন মাস কেটে যায়। আষাঢ় এসে পড়ে। আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়, বৃষ্টি হয়। কিষানেরা হাল-লাঙল ঠিকঠাক করতে শুরু করে, ছুতোররা লাঙল সারাতে শুরু করে। গিরিধারী পাগলের মতো একবার ঘরে ঢোকে আবার বাইরে আসে। তার লাঙলগুলোকে বের করে দেখে। এটার মুঠো ভেঙে গেছে, ওটার ফালটা ঢিলে হয়ে গেছে। জোয়ালে খুঁটি নেই। দেখতে দেখতে সে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে ভুলে যায়। ছুটতে ছুটতে ছুতোরের বাড়ি গিয়ে বলে—রজ্জু, আমার লাঙলটাও খারাপ হয়ে গেছে। দাও সারিয়ে দাও। রজ্জু ওর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর নিজের কাজ করতে থাকে। গিরিধারীর হুঁশ হয়, যেন ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে, আত্মগ্লানিতে মাথা হেঁট হয়, চোখে জল আসে। চুপচাপ সে বাড়ি চলে আসে।

গাঁয়ে চারদিকে হইহই পড়ে গেছে। কেউ পাটের বীজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ জমিদারের গোলা থেকে ধানের বীজ নিতে আসছে। কোথাও সলাপরামর্শ হচ্ছে, কোন জমিতে কী লাগানো উচিত। কোথাও আলোচনা হচ্ছে, জল খুব বেশি হয়ে গেছে, দু-চার দিন অপেক্ষা করে বীজ বোনা উচিত। গিরিধারী এসব কথা শোনে আর ডাঙায়-তোলা মাছের মতো ছটফট করে।

পাঁচ

একদিন সন্ধ্যার সময় গিরিধারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বলদ দুটোর গা চুলকে দিচ্ছে এমন সময় মঙ্গলসিংহ আসে। একথা সেকথা বলে। তারপর বলে—বলদ দুটোকে কদ্দিন আর ঘরে বেঁধে খাওয়াবে? বেচে দাও না কেন? গিরিধারী মলিন মুখে বলে—হ্যাঁ, কোনো খদ্দের পেলে বেচে দেব।

মঙ্গলসিংহ—এক খদ্দের তো আমি নিজেই। আমাকেই বেচে দাও না।

গিরিধারী কোনো উত্তর দিতে না দিতেই তুলসী বেনে আসে। গর্জন করে বলে—গিরিধারী, তুমি আমার টাকাটা দেবে কি দেবে না বল। তিন মাস ধরে টালবাহানা করে আসছ। এখন কোন্ চাষবাস করছ যে তোমার ফসলের আশায় বসে থাকব?

গিরিধারী বিনীতভাবে বলে—সাহুভাই, যেমন করে এতগুলো দিন সবুর করেছ, তেমনি করে আজকের দিনটাও সবুর করো। কাল তোমার প্রতিটি পাই চুকিয়ে দেব।

মঙ্গাল আর তুলসী ঠারেঠোরে কথা বলে। তুলসী গজগজ করতে করতে চলে যায়। তখন গিরিধারী মঙ্গালসিংহকে বলে—তুমি বলদ দুটোকে নিয়ে যাও, তাহলে বাড়ির গোরু বাড়িতেই থেকে যাবে। মাঝে-মধ্যে গিয়ে চোখের দেখা দেখে আসব।

মঙ্গাল — আমার তো এমন কোনো তাড়া নেই, আগে বাড়িতে সলাপরামর্শ করি।

গিরিধারী — আমাকে তুলসীর টাকাটা দিতে হবে, নইলে খাওয়াবার ভুসিতো ঘরেই আছে।

মঙ্গাল—লোকটা বড়ো পাজি। আবার নালিশ-টালিশ না করে বসে।

সরলহৃদয় গিরিধারী হুমকিতে কাবু হয়। বিচক্ষণ মঙ্গালসিংহের সস্তায় সওদা করার এক মওকা মেলে। আশি টাকা বলদের জোড়া ষাট টাকায় সাব্যস্ত হয়।

গিরিধারী জানি না কোন আশা নিয়ে বলদ দুটোকে এতদিন ঘরে বেঁধে খাইয়েছে। আজ তার আশার সেই কাল্পনিক সুতোটুকুও ছিঁড়ে যায়। মঙ্গালসিংহ গিরিধারীর খাটে বসে টাকা গোনে আর ওদিকে গিরিধারী বলদ দুটোর কাছে বসে বিষণ্ণ নেত্রে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আহা! এরা আমার জমির রোজগেরে সাথি, আমার জীবনের আধার, আমার অন্নদাতা, আমার মান-মর্যাদার রক্ষক। এক প্রহর রাত থাকতে উঠে এদের জন্য খড় কাটতাম। নিজের খাবারের চাইতে এদের খোলভুষির ভাবনা-চিন্তা বেশি করতাম। বাড়ির সবাই এদের জন্য সবুজ সবুজ ঘাস তুলে আনত। এরা আমার আশার দুটি নয়ন, আকাঙ্ক্ষার দুটি নয়নমণি, আমার সুদিনের দুটি স্মৃতিচিহ্ন, আমার দুটি বাহু—আজ আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গালসিংহ যখন টাকাগুলো গুনে রেখে বলদ দুটিকে নিয়ে রওনা হল গিরিধারী তখন ওদের কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। মেয়ে যেমন বাপের বাড়ি থেকে যাবার সময় মা-বাবার পা ছাড়ে না, তেমনি গিরিধারীও বলদ দুটোকে ছাড়ে না। সুভাগীও দালানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। ওদের ছোট্ট ছেলেটা মঙ্গালসিংহকে একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মারতে থাকে।

রাতে গিরিধারী কিছু খায় না, খাটিয়াতে চুপচাপ পড়ে থাকে, সকালে সুভাগী কলকে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখে সে খাটিয়ায় নেই। ভাবে, হয়তো কোথাও গেছে। কিন্তু যখন বেলা দু-তিন ঘন্টা গড়িয়ে যায় অথচ গিরিধারী ফিরে আসে না তখন সে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। গাঁয়ের লোকজন জড়ো হয়ে যায়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কিন্তু গিরিধারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছয়

সন্ধে হয়ে গেছে। অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেছে। সুভাগী প্রদীপ জ্বালিয়ে এনে গিরিধারীর বিছানার শিয়রে রাখে, তারপর বসে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ও পায়ের শব্দ শুনতে পায়। সুভাগীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। একছুটে বাইরে এসে এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। দেখে গিরিধারী বলদের নাদার পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে। সুভাগী বলে ওঠে—ঘরে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ, আর সারাটা দিন কোথায় ছিলে? বলতে বলতে সে গিরিধারীর দিকে এগিয়ে যায়। গিরিধারী কোনো কথা বলে না। পিছু হটতে থাকে। তারপর খানিকটা গিয়ে মিলিয়ে যায়। সুভাগী চেঁচিয়ে ওঠে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।

পরদিন কালিকাদিন লাঙল নিয়ে জমিতে যায়। তখনও কিছুটা অন্ধকার। বলদ দুটোকে লাঙলে জুততে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ সে দেখে গিরিধারী খেতের আলে দাঁড়িয়ে আছে—সেই ফতুয়া গায়ে, সেই পাগড়ি, সেই লাঠি। কালিকাদিন বলে—আরে গিরিধারী, ব্যাটাচ্ছেলে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ আর ওদিকে বেচারি সুভাগী খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথা থেকে আসছ? বলতে বলতে বলদ দুটোকে রেখে সে গিরিধারীর দিকে এগোয়। গিরিধারী পিছু হটতে থাকে। পেছোতে পেছোতে পিছনের কুয়োটাতে লাফিয়ে পড়ে।

কালিকাদিন চিৎকার করে ওঠে। হাল বলদ সব ওখানেই ফেলে রেখে পালায়। সারা গাঁয়ে হইহই শুরু হয়। লোকেরা নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। গিরিধারীর জমিতে যাবার আর সাহস হয় না কালিকাদিনের। গিরিধারী উধাও হয়েছে আজ ছ'মাস। ওর বড়ো ছেলেটা এখন একটা ইটের ভাঁটায় কাজ করে। মাসে বিশ টাকা ঘরে আসে। এখন ও শার্ট আর বুটজুতো পরে। বাড়িতে দুবেলা তরকারি রান্না হয়। যবের বদলে গম খাওয়া হয়। কিন্তু গ্রামে ওর কোনো খাতির নেই। ও এখন মজুর। সুভাগী এখন অন্য গাঁয়ে ঢুকেপড়া কুকুরের মতো কুঁকড়ে থাকে। সে এখন পঞ্চায়েতে আসে না। সে এখন মজুরের মা। কালিকাদিন গিরিধারীর জমি ছেড়ে দিয়েছে। কারণ গিরিধারী এখনও তার জমির চারপাশে ঘুরঘুর করে। অন্ধকার হওয়া মাত্রই আলে এসে বসে আর মাঝে মাঝে রাতের বেলা ওদিক থেকে ওর কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। সে কাউকে কিছু বলে না, কাউকে জ্বালাতন করে না। সে শুধু তার জমিগুলোকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকে। সাঁঝের বাতি জ্বলবার পর ওদিককার রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। লালা ওঙ্কারনাথের খুব ইচ্ছে যে জমিগুলো কেউ নেয়, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা এখন ও জমির নাম মুখে আনতেও ভয় পায়।

(বলিদান / ১৯১৮) অনুবাদ ননী শূর

ব্যাঙ্ক-দেউলে

লালা সাঁইদাস লখনউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিসে আরামকেদারায় শুয়ে শুয়ে শেয়ারের দর দেখছেন আর ভাবছেন অংশীদারদের এবারে কোথা থেকে লভ্যাংশ দেওয়া হবে। চা, কয়লা কিংবা পাটের শেয়ার কেনার, রুপো, সোনা কিংবা তুলোর ফাটকাবাজির ইচ্ছে হয়, কিন্তু লোকসানের ভয়ে কিছু ঠিক করে উঠতে পারছেন না। শস্যের ব্যাবসায়ে এবারে খুব লোকসান হয়েছে, অংশীদারদের সান্ত্বনা দেবার জন্য লাভক্ষতির একটি কল্পিত বিবরণ বানাতে হয়েছে আর লভ্যাংশ দিতে হয়েছে মূলধন থেকে। তাই শস্যের ব্যাবসায় আবার হাত দিতে বুক কাঁপছে।

কিন্তু টাকাগুলোকে বেকার ফেলে রাখাও অসম্ভব। দু-একদিনের মধ্যে টাকাগুলোকে কোথাও না কোথাও খাটাবার উপযুক্ত উপায় খুঁজে বের করা দরকার; কারণ ডাইরেক্টরদের ত্রৈমাসিক অধিবেশন এক সপ্তাহের মধ্যেই হবার কথা আর যদি এই সময়ের মধ্যে কোনো সিধান্ত না নেওয়া যায় তাহলে এর পর তিন মাস আর কিছু হতে পারবে না। ফলে যাণ্মাসিক লভ্যাংশ বন্টনের সময় আবার সেই কাগুজে কারসাজি করতে হবে, যা বারে বারে ব্যাঙ্কের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। অনেকক্ষণ এই সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকার পর সাঁইদাস ঘন্টি বাজান। ঘন্টি শুনে পাশের কামরা থেকে এক বাঙালিবাবু মাথা বাড়িয়ে উঁকি দেন।

সাঁইদাস—টাটা স্টিল কোম্পানিকে একখানা চিঠি লিখে দিন তারা যেন তাদের একটা নতুন ব্যালান্স শিট পাঠিয়ে দেয়।

বাবু—ওদের টাকার গরজ নেই। চিঠির উত্তর দেয় না।

সাঁইদাস—বেশ, নাগপুরের স্বদেশি মিলকে লিখুন।

বাবু—ওদের কারবার ভালো নয়। সম্প্রতি ওদের শ্রমিকরা হরতাল করেছে। দুমাস মিল বন্ধ ছিল।

সাঁইদাস—আরে মশাই, কোথাও না কোথাও তো লিখতেই হবে! আপনার চোখে তো সারা দুনিয়াটাই বেইমানে ভরা।

বাবু—আরে বাবা, তা নাহয় আমি সব জায়গায় লিখে দেব, কিন্তু শুধু লিখে দিলেই তো কিছু লাভ নেই।

লালা সাঁইদাস আপন বংশমর্যাদা এবং সম্মানের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসেছেন, কিন্তু বাস্তব কাজকর্মের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। এই বাঙালিবাবুটিই তাঁর পরামর্শদাতা। এদিকে এই বাবুমশায়টির কোনো কারখানা বা কোম্পানির উপর আস্থা নেই। এরই অবিশ্বাসের ফলে গত বছর ব্যাঙ্কের টাকা সিন্দুক থেকে বাইরে বেরোতে পারেনি, আর এবার আবার সেই

অবস্থাই দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় মাথায় আসছে না। এমন সাহসও নেই যে নিজের ভরসায় কোনো ব্যাবসায় হাত লাগাবেন। অস্থিরচিত্তে ঘরে পায়চারি করতে থাকেন, এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দেয়—বরহলের মহারানি এসেছেন।

দুই

লালা সাঁইদাস চমকে ওঠেন। আজ তিন-চার দিন হয় বরহলের মহারানি লখনউ এসেছেন আর প্রতিটি লোকের মুখে শুধু ওঁরই কথা। কেউ ওঁর পোশাক পরিচ্ছদে মুগ্ধ, কেউ বা রূপে, কেউ বা ওঁর সাবলীল আচরণে। এমনকী রানির দাসীবাঁদি আর সেপাইরাও লোকেদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। রয়াল হোটেলের সামনে দর্শকের ভিড় লেগেই রয়েছে। কত যে ভাবনাচিন্তাহীন হুজুগে লোক আতরওয়ালা, কাপড়ওয়ালা কিংবা তামাকওয়ালার বেশ ধরে ওঁকে দর্শন করে এসেছে! মহারানির গাড়ি যেখান দিয়ে যায় সেখানেই দর্শকদের ভিড় জমে যায়। বাঃ বাঃ, কী সুন্দর! এমন জমকালো ইরাকি জুড়িঘোড়া তো লাটসাহেব ছাড়া আর কোনো রাজরাজড়ার কাছেও খুব কম দেখা যায়, আর সাজগোজও কী চমৎকার! অরে ভাই, এমন ফরসা লোক তো এখানে দেখাই যায় না। এখানকার বড়োলোকেরা তো 'মৃগনাভি', 'চন্দ্রোদয়' আর ভগবান জানেন কী কী সব ছাইপাঁশ খায়, কিন্তু কারও শরীরে তেজ বা জৌলুসের নামগন্ধও নেই। এই মানুষগুলো না জানি কী খায় আর কোন কুয়োর জলই বা খায় যে যাকেই দেখ, যেন তাজা আপেলটি। এসব হল জল-হাওয়ার গুণ।

বরহল উত্তর দিকে নেপালের কাছে, ইংরেজের অধীনে একটি করদ রাজ্য। লোকে যদিও বরহলকে খুব ধনী দেশ বলে জানে; আসলে কিন্তু ওই রাজ্যের আয় দুলাখের বেশি নয়, হ্যাঁ, আয়তন বেশ বড়ো। অধিকাংশ ভূমি ঊষর ও জনহীন। লোকবতিসপূর্ণ অংশও উঁচুনিচু এবং অনুর্বর। জমির দাম খুব সস্তা।

লালা সাঁইদাস তাড়াতাড়ি খুঁটি থেকে রেশমি স্যুট নামিয়ে পরে নিয়ে টেবিলে এসে এমন ঠাটে বসে পড়েন, যেন রাজারানিদের এখানে আসাটা একটা মামুলি ব্যাপার। অফিসের ক্লার্করাও সটান হয়ে বসে। সারা ব্যাঙ্কে নীরবতার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে যায়। দারোয়ান পাগড়ি সামলায়। চৌকিদার তলোয়ার বের করে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাখাটানা কুলির মিষ্টি ঘুমটাও ভেঙে যায় আর বাঙালিবাবু মহারানিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে যান।

সাঁইদাস বাইরের ঠাট তো বানিয়ে নেন, কিন্তু আশায় আর ভয়ে চিত্ত তাঁর চঞ্চল। একজন রানির সঙ্গে কথা বলার এই প্রথম সুযোগ, ভয় করছে কথা বলতে পারবেন কি পারবেন না। রাজরাজড়াদের মেজাজ থাকে আশমানে। কী জানি কথা বলতে গিয়ে কোনো ভুলচুক না হয়ে যায়। এখন ওঁর একটা অভাব বোধ হতে থাকে। রাজকীয় আদবকায়দা সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ। মহারানিকে কীভাবে সম্মান দেখানো উচিত, ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত, মহারানির মর্যাদা রক্ষার জন্য কতটা নম্রতা দেখানো উচিত, এসব চিন্তায় তিনি বড়ো বিব্রত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে চান যেন এই পরীক্ষা থেকে শিগগিরই মুক্তি পেয়ে যান। ব্যবসায়ী, মামুলি জমিদার কিংবা বড়োলোকদের সঙ্গে উনি কাটকাট সাফসাফ ব্যবহার

করে থাকেন এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক শিষ্ট ব্যবহার করে থাকেন। সেসব ক্ষেত্রে ওঁর বিশেষ কোনো ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এখন বড়ো মুশকিল হচ্ছে। এ যেন এক লঙ্কাবাসী তিব্বতে এসে পড়েছে, আর তিব্বতের রীতিনীতি আর কথাবার্তার সে কিছুই জানে না।

হঠাৎ সাঁইদাসের চোখ পড়ে ঘড়ির দিকে। বিকেল চারটে বেজে গেছে অথচ ঘড়িটা এখনও দুপুরের নিদ্রায় মগ্ন। তারিখের কাঁটাটা দৌড়ে সময়কে হারিয়ে দিয়েছে। উনি তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়ান ঘড়িটাকে ঠিক করে দেবেন বলে কিন্তু ততক্ষণে মহারানি ঘরে পদার্পণ করেছেন। সাঁইদাস ঘড়ি ছেড়ে দিয়ে মহারানির কাছে দাঁড়ান। ঠিক করে উঠতে পারেন না, হাতে হাত মেলাবেন, না ঝুঁকে সেলাম করবেন। রানিজি নিজেই তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে এই সমস্যা থেকে ওঁকে রেহাই দেন।

লোকজন সবাই চেয়ারে এসে বসে পড়লে রানির প্রাইভেট সেক্রেটারি কাজের কথাবার্তা শুরু করেন। বরহলের পুরোনো পাঁচালি শোনানোর পরে উনি রানিসাহেবার প্রচেষ্টায় যেসব উন্নতি হয়েছে তার বর্ণনা দেন। বর্তমানে খালের একটি শাখা কাটাবার জন্য দশ লাখ টাকার দরকার। এই উদ্দেশ্যে উনি একটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গেই লেনদেন করা ভালো মনে করেছেন। এখন এটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কই ঠিক করুক যে, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে চায় কি না।

বাঙালিবাবু—আমরা টাকা দিতে পারি, তবে কাগজপত্র না দেখে কিছু বলতে পারব না।

সেক্রেটারি—আপনারা কি কোনো জামানত চান?

সাঁইদাস উদারভাবে বলেন—মশায়, আপনাদের মুখের কথার চেয়ে বড়ো জামানত আর কী হতে পারে।

বাঙালিবাবু—আপনাদের কাছে কি রাজ্যের কোনো হিসাবপত্র আছে?

হেডক্লার্কের বৈষয়িক বুদ্ধির এই ভঙ্গি লালা সাঁইদাসের ভালো লাগে না। উনি এখন উদারতার নেশায় চুর। মহারানির মুখই পাকা জামানত। মহারানির সামনে কাগজপত্র আর হিসাবের কথা তোলা বেনিয়াগিরি বলে মনে হচ্ছে, অবিশ্বাসের গন্ধ বেরোচ্ছে তা থেকে। মহিলাদের সামনে আমরা সৌজন্য ও শিষ্টতার মূর্তি হয়ে উঠি। বাঙালিবাবুর দিকে ক্রূর-কঠোর দৃষ্টি হেনে সাঁইদাস বলেন—কাগজপত্র যাচাই করা এমন কিছু একটা আবশ্যক ব্যাপার নয়, শুধু আমাদের বিশ্বাস হলেই হল।

বাঙালিবাবু— ডাইরেক্টররা কখনও রাজি হবেন না।

সাঁইদাস— আমরা তার পরোয়া করি না, নিজেদের দায়িত্বে আমরা টাকা দিতে পারি।

রানি সাঁইদাসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। ওঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

তিন

কিন্তু ডাইরেক্টররা হিসাবপত্র, আয়ব্যয় দেখা প্রয়োজন মনে করেন এবং এই কাজটা লালা সাঁইদাসের উপরই দেওয়া হয়; কেননা, নিজের কাজ সেরে তার উপরে একটা পুরো দপ্তরের হিসাব নিরীক্ষণ করতে পারে এমন ফুরসত আর কারও ছিল না। সাঁইদাস নিয়মরক্ষা করেন। তিন-চার দিন ধরে হিসাব পরীক্ষা করতে থাকেন। তারপর দেখেশুনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে রিপোর্ট লেখেন। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়। দস্তাবেজ লেখা হয়। টাকা দেওয়া হয়। সুদ ধার্য হয় শতকরা ন টাকা।

তিন বছর ব্যাঙ্কের কারবারে ভালোই উন্নতি হয়। প্রতি ছমাস অন্তর অন্তর না বলে-কয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার থলে অফিসে এসে যায়। ব্যবসায়ীদের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। অংশীদারদের শতকরা সাত টাকা লাভ থাকে।

সাঁইদাসের উপর সবাই খুশি। সবাই ওঁর বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করে। এমনকী, বাঙালিবাবুও আস্তে আস্তে ওঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। সাঁইদাস ওকে বলেন—বাবুমশাই, বিশ্বাস সংসার থেকে লুপ্ত হয়নি, হবে না। সত্যের উপর বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম। যে মানুষের মন থেকে বিশ্বাস চলে গেছে তাকে মৃত বলে মনে করা উচিত। তার মনে হবে যে আমি চারদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বড়ো বড়ো সব সিদ্ধ মহাত্মা পুরুষও তার চোখে বিড়ালতপস্বী বলে মনে হবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিকরাও তার চোখে নামের কাঙাল বলে মনে হবে। সংসারটা তার চোখে কপটতা আর ছলনায় ভরা বলে মনে হয়। এমনকী, তার মন থেকে পরমাত্মার উপরেও শ্রদ্ধা-ভক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। একজন বিখ্যাত দার্শনিকের বক্তব্য হল যতক্ষণ না বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছ, ততক্ষণ প্রতিটি মানুষকে ভালো মানুষ মনে করবে। বর্তমান আইনব্যবস্থাও এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘৃণা তো কাউকেই করা উচিত নয়। আমাদের আত্মা পবিত্র। এই আত্মাকে ঘৃণা করা পবমাত্মাকে ঘৃণা করার সমান। একথা বলছি না যে, সংসারে ছলচাতুরি নেই, বরং তা খুব বেশি মাত্রাতেই আছে। তবে এই ছলচাতুরিকে নিবারণ করা যায় অবিশ্বাস দিয়ে নয়, মানবচরিত্রের জ্ঞান দিয়ে এবং এই জ্ঞান একটা ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ। এমন গুণের দাবি তো আমি করি না, তবে মানুষকে দেখলে তার ভেতরকার মনোভাব বুঝে ফেলতে পারি, এ বিশ্বাস আমার আছে। যে কোনো লোক, তা সে যতই বেশ বদলাক, যতই সাজগোজ করুক, আমার অন্তর্দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না। একথাও মনে রাখা উচিত যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস জন্মায়, অবিশ্বাসে অবিশ্বাস। এটাই জাগতিক নিয়ম। যে মানুষটাকে আপনি প্রথম থেকেই ধূর্ত, কপটাচারী, দুর্জন বলে ধরে নেবেন, সে কখনও আপনার সঙ্গে অকপট ব্যবহার করবে না। সে হঠাৎ আপনাকে হেয় করাব চেষ্টা করবে। অন্যদিকে আপনি যদি কোনো চোরের উপরও আস্থা রাখেন, তাহলে সে আপনার দাস হয়ে থাকবে। সমস্ত সংসারটাকে লুট করলেও আপনাকে ঠকাবে না। যে যতই অপকর্মা, অধার্মিক হোক না কেন আপনি তার গলায় বিশ্বাসের শিকল পরিয়ে তাকে যেদিকে খুশি নিয়ে যেতে পারেন। এমনকী, সে আপনার হাতে পুণ্যাত্মাও হয়ে উঠতে পারে।

বাঙালিবাবুর কাছে এসব দার্শনিক যুক্তিতর্কের কোনো উত্তর থাকে না।

চার

চতুর্থ বছরের প্রথম তারিখ। লালা সাঁইদাস ব্যাঙ্কের অফিসে বসে ডাকপিয়োনের পথ চেয়ে আছেন। আজ বরহল থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আসবে। এবারে ওঁর ইচ্ছা কিছু সাজসজ্জার আসবাবপত্র কিনবেন। এখনও ব্যাঙ্কে টেলিফোন আসেনি। টেলিফোনের আনুমানিক ব্যয়ও আনিয়ে নিয়েছেন। আশার আভায় মুখ প্রদীপ্ত। বাঙালিবাবুকে হেসে বলেন—এ তারিখটাতে আমার হাত চুলকোবেই। আজও হাতের তালুটা চুলকোচ্ছে। একবার ক্লার্ককে বলেন—আবে শরাফত মিঞা, একটু গুনেটুনে বলো তো দেখি, শুধু সুদই আসছে না অফিসের লোকজনদের জন্য

নজরানা-টজরানাও আসছে। আশার প্রভাব বোধ হয় স্থানের উপরও পড়ে, ব্যাঙ্কটাকেও যেন আজ সুন্দর দেখাচ্ছে।

ডাকপিয়োন ঠিক সময়ে আসে। সাঁইদাস অবহেলা ভরে ওর দিকে তাকান। পিয়োন থলে থেকে কয়েকখানা রেজিস্ট্রি খাম বের করে। সাঁইদাস খামগুলোকে উড়োউড়ো চোখে দেখেন। বরহলের কোনো খাম নেই। না ইনশিয়োরেন্স, না শিলমোহর, না সেই হাতের লেখা। কিছুটা হতাশা আসে। ইচ্ছে করে ডাকপিয়োনকে জিজ্ঞেস করেন, কোনো রেজিস্ট্রি চিঠি পড়ে থাকিনি তো; কিন্তু আত্মসংবরণ করে নেন। অফিসের ক্লার্কদের সামনে এতটা অধৈর্য অনুচিত। কিন্তু ডাকপিয়োন যখন যেতে উদ্যত হয় তখন আর থাকতে পারেন না। জিজ্ঞেস করেই ফেলেন—আরে ভাই, ইনশিয়োরেন্সের কোনো খাম পড়ে নেই তো? আজ তো ওটা আসার কথা। ডাকপিয়োন বলে—হুজুর, তা কি হতে পারে? আর কোথাও ভুলচুক হয়ে গেলেও আপনাদের কাজে কি ভুল হতে পারে?

সাঁইদাসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যেন কাঁচা রঙের উপর জল পড়ে। ডাকপিয়োন চলে গেলে বাঙালিবাবুকে জিজ্ঞেস করেন—এই দেরি কেন? আগে তো কখনও এমন হয়নি।

বাঙালিবাবু নিষ্ঠুরভাবে উত্তর দেয়—কোনো কারণে হয়তো দেরি হয়ে গেছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হতাশা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। সাঁইদাসের এখন মনে হয় হয়তো পার্সেলে টাকা আসছে। হতে পারে, তিন হাজার আশরফি পার্সেল করে পাঠিয়েছে। যদিও এই ধারণার কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করার সাহস হয় না, তবুও ওঁর আশা ততক্ষণ বলবতী থাকে যতক্ষণ না পার্সেলের ডাকপিয়োন এসে ফিরে যায়। শেষে সন্ধ্যাবেলা উনি অস্থির মনে উঠে বাড়ি চলে যান। এখন বাকি থাকে চিঠি কিংবা টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা। দু-তিনবার রেগেমেগে উঠে বসেন, ভাবেন খুব কড়া করে চিঠি লিখে দিই আর স্পষ্ট করে জানিয়ে দিই যে, লেনদেনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পালন না করা পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা। একটি দিনের বিলম্বও ব্যাঙ্কের পক্ষে সর্বনাশ হতে পারে। চিঠি লিখলে ফল এই হবে যে আর কোনো দিন এমন অভিযোগ করার দরকার হবে না, কিন্তু কী মনে করে লিখলেন না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কয়েকজন বন্ধু এসেছেন। গল্পসল্প চলতে থাকে। ইতিমধ্যে পোস্টম্যান সন্ধ্যার ডাক দিয়ে যায়। এমনিতে আগে খবরের কাগজগুলোকে খুলে থাকেন, কিন্তু আজ আগে চিঠিগুলোকে খোলেন। কিন্তু না, বরহলের কোনো চিঠি নেই। তখন হতাশ হয়ে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ খোলেন। প্রথমেই টেলিগ্রামের শিরোনাম দেখে সাঁইদাসের রক্ত হিম হয়ে যায়। লেখা রয়েছে—

'তিন দিন রোগভোগের পর কাল সন্ধ্যায় বরহলের মহারানির দেহাবসান।'

এরপরে একটি সংক্ষিপ্ত নোটে লেখা—'বরহলের মহারানির এই অকালমৃত্যু শুধুমাত্র এই রাজ্যের পক্ষেই নয় সমস্ত দেশের পক্ষে একটি শোকাবহ ঘটনা। বড়ো বড়ো কবিরাজ রোগ নির্ণয় করিতে না করিতে মৃত্যু তাঁহার সব কিছু শেষ করিয়া দিয়াছে। রানিসাহেবা সদাসর্বদা তাঁহার রাজ্যের উন্নতির বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তাঁহার এই স্বল্পকালীন রাজত্বকালেই রাজন্য তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ লাভবান হইয়াছে, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যদিও ইহা স্বীকৃত সত্য

যে রাজ্য তাঁহার অবর্তমানে অপরের হস্তে চলিয়া যাইবে, তথাপি এই চিন্তা রানিসাহেবার কর্তব্যপালনে বাধক হয় নাই। রাজ্যকে জামানত রাখিয়া ঋণগ্রহণের কোনো অধিকার আইনত তাঁহার ছিল না, কিন্তু প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া তাঁহাকে কয়েক বারই এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস তিনি যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে রাজ্যকে ঋণমুক্ত করিয়া নিতেন। দিবারাত্র তিনি এইসব কথা ভাবিতেন। কিন্তু রানির এই অকালমৃত্যু এখন এই বিষয়টি নির্ধারণের ভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। দেখা যাউক, এই সমস্ত ঋণের এখন কী পরিণাম ঘটে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, নূতন মহারাজা যিনি বর্তমানে লখনউতে বিরাজমান, তাঁহার উকিলদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বর্গতা মহারানির ঋণসমূহ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্তে মহাজনদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হইবে এবং লখনউর বেশ কয়েকজন মহাজন এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন যে সুদের লোভ কতখানি হানিকারক।'

লালা সাঁইদাস খবরের কাগজখানা টেবিলে রেখে দেন, তারপর আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। এই আকাশ হতাশার শেষ আশ্রয়স্থল। অন্যান্য বন্ধুরাও এই সংবাদ পড়ে। এই নিয়ে বাদবিতণ্ডা চলতে থাকে। চারদিক থেকে সাঁইদাসের উপর দোষারোপ হতে থাকে। সমস্ত দোষটা ওঁরই ঘাড়ে চাপানো হয় এবং ওঁর এতদিনের কর্মকুশলতা এবং দূরদৃষ্টি ধুলোয় মিশে যায়। ব্যাঙ্ক এতবড়ো একটা লোকসান সইতে অসমর্থ। এখন এই চিন্তা এসে উপস্থিত হয় যে কী করে ব্যাঙ্ককে বাঁচানো যায়।

পাঁচ

শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সবাই নিজেদের টাকা তুলে নিতে অস্থির হয়ে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টাকা তুলতে-আসা লোকেদের লাইন পড়ে যায়। চালু খাতায় যাদের টাকা জমা ছিল, তারা তাড়াতাড়ি তুলে নেয়, কোনো ওজরআপত্তিই শোনে না। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত ওই লেখাটির ফলে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমস্ত সুনাম নষ্ট হয়ে যায়। ধৈর্য ধরলে হয়তো ব্যাঙ্ক সামলে নিত। কিন্তু ঝড়-তুফানের মধ্যে কি কোনো নৌকো স্থির থাকতে পারে? শেষ পর্যন্ত খাজাঞ্চি গণেশ উলটে দেয়। ব্যাঙ্কের শিরা থেকে এত রক্ত বেরিয়ে যায় যে ব্যাঙ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।

তিন দিন কেটে যায়। ব্যাঙ্ক-ঘরের সামনে হাজার হাজার লোক। ব্যাঙ্কের দরজায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারা। নানা রকমের গুজব শোনা যাচ্ছে। কখনও গুজব শোনা যায় যে লালা সাঁইদাস বিষ খেয়েছেন। কেউ এসে তাঁর গ্রেফতার হওয়ার খবর শোনায়। কেউ বলে—ডাইরেক্টররা হাজতে আটক হয়েছেন।

হঠাৎ রাস্তায় একটা মোটর আসে, এসে ব্যাঙ্কের সামনে থেমে যায়। কে একজন বলে—বরহলের মহারাজার মোটর। একথা শোনামাত্র শয়ে শয়ে মানুষ অস্থির হয়ে মোটরের দিকে ছোটে। ছুটে গিয়ে ওরা মোটরকে ঘিরে ধরে।

কুমার জগদীশ সিংহ মহারানির মৃত্যুর পর উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লখনউ এসেছেন। অনেক কিছু জিনিসপত্রও কেনবার আছে। যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এতকাল এমনই এক সুযোগের অপেক্ষায় অবরুদ্ধ ছিল, আজ তা পথ পেয়ে জলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই মোটরখানাও আজই কেনা হয়েছে। লখনউ শহরে একটি হাবেলি কেনারও কথাবার্তা চলছে। বহুমূল্য

বিলাসসামগ্রীতে বোঝাই একখানি গাড়ি বরহলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। এখানে এত ভিড় দেখে মহারাজা ভাবেন, হয়তো কোনো নতুন নাটক অভিনীত হবে, তাই মোটর দাঁড় করান। ইতিমধ্যে শয়ে শয়ে মানুষের ভিড় জমে যায়।

কুমারসাহেব জিজ্ঞাসা করেন—আপনারা এখানে কেন জমায়েত হয়েছেন? কোনো নাটক হবে নাকি?

এক ভদ্রলোক, যাঁকে দেখে বখে-যাওয়া বড়োলোক বলে মনে হয়, বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়ো মজার নাটক।

কুমার—কীসের নাটক?

ভদ্রলোক—ভাগ্যের।

কুমারসাহেব এই উত্তর পেয়ে অবাক তো হলেনই, তবে যেহেতু শুনে এসেছেন যে লখনউর মানুষগুলো কথার পিঠে কথা বানায়, তাই তেমন করেই উত্তর দেওয়া উচিত মনে করলেন। বললেন—ভাগ্যের খেলা দেখতে হলে তো এখানে আসার দরকার করে না।

লখনউবাসী—আপনার কথা ঠিক; কিন্তু অন্য জায়গায় এমন মজা কোথায়? এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাগ্য কতজনকে ধনী থেকে নির্ধন এবং নির্ধন থেকে ভিখারি করে দিয়েছে। সকালে যেসব লোক মহলে বসে ছিল, এখন গাছের ছায়াটুকুনও তাদের কপালে নেই। যাদের দরজায় সদাব্রত খোলা ছিল, তারা এখন একখানা রুটির কাঙাল। এই এক সপ্তাহ আগে যে লোকগুলো কালের গতি, সময়ের ফের আর ভাগ্যের খেলাকে কবিদের উপমা মনে করত, এখন তাদের আর্তনাদ আর করুণ ক্রন্দন বিরহীদেরও লজ্জিত করে। এমন নাটক আর কোথায় দেখতে পাবেন?

কুমার—মশায়, আপনি যে হেঁয়ালিকে আরও ঘোরালো করে তুলছেন। গেঁয়ো লোক আমি, আমার সঙ্গে সাদাসিধে ভাবে কথা বলুন।

তখন এক ভদ্রলোক বললেন—মশায়, এটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলেছে। আদাব আরজ, আমাকে চিনতে পেরেছেন?

কুমারসাহেব ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন তারপর হাতে হাত মিলিয়ে বলেন—আরে মিস্টার নাসিম! তুমি এখানে কোথায়? ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হল।

মিস্টার নাসিম আর কুমারসাহেব একসঙ্গে কলেজে পড়তেন। দুজনে একসঙ্গে দেরাদুনে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াতেন; কিন্তু কুমারসাহেব পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে বাধ্য হয়ে যেদিন কলেজ ছাড়লেন, সেদিন থেকে দুই বন্ধুতে আর দেখা হয়নি। নাসিমও তার পরপরই লখনউ-এ নিজের বাড়িতে চলে এসেছেন।

নাসিম উত্তর দেয় — চিনতে পারছেন, আমার সৌভাগ্য। বলুন, এখন তো পোয়াবারো। বন্ধুদের কথা কি মনে আছে?

কুমার—সত্যি বলছি, তোমার কথা সব সময় মনে পড়ত। বলো, ভালো আছ তো? আমি এখানে রয়্যাল হোটেলে উঠেছি। আজকে এসো, শান্ত হয়ে বসে গল্পসল্প করা যাবে।

নাসিম—জনাব, শাস্তি তো ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গো শেষ হয়ে গেছে। এখন তো রুজির চিন্তা মাথায় চেপেছে। পুঁজিপাটা যেটুকুন ছিল, সবই তো আপনার চরণে ভেট হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কটা দেউলে হয়ে ফকির বানিয়ে দিয়েছে। এখন আপনার দরজায় গিয়ে ধরনা দেব।

কুমার—সে তো তোমার নিজের ঘর, নিঃসংকোচে চলে এসো। আমার সঙ্গেই চলো না কেন? কী বলব, আমি মোটেই বুঝতে পারিনি যে আমার অস্বীকৃতির ফল এই দাঁড়াবে। মনে হচ্ছে ব্যাঙ্ক অনেককেই পথে বসিয়েছে।

নাসিম—ঘরে ঘরে শোক ছেয়ে গেছে। আমার কাছে তো পরনের এই জামাকাপড়গুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

ইতিমধ্যে একজন তিলকধারী পণ্ডিতমশাই এসে বলেন—সাহেব, আপনার দেহে তো তবু বস্ত্র আছে। আমার তো ধরিত্রী, আকাশ কোথাও কোনো ঠিকানা নেই। রাধেজি পাঠশালার আমি শিক্ষক। পাঠশালার সমস্ত টাকাপয়সা এই ব্যাঙ্কেই জমা ছিল। পঞ্চাশটি বিদ্যার্থী এরই ভরসায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করত আর ভোজন পেত। কাল থেকে পাঠশালাটি উঠে যাবে। দূরদূরান্তের সমস্ত বিদ্যার্থী। ওরা ওদের ঘরে কীভাবে ফিরে যাবে তা ভগবানই জানেন।

মাথায় পাঞ্জাবি ঢঙের পাগড়ি, খদ্দরের কোট আর চটিজুতো পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নেতৃত্বের ঢঙে বলেন—মশায়, এই ব্যাঙ্ক ফেলিয়োর কত কত ইনস্টিটিউশনকে শেষ করে দিয়েছে। লালা দীননাথের অনাথ আশ্রম আর একদিনও চলবে না। ওদের এক লাখ টাকা ডুবে গেছে। এই তো দিন পনেরো আগে আমি ডেপুটেশন থেকে যখন ফিরে এলাম তখন পনেরো হাজার টাকা অনাথ আশ্রমের খাতায় জমা দিয়েছি; আর এখন কোথ্থাও একটা কানাকড়ি পর্যন্ত নেই।

এক বুড়ো বলেন—সাহেব, আমার তো সারা জীবনের রোজগার ধুলোয় মিশে গেছে। এখন কফনটুকুরও ভরসা আর রইল না।

আস্তে আস্তে আরও লোক জড়ো হয় এবং সাধারণ কথাবার্তা চলতে থাকে। প্রতিটি মানুষ তার কাছের মানুষটিকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে থাকে। কুমারসাহেব আধ ঘন্টা নাসিমের সঙ্গো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব বিপদের কথা শুনে চলেন। যেই মোটরে বসে ড্রাইভারকে হোটেলের দিকে যাবার হুকুম দেন, অমনি মাটিতে মাথা হেঁট করে বসে থাকা একটি লোকের উপর তাঁর নজর পড়ে। লোকটি এক গোয়ালা, ছেলেবেলায় কুমারসাহেবের সঙ্গো খেলাধুলো করেছে। সেসব দিনগুলোতে ওদের মধ্যে উঁচুনিচু বিচার ছিল না, একসঙ্গো ওরা কাবাডি খেলেছে, একসঙ্গো গাছে চড়েছে আর পাখির বাচ্চা চুরি করেছে। কুমারসাহেব যখন দেরাদুনে পড়তে যান, সে সময় এই গোয়ালার ছেলে শিবদাস তার বাবার সঙ্গো লখনউ চলে আসে। এখানে সে দুধের এক দোকান দিয়েছে। কুমারসাহেব ওঁকে চিনতে পেরে উঁচু গলায় ডাকেন—আরে শিবদাস, এদিকে তাকাও।

শিবদাস ডাক শোনে, কিন্তু মাথা তোলে না। নিজের জায়গায় বসে বসেই সে কুমারসাহেবকে দেখছে। ছেলেবেলার সে সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে যখন সে জগদীশের সঙ্গো গুলিডান্ডা খেলত, যখন দুজনে বুড়ো গফুর মিঞাকে মুখ ভেংচে বাড়ির ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত, যখন সে গুরুজির কাছ থেকে ইশারা করে জগদীশকে ডেকে আনত, তারপর দুজনে রামলীলা দেখতে

চেলে যেত। শিবদাস ভেবেছিল যে কুমারসাহেব হয়তো ভুলে গেছে, ছেলেবেলার সে সব কথা এখন কোথায়? আজ কোথায় আমি আর কোথায় উনি! কিন্তু কুমারসাহেব যখন নাম ধরে ডাকলেন তখন সে খুশি হওয়ার বদলে মাথা আরও হেঁট করে ওখান থেকে সরে পড়তে চাইল। কুমারসাহেবের সৌজন্যের মধ্যে সেই বন্ধুত্বের ভাবটি নেই। ও চলে যাচ্ছে দেখে কুমারসাহেব মোটর থেকে নেমে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে জিজ্ঞেস করেন—আরে শিবদাস, আমাকে ভুলে গেছ?

এবারে শিবদাস মনের আবেগ দমন করতে পারে না। চোখদুটো ওর ছলছল করে ওঠে। কুমারের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—ভুলিনি তো, কিন্তু আপনার সামনে আসতে লজ্জা করছিল।

কুমার—এখানে দুধের দোকান দিয়েছ নাকি? আমি তো জানতামই না,তা নইলে আট দিন ধরে জল খেতে খেতে সর্দি কেন হবে? এসো, মোটরে এসে বোসো, আমার সঙ্গো হোটেলে চলো। তোমার সঙ্গো কথা বলতে খুব ইচ্ছা করছে। তোমাকে বরহল নিয়ে যাব আর আর একবার গুলিডান্ডা খেলব।

শিবদাস—অমন করবেন না। লোকে দেখলে হাসবে। আমি হোটেলে যাব। ওই হজরতগঞ্জের হোটেলেই তো উঠেছেন, তাই না?

কুমার—হ্যাঁ, ঠিক আসবে তো?

শিবদাস—আপনি ডাকবেন আর আমি যাব না?

কুমার—এখানে বসে আছ কেন? দোকান চলছে তো?

শিবদাস—আজ সকাল অবধি তো চলেছে। ভবিষ্যতের কথা জানি না।

কুমার—তোমার টাকাও ব্যাঙ্কে জমা ছিল না কী?

শিবদাস—যখন যাব, বলব।

কুমারসাহেব মোটরে এসে বসে ড্রাইভারকে বলেন—হোটেলে চলো।

ড্রাইভার—হুজুর যে হোয়াইটওয়ে কোম্পানির দোকানে যাবার কথা বলেছিলেন।

কুমার—এখন ওদিকে যাব না।

ড্রাইভার—ব্যারিস্টার জ্যাকব সাহেবের কাছেও যাবেন না?

কুমার—(রেগে গিয়ে) না, কোথ্থাও যাব না। আমাকে সোজা হোটেলে নিয়ে চলো।

হতাশা আর বিপত্তির এসব দৃশ্য জগদীশ সিংহের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে—এখন আমার কী করা কর্তব্য?

ছয়

আজ থেকে সাত বছর আগে যখন বরহলের মহারাজ ঠিক যৌবনকালে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান এবং উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন ওঠে, তখন মহারাজর কোনো সন্তান না থাকায়, বংশক্রমানুসারে তাঁর আপন খুড়তুতো ভাই ঠাকুর রামসিংহের উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। উনি দাবিও জানিয়েছিলেন, কিন্তু আদালত রানিকেই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছিল। ঠাকুরসাহেব আপিলের পর আপিল করেছিলেন, প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু সফলকাম হননি। মামলা-মোকদ্দমায় লাখ লাখ টাকা খরচ হয়, নিজস্ব জমিজমাও হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে; কিন্তু হেরে গিয়েও তিনি চুপচাপ বসে থাকেননি। সব সময় বিধবা রানিকে উত্যক্ত করেছেন। কখনও প্রজাদের

উশকে দিয়েছেন, কখনও প্রজাদের কাছে রানির নামে লাগিয়েছেন, কখনও ওঁকে জাল মোকদ্দমায় ফাঁসানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রানি খুবই তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। উনিও ঠাকুরসাহেবের প্রতিটি আঘাতের মুখের মতো জবাব দিতেন। তবে হ্যাঁ, এই টানাহ্যাঁচড়ায় রানিকেও মোটা মোটা টাকা অবশ্যই খরচ করতে হত। প্রজাদের কাছ থেকে টাকা উশুল হত না, তাই ওঁকে বারবার ঋণ নিতে হত, কিন্তু আইনত ঋণ নেওয়ার অধিকার ওঁর ছিল না। তাই রানিকে হয় এই অবস্থাটা গোপন রাখতে হত, কিংবা সুদের চড়া হার মেনে নিতে হত।

কুমার জগদীশ সিংহের ছেলেবেলা খুবই স্নেহে ও আদরে কেটেছে। কিন্তু ঠাকুর রামসিংহ মোকদ্দমা করতে করতে যখন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মনে এমন সন্দেহ হতে লাগল যে রানির ষড়যন্ত্রে না আবার কুমারসাহেবের জীবনসংকট হয়, তখন উনি বাধ্য হয়ে কুমারসাহেবকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুমারসাহেব দেরাদুনে দুবছর তো আনন্দেই কাটালেন, কিন্তু যেই কলেজের প্রথম শ্রেনীতে উঠলেন অমনি পিতার লোকান্তর হল। কুমারসাহেবকে পড়া ছাড়তে হল। বরহলে চলে এলেন। তাঁর কাঁধে আত্মীয় প্রতিপালনের এবং রানির সঙ্গো পুরোনো শত্রুতা সাধনের ভার এসে পড়ল। সেই থেকে মহারানির মৃত্যু পর্যন্ত কুমারসাহেবের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ঋণ করা কিংবা মেয়েদের গয়না বন্ধক রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তার উপরে ছিল বংশমর্যাদা রক্ষার ভাবনা। এই তিনটি বছর ছিল কুমারসাহেবের কঠিন পরীক্ষার সময়। প্রায় রোজ মহাজনদের সঙ্গো লেনদেন করতে হয়েছে, ওদের নিষ্ঠুর বাক্যবাণে অন্তঃকরণ বিদ্ধ হয়েছে। হাকিমদের কঠোর ব্যবহার এবং অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল আত্মীয়স্বজনদের আচরণ। তারা আবার সামনে থেকে আঘাত না করে পাশ থেকে আঘাত কবত; বন্ধুত্ব আর একতার ছদ্মবেশে কপটাচরণ করত। এসব কঠোর যাতনা কুমারসাহেবকে ক্ষমতা, স্বেচ্ছাচাব এবং ধন-ঐশ্বর্যের চরম শত্রু কবে তুলেছে। উনি খুবই ভাবপ্রবণ মানুষ। আত্মীয়স্বজনদের নিষ্ঠুরতা এবং দেশপ্রেমিকদের দুর্নীতি ওঁর মনে কালো ছাপ এঁকে চলছিল। তাঁর সাহিত্যপ্রেম তাঁকে মানবমনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী করে তুলছিল। মানবপ্রকৃতির এই জ্ঞান একদিকে যেমন তাঁকে সভ্যতা থেকে প্রতিদিন দূরে নিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে তাঁর চিত্তে জনগণের ক্ষমতার দাবি এবং সাম্যবাদের ভাবধারাটিকে পুষ্ট করে তুলছিল। ওঁর কাছে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যদি মানুষের মতো ব্যবহার কোথাও থেকে থাকে তবে তা আছে শুধু কুঁড়েঘরে আর গরিবদের মধ্যে। সেসব কষ্টের সময়ে যখন তাঁর চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে ছিল, তখন তিনি ওসব জায়গাতেই মাঝেমধ্যে সত্যিকারের সহানুভূতির আলো দেখতে পেয়েছিলেন। ধনসম্পদকে উনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ নয়, ভগবানের অভিশাপ বলে মনে করতেন, কারণ ধনসম্পদ মানুষের অন্তর থেকে দয়া এবং প্রেমের বোধকে দূর করে দেয়; এটা এমনই এক মেঘ যা মনের উজ্জ্বল তারাগুলোকে ঢেকে ফেলে।

কিন্তু মহারানির মৃত্যুর পর যেইমাত্র ধন-ঐশ্বর্য তাঁর উপর আঘাত করল, অমনি এসব দার্শনিক যুক্তিতর্কের বর্ম ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আত্মবিচারের শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। যারা শত্রুতুল্য ছিল তারা মিত্র হয়ে উঠল, আর যারা সত্যিকারের হিতৈষী ছিল তারা মন থেকে মুছে গেল। তখন তাঁর সাম্যবাদের কল্পিত চিন্তাধারায় ঘোর পরিবর্তন আসতে শুরু করল। হৃদয়ে উদ্ভব হল অসহিষ্ণুতার।

ত্যাগ ভোগের কাছে মাথা নত করল, মর্যাদার শৃঙ্খল গলায় জড়িয়ে গেল। যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দেখে ওঁর রাগ হত, এখন তারাই ওঁর পরামর্শদাতা হয়ে উঠল। যে দৈন্য এবং দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর সত্যিকারের সহানুভূতি ছিল, সেই দৈন্য ও দারিদ্র্য দেখে এখন উনি চোখ বুজে ফেলতে লাগলেন।

সন্দেহ নেই যে, কুমারসাহেব এখনও সাম্যবাদের ভক্ত, কিন্তু এখন আর তিনি আগের মতো স্বচ্ছন্দভাবে সেসব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন না। আদর্শ এখন বাস্তবকে ভয় করে চলে। উনি কথাকে কাজে পরিণত করার সুযোগ পেয়েছেন; কিন্তু এখন কার্যক্ষেত্রকে সমস্যাসংকুল বলে মনে হচ্ছে। বেগার প্রথার উনি চরম শত্রু ছিলেন; কিন্তু এখন বেগার প্রথাকে বন্ধ করা দুষ্কর বলে বোধ হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার তিনি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু এখন ওসব খাতে অর্থ ব্যয় করার আগেই তিনি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিরোধের আশঙ্কা করছেন। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবহারকে উনি পাপ বলে মনে করতেন; কিন্তু এখন কঠোরতা ছাড়া কাজ চলবে মনে হয় না। সার কথা এই যে, যেসব মতাদর্শের প্রতি তাঁর মনে আগে শ্রদ্ধা ছিল এখন সেগুলোকে অসংগত বলে মনে হচ্ছে।

তবে আজ যে দুঃখজনক দৃশ্য ব্যাঙ্কের দরজায় তাঁর চোখে পড়েছে তা আবার তাঁর দয়াবোধকে জাগিয়ে তোলে। তাঁর অবস্থা হয় সেই মানুষটির মতো, যে নৌকোয় বসে বসে সুরম্য নদীতটের সৌন্দর্য উপভোগ করাকালীন একটি শ্মশানের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে দেখল চিতার উপর শবদাহ হচ্ছে। শোকসন্তপ্তরা করুণ ক্রন্দনে মুখর। আর তক্ষুনি সে নৌকো থেকে নেমে নিজেও ওদের শোকেদুঃখে যোগ দিল।

রাত দশটা বেজে গেছে। কুমারসাহেব খাটে শুয়ে আছেন। ব্যাঙ্কের দরজার সামনের দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভাসছে। সেসব বিলাপধ্বনি কানে আসছে, মনে প্রশ্ন জাগছে, এসব বিড়ম্বনার মূলে কি তবে আমিই? কিন্তু যা করার অধিকার আইনত আমার রয়েছে আমি তো তাই করেছি। পুরো জামানত ছাড়াই এতগুলো টাকা ধার দিয়ে রেখেছেন সে কি ব্যাঙ্কের পরিচালকদের ভুল নয়? পাওনাদারদের উচিত ওদের ঘাড় ভেঙে দেওয়া। আমি তো খুদা-ই-ফৌজদার (খুদাই খিদমতগার, ধর্মের ভলান্টিয়ার) নই যে অন্যের বোকামির ফল ভুগব। আবার চিন্তা বদলে যায়— আমি শুধু শুধু এই হোটেলে উঠেছি। চল্লিশ টাকা রোজ দিতে হবে। প্রায় চারশো টাকা খরচ পড়বে। এতগুলো জিনিসপত্র শুধু শুধু কিনেছি। কী দরকার ছিল? মখমলের গদিআঁটা চেয়ারে কিংবা কাচের অলংকরণে আমার মান বাড়তে পারে না। কোনো একটা সাধারণ বাড়ি পাঁচ টাকায় যদি নিয়ে নিতাম, তাহলে কি কাজ চলত না? আমি আর আমার সঙ্গের সব লোকজন আরামে থাকত। বড়োজোর এই হত যে, লোকে নিন্দে করত। তার পরোয়া কে করে? যাদের মাথায় চড়ে এই ঠাট করছি তারা যে এক একখানা রুটির জন্য হা-হুতাশ করছে। এই দশ-বারো হাজার টাকা দিয়ে যদি একটা কুয়ো বানিয়ে দিতাম তাহলে হাজার হাজার গরিব মানুষের উপকার হত। এখন আর মানুষের কথায় ভুলব না। কথায় ভুলব না। অযথা এই মোটরকার। আমার সময় এতটা দামি নয় যে এক ঘন্টা আধ ঘন্টা সময় বাঁচানোর জন্য মাসে দুশো টাকার খরচ বাড়িয়ে নেব। উপোস করে থাকা প্রজাদের সামনে মোটর হাঁকানো ওদের বুকে বাঁশ দেওয়া ছাড়া আর কী? মানলাম যে, ওরা মুগ্ধ হয়ে যাবে, যেদিক দিয়ে যাব শত শত স্ত্রীলোক আর শিশু দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু শুধু এই দেখবার জন্য এতটা খরচ বাড়ানো মূর্খতা। যদি আর সব বড়োলোকেরা অমন করে

থাকেন তো করুন গে, আমি কেন ওদের মতো হতে যাব? এখন পর্যন্ত বছরে দুহাজার টাকায় আমার চলে যেত। এখন দু-এর জায়গায় চার হাজার যথেষ্ট। তাছাড়া অন্যের উপার্জন এভাবে ওড়ানোর অধিকারই বা আমার কোথায়? এই অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো কাজকারবার, কোনো ব্যবসাবাণিজ্য তো আমি করি না। আমার পূর্বপুরুষেরা যদি হঠকারিতা ও জবরদস্তি করে এই এলাকা নিজেদের অধিকারে রেখে থাকে, তাহলে ওদের লুণ্ঠনের ধনে অংশীদার হব কীসের অধিকারে? যারা মেহনত করে নিজেদের মেহনতের পুরো ফল তো তাদেরই পাওয়া উচিত। রাজ্য কেবল অন্যের অত্যাচার থেকে ওদের রক্ষা করে। এই সেবারই যোগ্য পারিশ্রমিক রাজ্যের পাওয়া উচিত। ব্যস, আমি তো শুধু রাজ্যের পক্ষ থেকে এই পারিশ্রমিক আদায় করার জন্য নিযুক্ত। এছাড়া এসব গরিব মানুষগুলোর উপার্জনে আমার আর কোনো অংশ নেই। এসব বেচারারা দীনদরিদ্র, মূর্খ, মূক। এখন আমরা এদের যত খুশি উৎপীড়ন করে নিচ্ছি। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে এদের কোনো জ্ঞান নেই। নিজেদের গুরুত্ব এরা বোঝে না, তবে এমন সময় আসবে যেদিন এদের মুখেও কথা ফুটবে। সেদিন আমাদের অবস্থা খারাপ হবে। এ সমস্ত ভোগবিলাস আমাকে আমারই লোকজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে থাকব, ওদেরই মতো জীবনযাপন করব এবং ওদেরই সহায়তা করব। তাতেই আমার কল্যাণ। ঋণের পরিমাণটা যদি অল্পসল্প হত, তাহলে বলতাম, যাক যে মাথার উপর এত ভার, সেগুলোর মতো এ ভারও সইব। আসল আছে, তা ছাড়া আছে আলাদা কয়েক হাজার টাকার সুদ। এছাড়া মহাজনদেরও তিন লাখ টাকা রয়েছে। রাজ্যের আয় বছরে দেড়-দুলাখ টাকার বেশি নয়। আমি এত সাহস করিই বা কোন জোরে? হ্যাঁ, যদি বৈরাগী হয়ে যাই, তাহলে সম্ভব। আমার জীবনকালে—যদি হঠাৎ মরে না যাই, তাহলে হয়তো এ ঝামেলা মিটে যাবে। এ আগুনে ঝাঁপ দেওয়া মানে নিজের সমস্ত জীবন, নিজের সাধআহ্লাদ আর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভস্মীভূত করা। আহা! আজকের এই দিন আসবে বলে আমি কতই না কষ্ট ভোগ করেছি। বাবা এই চিন্তাতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই শুভ মুহূর্তটি আমাদের কাছে ছিল আঁধার রাতে দূরের প্রদীপের মতো। আমরা এরই আশা নিয়ে বেঁচে ছিলাম। নিদ্রায় জাগরণে সবসময় এনিয়েই আলোচনা হত, এতে চিত্তের কত যে তৃপ্তি, কত যে গর্ব ছিল, কী বলব। তাই উপবাসে থাকার দিনগুলোতেও আমার মুখ মলিন হয়নি। এতখানি ধৈর্য ও সন্তোষের পর আজ যখন শুভদিন এসেছে, তখন কী করে তা থেকে মুখ ফেরাব! তাছাড়া এ তো শুধু নিজের চিন্তাই নয়, রাজ্যের উন্নতির জন্যে কত না স্কিম ভেবে রেখেছি, তবে কি নিজের ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ভাবনা-চিন্তাগুলোকেও বিসর্জন দেব? এই হতভাগা রানি আমাকে খুব ফ্যাসাদে ফেলেছে। যতদিন বেঁচে ছিল কখনও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। মরল, তাও আমার মাথায় এই আপদ ফেলে দিয়ে গেল। কিন্তু আমি দারিদ্র্যকে কেন এত ভয় করছি? দারিদ্র্য তো কোনো পাপ নয়। যদি আমার এই ত্যাগ হাজার হাজার পরিবারকে কষ্ট এবং দুরবস্থা থেকে অব্যাহতি দেয় তবে এই ত্যাগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আমার উচিত নয়। শুধুমাত্র সুখে জীবন কাটানোই আমাদের লক্ষ্য নয়। সুখভোগের দ্বারা মানপ্রতিষ্ঠা এবং কীর্তি হয় না। রাজপ্রাসাদে বসবাসকারী বিলাসী রানাপ্রতাপকে কে চেনে? তাঁর আত্মত্যাগ এবং কঠোর ব্রতপালনই তো তাঁকে আমাদের জাতির কাছে সূর্য করে তুলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যদি তাঁর জীবনটা সুখভোগে কাটাতেন, তাহলে আজ আমরা তাঁর নামটাও জানতে পেতাম না। তাঁর আত্মত্যাগই তাঁকে অমর করে তুলেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠা ধনসম্পদ এবং বিলাসের উপর নির্ভর করে না। আমি মোটরে চড়ে বেড়ালেই কী আর

টাট্টু চড়ে বেড়ালেই বা কী, হোটেলে থাকলেই বা কী আর কোনো একটা সাধারণ ঘরে থাকলেই বা কী। বড়োজোর তালুকদারেরা আমাকে ব্যঙ্গ করবে। তার কোনো পরোয়া করি না।

আমি তো মনে মনে চাইছি ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকব। যদি ওদের এই নিন্দাটুকুতে শত শত পরিবারের মঙ্গল হয় তাহলে আনন্দের সঙ্গে তা বহন না করলে আমি মানুষ নই। আমি নিজেকে যদি ঘোড়া, ফিটন, ভ্রমণ, শিকার, দাসদাসী আর স্বার্থপর বন্ধুবান্ধব থেকে বঞ্চিত করে সহস্র সহস্র ধনী ও গরিব পরিবারের, বিধবাদের, অনাথদের কল্যাণসাধন করতে পারি তাহলে আমার এতে কখনও বিলম্ব করা উচিত নয়। সহস্র সহস্র পরিবারের ভাগ্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। আমার সুখভোগ ওদের কাছে বিষের মতো এবং আমার আত্মসংযম ওদের কাছে অমৃতের মতো। তবে অমৃতই হই, বিষ কেন হতে যাব? আর তাছাড়া এটাকে আত্মত্যাগ বলে মনে করাও আমার ভুল। আমি আজ যে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি সে তো শুধু একটা দৈবযোগ মাত্র। এই ঐশ্বর্য আমি উপার্জন করিনি। এর জন্য আমি রক্ত ঝরাইনি, ঘাম ঝরাইনি। এই সম্পত্তি যদি আমি না পেতাম তাহলে হাজার হাজার দীনদরিদ্র ভাইদের মতো আমিও আজ জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকতাম। তার চেয়ে কেন ভুলে যাই না যে, আমি এই রাজ্যের মালিক। এমন অবস্থাতেই মানুষের পরীক্ষা হয়। আমি বছরের পর বছর পুস্তক অধ্যয়ন করেছি, বছরের পর বছর লোকহিত-আদর্শের ভক্ত হয়ে আছি, এখন যদি সেসব আদর্শকে ভুলে যাই, স্বার্থচিন্তাকে মানবতা এবং সদাচরণ থেকে বড়ো করে দেখি, তাহলে বস্তুত সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা হবে। স্বার্থসাধনের শিক্ষার জন্য গীতা, মিল, এমার্সন আর অ্যারিস্টটলের শিষ্য হওয়ার কী দরকার ছিল? এই শিক্ষা তো আমি আমার আর সব ভাইদের কাছ থেকে এমনিতেই পেয়ে যেতাম। প্রচলিত প্রথার চাইতে বড়ো গুরু আর কে আছে? সাধারণ মানুষের মতো আমিও কি স্বার্থের কাছে মাথা নত করব? তাহলে আমার বিশেষত্ব আর কী রইল? না, আমি বিবেক-বুদ্ধিকে হত্যা করব না। যেখানে পুণ্য করতে পারি সেখানে পাপ করব না। হে পরমাত্মন্, তুমি আমাকে সাহায্য করো, তুমি আমাকে রাজপুত কুলে জন্ম দিয়েছে। আমার কর্মে এই মহান জাতিকে লজ্জিত কোরো না। না, কখনও না। আমর এই মস্তক স্বার্থের কাছে নত হবে না। আমি রাম, ভীষ্ম এবং প্রতাপের বংশধর। আমি নিজের শরীরের দাস হব না।

কুমার জগদীশ সিংহের মনে হল উনি যেন কোনো এক উঁচু মিনারের উপর উঠেছেন। মনটা তাঁর গর্বে ভরে উঠেছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই এই উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। উঁচু মিনার থেকে নীচের চিকে চোখ পড়ে। সারা শরীর কেঁপে ওঠে। নদীর পাড়ে বসে তাতে ঝাঁপ দেবার কথা ভাবছে যে মানুষ তারই মতো মনের অবস্থা হয় তাঁর।

উনি ভাবেন, আমার পরিবারের লোকেরা কি আমার সঙ্গে একমত হবে? যদি আমার মুখ চেয়ে ওরা একমত হয়ও, তবু আমার সঙ্গে ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও বিসর্জন দেব, সে অধিকার আমার কোথায়? অন্যের কথা থাক, মা কখনও এতে রাজি হবেন না, আর সম্ভবত ভাইয়েরাও অসম্মত হবে। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বিচারে ওরা প্রত্যেকে কম করেও বার্ষিক দশ হাজার টাকার অংশীদার আর আমি ওদের অংশে কোনোমতেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আমি শুধু নিজের মালিক, কিন্তু আমিও তো একা নই। সাবিত্রী নিজে হয়তো আমার সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দিতে রাজি হয়ে যাবে, কিন্তু তার আদরের ছেলেকে এই আঁচের কাছে আসতে দেবে না।

কুমারসাহেব আর ভাবতে পারেন না। উনি অস্থিরভাবে পালঙ্ক থেকে উঠে বসে কামরায় পায়চারি করতে থাকেন। পরে জানালার বাইরে উঁকি দেন, তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চারদিকে অন্ধকার। ওঁর চিন্তার মতো অপার এবং ভয়ংকর গোমতী নদী সামনে বয়ে চলেছে। উনি ধীরে ধীরে নদীর তীরে চলে যান এবং অনেকক্ষণ ধরে ওখানে বেড়াতে থাকেন। উদ্‌বেল হৃদয় জলতরঙ্গ ভালোবাসে। বোধ হয় এজন্য যে তরঙ্গও উদ্‌বেল হতে চায়। কুমারসাহেব তাঁর বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করেন। যদি রাজ্যের আয় থেকে এসব মাসোহারা দেওয়া হয় তাহলে ঋণের সুদই পরিশোধ করা কঠিন হবে, আসল তো দূরের কথা। আয় কি বাড়ানো যেতে পারে না? এখন আস্তাবলে বিশটা ঘোড়া আছে, আমার জন্য একটাই যথেষ্ট। চাকরের সংখ্যা একশোর কম হবে না। আমার পক্ষে দুটোই বেশি। এরা তো আমারই ভাই, এদের হীন কাজ করানো খুবই অনুচিত। ওই মানুষগুলোকে আমি আমার অংশের জমি দিয়ে দেব। সুখে চাষবাস করবে আর আমাকে আশীর্বাদ করবে। বাগানগুলোর ফল এতদিন ডালিতেই ভেট হয়ে যেত, এখন ওগুলোকে বেচব আর সবচেয়ে বড়ো আয় তো হাটের তোলা থেকে। শুধু এক মহেশগঞ্জের বাজার থেকেই দশ হাজার টাকা আসে। এইসব আয় মোহান্তজি হজম করে ফেলেন। ওঁর জন্য বছরে এক হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এবারে এই বাজারের ঠিকা দেব, আট হাজারের কম পাব না। এসব খাত থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয় হবে। সাবিত্রী আর খোকার জন্যে এক হাজার টাকা যথেষ্ট। আমি সাবিত্রীকে স্পষ্ট বলে দেব, হয় এক হাজার মাসিক নাও আর আমার সঙ্গে থাকো আর না হয় রাজ্যের অর্ধেক আয় নাও আর আমাকে ছেড়ে দাও। রানি হওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে, তো আনন্দের সঙ্গে হও, কিন্তু আমি রাজা হব না।

হঠাৎ কুমারসাহেবের কানে আওয়াজ আসে—রাম নাম সত্য। উনি পেছনে ফিরে তাকান। কয়েকজন মানুষ একটি মড়া নিয়ে আসছে। ওরা নদীর ধারে চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন দেয়। দুটি স্ত্রীলোক চিৎকার করে করে কাঁদে। কুমারসাহেবের হৃদয়ে এই বিলাপের কোনো প্রভাব পড়ে না। উনি মনে মনে লজ্জা পান যে কী পাষাণ হৃদয়! এক গরিব বেচারার মৃতদেহ জ্বলছে, মেয়েরা কাঁদছে আর আমার মনটা একটুও গলছে না! পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি। একবার একটি স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে বলে—হায় আমার রাজা, তোমার কাছে বিষ কী করে মিষ্টি হল গো? এই মর্মান্তিক বিলাপ শুনেই কুমারসহেবের বুকে যেন আঘাত লাগে। করুণা জেগে ওঠে, চোখ জলে ভরে যায়। এই লোকটি বোধ হয় বিষ খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। আহা! ওর কাছে বিষ কী করে মিষ্টি লাগল! এ কথাগুলোয় কত করুণা, কত দুঃখ, কত বিস্ময়! বিষ তো তেতো। কী করে তা মিষ্টি হয়ে গেল। তিক্ত বিষের বদলে যে তার মধুর প্রাণ দিয়ে দিল, তার জীবনে কোনো কঠিন দুর্ভোগ এসেছিল হয়তো। তেমন অবস্থাতেই বিষ মধুর লাগতে পারে। কুমারসাহেব ছটফট করে ওঠেন। কান্নামাখা করুণ কথাগুলো বারে বারে ওঁর প্রাণে গুনগুন করতে থাকে। উনি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। ওই লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যান, একজনকে জিজ্ঞেস করেন—ও কি অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিল? লোকটি কুমারসাহেবের দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে বলে—না মশায়, কোথায় অসুখ! আজও সন্ধ্যায় ভালোভাবে কথা বলেছে। জানি না সন্ধ্যাবেলায় কী খেয়ে নিয়েছে তারপরই রক্ত বমি হতে শুরু হয়েছে। কবিরাজের কাছে নিয়ে যেতে না যেতেই চোখ উলটে গেছে, নাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। কবিরাজ দেখে বললেন—এখন আর কী করব? এই তো মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়স। এমন তাগড়া জোয়ান সারা লখনউ-এ ছিল না।

কুমার—কিছু জানতে পারলেন, কেন বিষ খেল?

মানুষটি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলে—মশায়, আর তো কোনো কারণ ঘটেনি। যেদিন থেকে ওই বড়ো ব্যাঙ্কটা লালবাতি জ্বেলেছে সেদিন থেকে মনমরা হয়ে গিয়েছিল। কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিল। ঘি-দই-মালাইয়ের বড়ো দোকান ছিল। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মান-ইজ্জত ছিল। ওই সমস্ত পুঁজিটাই জলে গেল। আমরা কত করে বলেছিলাম ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না; কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? কারোর কথা শোনেনি। আজ সকালে বউয়ের কাছে গয়না চেয়েছিল ওগুলো বাঁধা রেখে গোয়ালাদের দুধের দাম দেবে। এ নিয়ে বউয়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া হয়ে গেল। ব্যস, কী জানি কী খেয়ে বসেছে।

কুমারসাহেবের বুকটা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ মনে জাগে—শিবদাস নয় তো? জিজ্ঞেস করেন—এর নাম শিবদাস নয় তো? লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ, এই নামই তো, আপনার জানাশোনা ছিল?

কুমার—হ্যাঁ, আমি আর উনি অনেকদিন বরহলে একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি। আজই সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে আমার ব্যাঙ্কে দেখা হয়েছে। উনি যদি আমাকে এটুকুও বলতেন, তাহলে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। উঃ!

লোকটি এবারে ভালো করে কুমারসাহেবকে লক্ষ করে, তারপর গিয়ে মেয়েদের বলে—চুপ করো, বরহলের মহারাজা এসেছেন। এ কথা শুনেই শিবদাসের মা জোরে জোরে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে কাঁদতে এসে কুমারসাহেবের পায়ে আছড়ে পড়ে। ওর মুখ থেকে শুধু এই কথাগুলো বেরোয়—'বাবা, ছেলেবেলা থেকে যাকে তুমি দাদা বলতে'—বলে গলা আটকে আসে।

কুমারসাহেবের চোখেও জল। শিবদাসের মূর্তি যেন তাঁর চোখের সামনে এসে বল্‌ছে, তুমি বন্ধু হয়ে আমার প্রাণটা নিলে।

সাত

ভোর হয়ে যায়; কিন্তু কুমারসাহেবের চোখে ঘুম আসে না। যখন থেকে উনি গোমতীর তীর থেকে ফিরে এসেছেন, তখন থেকে ওঁর মনে একটা বৈরাগ্যভাব ছেয়ে এসেছে। ওই করুণ দৃশ্য তাঁর স্বার্থের যুক্তিতর্কগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সাবিত্রীর বিরোধিতা, খোকার হতাশা জেদ আর মায়ের তিরস্কারকে তাঁর আর লেশমাত্রও ভয় নেই। সাবিত্রী রাগ করবে, করুক গে; খোকাকে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কোনো চিন্তা নেই। মা প্রাণ দিতে চাইবেন, কী ক্ষতি। আমি আমর স্ত্রী-পুত্র আর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের জন্য সহস্র সহস্র পরিবারকে হত্যা করব না। হায়! শিবদাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি এমন কত রাজ্য বিলিয়ে দিতে পারি। সাবিত্রীকে না খেয়ে থাকতে হবে, খোকাকে খেটে খেতে হবে, আমাকে দোরে দোরে হাত পাততে হবে, তবুও অন্যকে বঞ্চিত করব না। এখন আর দেরি নয়। কী জানি এই ব্যাঙ্ক-ফেলের ঘটনা আর কী কী বিপদ ঘটায়। আমি এত ইতস্তত করছি কেন? এ শুধু আমার দুর্বলতা, নইলে কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়, এমন কাজ নয় যা কেউ করেনি। আজ পর্যন্ত লোকে লাখ টাকা দানধ্যান করেছে। আমার কর্তব্যজ্ঞান আছে। সে কর্তব্য করতে কেন বিমুখ হব? যা কিছু হোক, যা কিছু মাথার উপর আসুক, তার চিন্তা কীসের? কুমার ঘন্টি বাজান। পরক্ষণে আরদালি চোখ কচলাতে কচলাতে আসে।

কুমারসাহেব বলেন—এখনই ব্যারিস্টার জ্যাকবসাহেবকে গিয়ে আমার সেলাম দাও। বোধ হয় ঘুম থেকে উঠেছেন। বলবে, জরুরি কাজ। না, এই চিঠিখানাই নিয়ে যাও। মোটর নিয়ে চলে যাও।

আট

মিস্টার জ্যাকব কুমারসাহেবকে অনেক বোঝান। আপনি এই প্যাঁকে জড়াবেন না, তাহলে বেরিয়ে আসা মুশকিল হবে। জানি না এখনও কত এমন ঋণ রয়েছে, যার কথা হয়তো আপনি জানেনই না। কিন্তু মনে দৃঢ় হয়ে ওঠা সংকল্প হল চুনাপাথরের মেঝের মতো, আপত্তির আঘাত যাকে আরও মজবুত করে তোলে। কুমারসাহেব তাঁর সংকল্পে অটল থাকেন। পরদিন খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেন যে মৃতা মহারানির যত ঋণ আছে, সেগুলো আমরা স্বীকার করছি এবং নির্দিষ্ট সময়ে সব পরিশোধ করে দেব।

এই বিজ্ঞাপন ছাপামাত্রই লখনউ শহরে হইহই পড়ে যায়। বুদ্ধিমানদের মতে এটা কুমারসাহেবের নিতান্ত ভুল কাজ, আর যারা আইনকানুনে অনভিজ্ঞ, তারা ভাবে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। কুমারসাহেবের প্রশংসা হোক না হোক, আশীর্বাদের অভাব হয় না। ব্যাঙ্কের হাজার হাজার গরিব পাওনাদার মন খুলে তাঁকে আশীর্বাদ করছে।

এক সপ্তাহ কুমারসাহেব মাথা তোলার ফুরসত পান না। মিস্টার জ্যাকবের ধারণা ঠিক প্রমাণিত হয়। দেনা প্রতিদিন বাড়তে থাকে। কত কত এমন ঋণপত্র (প্রমিসরি নোট) পাওয়া যায় যার কথা উনি জানতেন না। জহুরি এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো দোকানদারের পাওনাও কম ছিল না। প্রায় তেরো-চোদ্দ লাখ টাকা। সর্বমোট বিশ লাখ অবধি ওঠে। কুমারসাহেব ভয় পেয়ে যান। আশঙ্কা হয়—এমন না হয় যে, ওঁকে ভাইদের মাসোহারাও বন্ধ করে দিতে হবে, যার কোনো অধিকার ওঁর নেই। শেষ পর্যন্ত সপ্তম দিনে উনি কয়েকজন মহাজনকে বকে-ঝকে তাড়িয়ে দেন। যেখানে সুদের হার বেশি ছিল সেখানে তাকে কম করান আর যেখানে ঋণের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেগুলোকে দিতে অস্বীকার করেন।

মহাজনদের কঠোরতা দেখে তাঁর রাগ হয়। তাঁর মতে মহাজনদের উচিত ডুবে-যাওয়া অর্থের একটি অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকা। এত টানাটানি করেও মোট দেনা উনিশ লাখের কম দাঁড়ায় না।

কুমারসাহেব এসব কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে একদিন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দিকে যান। ব্যাঙ্ক খোলা। মৃত শরীরে প্রাণ ফিরে এসেছে। পাওনাদারদের ভিড় লেগে আছে। লোকেরা প্রসন্নচিত্তে ফিরে যাচ্ছে। কুমারসাহেবকে দেখামাত্রই শয়ে শয়ে মানুষ ভক্তি ভরে ওঁর দিকে ছুটে আসে। কেউ কেঁদে, কেউ পায়ে পড়ে আর কেউ সৌজন্য সহকারে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানায়। উনি ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। সবাই বলে—এই বিজ্ঞাপন ব্যাঙ্ককে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। বাঙালিবাবু লালা সাঁইদাসের সমালোচনা করেন—লোকটা মনে করত সংসারে সব মানুষই ভালোমানুষ। আমাদের উপদেশ দিত। এখন ওর চোখ খুলেছে। একা একা ঘরে বসে থাকে। কাউকে মুখ দেখায় না। আমি শুনেছি ও নাকি এখান থেকে পালাতে চাইছে। কিন্তু বড়োসাহেব বলেছেন—পালাবে তো তোমার উপর ওয়ারেন্ট জারি করে দেব। এখন সাঁইদাসের জায়গায় বাঙালিবাবু ম্যানেজার হয়ে বসেছেন।

এরপর কুমারসাহেব বরহল ফিরে আসেন। ভাইয়েরা সব বৃত্তান্ত শুনে রেগে যায়, মামলা করবে বলে শাসায়। মা মনে এত আঘাত পান যে, উনি সেদিনই অসুস্থ হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই

এই সংসার থেকে বিদায় নেন। সাবিত্রীও আঘাত পায়; তবে সে শুধু সন্তুষ্টই হয়নি, স্বামীর উদারতা এবং ত্যাগের প্রশংসাও করেছে। বাকি থাকে লালসাহেব। সে যখন দেখে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বেরিয়ে যাচ্ছে, হাতিগুলোকে মকনপুরের মেলায় বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর পালকি-বেহারাদের বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে, তখন ব্যাকুল হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে—বাবুজি, এসব চাকর, ঘোড়া, হাতি কোথায় যাচ্ছে?

কুমার—এক রাজাসাহেবের উৎসবে।

লালজি—কোন রাজা?

কুমার—ওঁর নাম রাজা দীনসিংহ।

লালজি—কোথায় থাকেন উনি?

কুমার—দরিদ্রপুরে।

লালজি—তাহলে আমরাও যাব।

কুমার—তোমাকেও নিয়ে যাব; তবে এই বরযাত্রী যাওয়ার সময় পায়েচলা লোকেদের সম্মান গাড়িচড়া লোকেদের চেয়ে বেশি হবে।

লালজি—তাহলে আমরাও পায়ে হেঁটে যাব।

কুমার—ওখানে খেটেখাওয়া মানুষদের প্রশংসা হয়ে থাকে।

লালজি—তাহলে আমরা সবচেয়ে বেশি খাটব।

কুমারসাহেবের দুভাই পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকার মাসিক বৃত্তি নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। কুমারসাহেব তাঁর আর তাঁর পরিবারের জন্যে অনেক কষ্টে বার্ষিক এক হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু এই আয় একজন রাজার পক্ষে কোনো মতেই পর্যাপ্ত নয়। অতিথি-অভ্যাগত প্রতিদিন লেগেই থাকে। সকলেরই সৎকার করতে হয়। খুব কষ্টে দিন চলে। এদিকে এক বছর হল, শিবদাসের পরিবারের ভারও এসে কাঁধে চেপেছে। তবে কুমারসাহেব কখনও আপন সংকল্পের জন্য অনুতাপ করেন না। ওঁকে কেউ কোনো দিন চিন্তিত হতে দেখেনি। ওঁর মুখমণ্ডল ধৈর্য ও যথার্থ গরিমায় সবসময় উজ্জ্বল। সাহিত্যপ্রেম আগে থেকেই ছিল। এখন বাগান করায় উৎসাহ জাগে। নিজের বাগানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছগাছড়ার দেখাশোনা করতে থাকেন। লালসাহেবকে তো রীতিমতো চাষি বলেই মনে হয়। বয়স এখনও নয়-দশ বছরের বেশি হয়নি, কিন্তু খুব ভোরেই চাষের জমিতে চলে যায়। খাওয়াদাওয়ারও খেয়াল থাকে না।

লালসাহেবের ঘোড়া রয়েছে, কিন্তু মাসের পর মাস তাতে চড়ে না। ওর এমন খেয়াল দেখে কুমারসাহেব খুশি হয়ে বলেন—রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। লালসাহেব কোনোদিন এই শিক্ষা ভুলবে না। ঘরে যদি ঐশ্বর্য থাকত, তাহলে সুখভোগ, শিকার, দুষ্কর্ম ছাড়া আর কীই বা মাথায় আসত। সম্পত্তি বেচে আমরা পরিশ্রম আর সন্তোষ কিনেছি, আর এই সওদা খারাপ হয়নি। সাবিত্রী এত সুখী নয়। সে কুমারসাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও প্রজাদের কাছ থেকে ছোটোখাটো ভেট নিয়ে থাকে এবং কুলপ্রথাকে ভাঙতে চায় না।

(বৈংক কা দিবালা)

অনুবাদ ননী শূর

দপ্তরি

রফাকত হুসেন আমার আপিসের বাঁধাই-দপ্তরি ছিল। মাসান্তে বেতন পেত দশ টাকা। ছুটছাট কাজ করে বাইরেও দু-তিন টাকা কামাত। তার জীবিকা ছিল এই। কিন্তু ও নিজের অবস্থাতে বেশ সন্তুষ্টই ছিল বলা যায়। তার মনের ভেতরের অবস্থা ঠিক বলতে পারব না, তবে বাইরে ও সদা-প্রসন্ন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ ফিটফাট থাকত। ঋণ হল এই শ্রেণীর লোকেদের অলংকার। রফাকত কিন্তু এর মায়ায় কখনও বিভ্রান্ত হত না। ওর কথাবার্তায় কৃত্রিম ভদ্রতার ভড়ং ছিল না, যা বলত সে সোজাসুজি বলত, রেখেঢেকে বলত না। আপিসের বাবুদের কারও কোনো অন্যায় দেখলেও সে বলতে ছাড়ত না। এই স্পষ্টবাদিতার জন্যে সবাই ওকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি সমীহ করে চলত। জন্তুজানোয়ারের প্রতি ওর একটা বিশেষ টান ছিল। বাড়িতে একটা মাদি ঘোড়া, একটা গাই, ক-টা ছাগল, একটা বেড়াল, একটা কুকুর আর গোটাকয়েক মুরগি পুষেছিল। ও এগুলোকেও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ছাগলের জন্যে পাতা পেড়ে আনত, ঘোড়াটার জন্যে কেটে আনত ঘাস। এর জন্য প্রায়ই ওকে খোঁয়াড় দর্শনার্থে ছুটতে হত। লোকে মশকরাও করত ওর এহেন পশুপ্রীতি দেখে, ও কিন্তু কারও কথায় কান দিত না। ওর এই ভালোবাসা ছিল একেবারেই নিঃস্বার্থ। কেউ ওকে কখনও মুরগির একটা ডিমও বেচতে দেখেনি। ওর পোষা ছাগলের বাচ্চাদের কোনোদিন কসাইয়ের ছুরির তলায় পড়তে হয়নি, ওর ঘোড়াটাও লাগামের চেহারাই দেখেনি কোনোদিন। ওর গোরুর দুধ খেত কুকুরটা, বেড়ালের জন্য বরাদ্দ ছিল ছাগলের দুধ। তারপরেও যা বাঁচত, সেটা ও নিজে খেত।

ভাগ্যক্রমে ওর স্ত্রীটিও ছিল একেবারে পতিগতপ্রাণা। ওর ঘরটা যদিও ছিল খুবই ছোটো, কেউ কোনোদিন দরজা থেকে একবারের জন্যেও তার গলার আওয়াজ পায়নি। একটি বারের জন্যেও কেউ ওকে দরজায় উঁকি দিতে দেখেনি কখনও। গয়না-কাপড়ের তাগাদা দিয়ে সে কখনও তার স্বামীর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়নি। দপ্তরিও তাকে মাথায় করে রেখেছিল। সে গাইয়ের গোবর কুড়োত, ঘোড়াকে ঘাস দিত, পাশে বসিয়ে বিড়ালকে খাওয়াত, এমনকী কুকুরটাকে স্নান করিয়ে দিতেও তার কোনো ঘেন্না ছিল না।

বর্ষাকাল, নদীতে ঢল নেমেছে। দপ্তরের কর্মীরা সবাই মেতে উঠেছে মৎস্য শিকারের হুজুগে। ঝোঁকের মাথায় রফাকতও জুটে গেল তাদের সঙ্গে। দিনভর মাছ ধরল সবাই। সন্ধ্যায় নামল মুষলধারে বৃষ্টি। বাবুরা সবাই রাতটুকুর জন্য আশ্রয় নিল একটা গ্রামে, আর দপ্তরি চলল তার বাড়ির পথে। কিন্তু অন্ধকার রাত,পথ ভুলে ঘুরে মরল সারাটা রাত। ভোরবেলা যখন ঘরে

পৌঁছাল তখনও ভালো করে আঁধার কাটেনি। কিন্তু একী! ওর ঘরের কপাটদুটো হাট করে খোলা। কুকুরটা লেজগুটিয়ে করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। দুয়ার খোলা দেখে বুকটা ধক করে উঠল দপ্তরির। ঘরে পা দিল, সেখানেও সম্পূর্ণ নীরবতা। স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকল বার দুয়েক, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। শূন্য ঘর খাঁখাঁ করছে। এঘর ওঘর দুটো ঘরেই উঁকি দিল একবার। কিন্তু সেখানেও না পেয়ে গেল পশুশালার দিকে। ঢুকতে কেমন যেন অজানা একটা ভয় জাগল তার, অচেনা অন্ধকার গুহায় ঢুকতে যে ভয় হয়। ওখানে মাটির ওপারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ওর বউ। মুখে মাছি ভনভন করছে, ঠোঁট বিবর্ণ, চোখদুটো নিশ্চল পাথর। লক্ষণ দেখে মনে হয় সাপে কেটেছে।

পরদিন রফাকত যখন এল ওকে আর চেনাই যায় না। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের রোগী। আত্মহারা, নির্বাক বসে রইল সারাটা দিন, যেন সে অন্য কোনো জগতে বিচরণ করছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে উঠে পড়ল, সোজা গিয়ে বসল তার স্ত্রীর কবরের পাশে। অন্ধকার ঘন হল। ক্রমে গড়িয়ে গেল কয়েক প্রহর রাত; তবু টিমটিমে প্রদীপের আলোয় সে বসেই রইল কবরের পাশে, মূর্তিমান বিষাদ আর নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে। যেন সে নিজেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। কখন ঘরে ফিরল তা তার খেয়ালই নেই। অতঃপর এটাই ওর নিত্যকার নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। ভোরবেলা উঠে মাজারে যায়, ঝাঁট দেয়, ফুলের মালা দিয়ে সাজায় কবরটাকে, ধূপ জ্বালায়, তারপর কোরান থেকে পাঠ করে যায় বেলা ন-টা পর্যন্ত আবার সন্ধ্যাবেলাতেও একই রকম। এটাই এখন তার জীবনের নিয়মিত কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে নিজের অন্তর্জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। বাহ্যজগত থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শোক একেবারে মুহ্যমান করে ফেলেছে বেচারিকে।

মাস কয়েক এইভাবেই কাটল। কর্মচারীরা সকলেই দপ্তরির শোকে সমবেদনা অনুভব করত। ওর করণীয় কাজগুলো করে নিত নিজেরাই, ওকে আর কষ্ট দিতে চাইত না। ওর এই পত্নীপ্রেমে লোকে রীতিমতো বিস্ময় বোধ করত।

কিন্তু মানুষ তো আর সর্বদা অন্তর্লোকে বাস করতে পারে না। সেখানকার জল হাওয়া তার তেমন অনুকূল নয়। এই সমস্ত রূপরসময় ভাবনা-চিন্তাগুলো সেখানে কোথায়? বৈরাগ্যের মধ্যে সেই ভাবোল্লাস কোথায়? আশাময় আনন্দই বা কোথায়? দপ্তরি বেচারি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলেও তারপর তাকে উনুন জ্বালাতেই হত, সকালে সন্ধ্যায় পোষা প্রাণীগুলোর দেখাশোনাও করতে হত। এই দায় ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল তার পক্ষে। ফলে আবেগের ওপর বাস্তবই জয়লাভ করল। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো দপ্তরিও আবার দাম্পত্য-সুখের জলধারার দিকে ছুটল। আবার জীবনের সুখদায়ক অভিনয় দেখতে উৎসুক হল সে। মৃত পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্য-সুখের স্মৃতি বিলীন হতে লাগল। ছ-টা মাস পরে তার আর চিহ্নমাত্রও রইল না।

মহল্লার অন্য প্রান্তে থাকত বড়োসাহেবের এক আরদালি। ওর বাড়ি থেকেই বিয়ের প্রস্তাব উঠল। মিয়া রফাকতের আনন্দের আর সীমা নেই। আরদালি সাহেবের ইজ্জত-খাতির মহল্লায় কোনো উকিলবাবুর চাইতে কম নয়। ওর রোজগার নিয়েও অনেক জল্পনাকল্পনা হয়ে থাকে। লোকেরা মুখের কথায় বলে, 'পড়ে-পাওয়া চোদ্দো আনাই লাভ'। ও নিজেই বলত যে, উশুলের দিনে আমার পকেটে কুলোয় না, সঙ্গে থলি রাখতে হয় একটা। দপ্তরির মনে হল এবার তার

কপাল খুলছে। এমন উদগ্রীব হয়ে উঠল, যেন শিশু খেলনা দেখেছে। হপ্তা খানেকের মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম চুকিয়ে ফেলল, নববধূ এল ঘরে। যে মানুষটা মাত্র একটা সপ্তাহ আগেও সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিল, জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে বসে থাকত, তাকেই এখন মাথায় টোপর পরে ঘোড়ায় চড়ে নতুন ফোটা ফুলের চেহারায় দেখা—মানবপ্রকৃতির এক প্রভূত বিস্ময়।

কিন্তু অষ্টমঙ্গাল পেরোতে না পেরোতেই শুরু হয়ে গেল নববধূর স্বরূপ উন্মোচন। বিধাতাপুরুষ ওকে রূপ থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন, অবশ্য সেই ঘাটতি তিনি পুষিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাগিন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণতর করে। তাব প্রমাণ ওর অসাধারণ বাকপটুতা যা অহরহ পড়শিদের আমোদিত করতে এবং দপ্তরির মুখে কালি মাখিয়ে দিতে লাগল। প্রথম দিন আস্টেক সে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দপ্তরির চরিত্র অনুধাবন করল, তারপর একদিন বলল—আজব লোক তো তুমি! লোকে জন্তুজানোয়ার পোষে নিজের সাশ্রয়ের জন্যে, সুবিধার জন্যে নাকি ঘরের জঞ্জাল বাড়াবার জন্যে? গোবুর দুধ কুকুর খাবে, ছাগলের দুধ বিড়ালে খাবে, এ আবার কী আদিখ্যেতা? আজ থেকে সমস্ত দুধ যেন ঘরে আসে।

দপ্তরি নিরুত্তর রইল। আর একদিন ঘোড়ার দানা গেল বন্ধ হয়ে। সে ছোলাগুলো খোলায় ভেজে নুন-লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। টাটকা দুধ দিয়ে জলখাবার তৈরি হতে লাগল সকালে। যখন তখন ক্ষীরের মিষ্টি তৈরি হতে লাগল। বড়োলোকের বাড়ির মেয়ে, পান ছাড়া চলে কী করে? ঘি-মশলার খরচও বেড়ে গেল অনেক। প্রথম মাসেই দপ্তরির উপলব্ধি হল যে তার উপার্জন জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ওর অবস্থা হল ঠিক সেই লোকেব মতো, যে চিনি বলে ভুল করে কুইনাইন খেয়ে ফেলেছে।

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিল এই দপ্তরি। মাস দুই-তিন সে এই যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করল। কিন্তু ওর চেহারাটাই কথার চাইতে ওর অবস্থা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সেই দপ্তরি, নিত্য অভাবেও যে ছিল হাসিমুখ, সে নিজেই এখন মূর্তিমান দুশ্চিন্তা। অপরিষ্কার কাপড়, অবিন্যস্ত চুল, চেহারায় একটা মালিন্য, সব সময় হায়-হায় ভাব। ওর পোষা গোবুগুলোর চেহারা এখন হাড্ডিসার, ঘোড়াটা নড়তে অক্ষম, বেড়ালটা প্রতিবেশীদের সিকেয় লাফ দিতে আরম্ভ করেছে। আর কুকুরটা কেবল আস্তাকুঁড়ে হাড় খুঁজে ফিরছে। তবু সেই অসাধারণ মনোবলের অধিকারী মানুষটি তার পুরোনো বন্ধুদের বিদেয় করেনি। ওর সবচেয়ে বড়ো বিপত্তি ওর স্ত্রীর রসনা, যার আক্রমণে মাঝে মাঝেই ওর ধৈর্য, ওর কর্তব্যনিষ্ঠা, ওর উদ্দীপনা সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে যায়। বেচারি কেবল নিজের ঘরের এককোণে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মনের সন্তুষ্টির আনন্দকে খুইয়ে রফাকতের পীড়িত মন ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। আত্মতৃপ্তি, মনের অসন্তোষের যা উপহার, তা ওর চিত্ত থেকে নির্বাসিত হল। সে মাঝে মাঝে উপবাসের পথ ধরল। আজকাল আর জলপাত্রে জল রাখার জন্যে ওর আগ্রহ থাকে না, কুয়ো থেকে তুলেই তৎক্ষণাৎ তা খেয়ে ফেলতে চায়, পাছে মাটিতে গড়িয়ে যায় সেটুকু। বেতন পেয়ে আজকাল আর ও মাসকাবারি সওদা কেনে না, ঠান্ডা জল আর শুকনো রুটিতে আজকাল আর ওর তৃপ্তি হয় না,—বাজার থেকে বিস্কুট কিনে আনে, ঠোঙায় করে রাবড়ি খায়, সুপক্ক আম দেখে উতলা হয়। দশটা টাকার মূল্যই বা কতটুকু? এক সপ্তাহেই উড়ে যায়, তখন বই বাঁধাইয়ের অগ্রিম টাকায় হাত পড়ে। দু-একদিন উপবাসও দিতে হয়। শেষে ঋণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মাসের বেতনের টাকা সবটাই

পাওনাদারদের হাতে তুলে দিতে হয়। আর মাস পয়লা থেকেই আবার ধার করতে হয়। এতদিন ও অন্যদের উপদেশ দিত মিতব্যয়িতার, এখন লোকেই ওকে বোঝায়, ও কিন্তু নির্বিকারভাবে বলে—সায়েব, আজ জুটছে, খাচ্ছি। কালকের মালিক তো খোদা। দিলে খাব, না দিলে চুপচাপ পড়ে থাকব। ওর অবস্থা এখন সেই রোগীর মতো, যে আরোগ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পথ্যাপথ্যের বিচার ত্যাগ করেছে, চিরবিদায়ের আগে সবরকম চর্ব্যচূষ্য খেয়ে আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে চাইছে।

তবু এতদিন ও ঘোড়া আর গাইটাকে বিক্রি করেনি। কিন্তু একদিন ওরা পশুব্যবসায়ীর খোঁয়াড়ে বাঁধা পড়ল, ছাগলগুলোও ছটফট করতে লাগল তৃষ্ণারূপী ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে। কথায় বলে—'নাকে ঢুকল জাফরানি পোলাওর বাস, তো ঋণের দায়ে বুটিওলার ঘটল সর্বনাশ'। মহাজন যেদিন বুঝল যে, নগদ টাকা আর উশুল করা যাবে না, সেদিন সে সবকটা ছাগলকে খেদিয়ে নিয়ে চলে গেল। দপ্তরি শুধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বেড়ালের প্রভুভক্তি উঠে গেল। যা ছিল ওর বন্ধনের শেষ সূত্র, সেই গেরুবাছুরগুলো যাওয়ার পর আর দুধের পাত্তরটা চাটার আশাও রইল না। কুকুরটা অবশ্য পুরোনো স্নেহমমতার কৃতজ্ঞতায় এখনও আত্মীয়তা ছিন্ন করেনি। কিন্তু তারও সেই সজীবতা আর নেই। যার জন্যে বাড়ির পাশ দিয়ে কোনো অপরিচিত মানুষ বা কুকুর নির্বিঘ্নে পেরোতে পারত না, এখন তার সাড়াশব্দ বেশ কমে গেছে। এখন সে ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু শুয়ে শুয়ে আর মুখটাকে পেটের ভেতর লুকিয়ে। যেন সে তার আজকের এই দুর্দশায় কাঁদছে। হয় এখন আর তার ওঠার শক্তিটুকুও নেই, নয়তো এতদিনকার সমস্ত সহানুভূতির জন্যে এটুকু করাই পর্যাপ্ত মনে করছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দরজার পাশে বসে একটা চিঠি পড়ছিলাম, এমন সময় দেখি দপ্তরি আসছে। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, বোধহয় সমনবাহী পেয়াদাকে দেখে কিসানও কখনও এতটা সন্ত্রস্ত হয় না, টিকা দিতে আসা সরকারি লোককে দেখে শিশুরাও এত ঘাবড়ে যায় না। ভাবলাম চটে করে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে খিল দিয়ে দিই দরজায়, কিন্তু তার আগেই দপ্তরি পৌঁছে গেল একেবারে সামনে। এখন আব কী করে পালাই? অগত্যা চেয়ারে বসে পড়লাম। কিন্তু ভুরু-কপাল কুঁচকে রইল। দপ্তরি যে কেন আসছে তা বুঝতে একটুও বাকি ছিল না আমার। ধার চাইতে আসা লোকের মনের কুণ্ঠা তার মুখেচোখে আচারব্যবহারে উজ্জ্বল রঙে ফুটে ওঠে। এক ধরনের নম্রতা, সংকোচ আর বশংবদভাব সেখানে বিরাজ করে, যা একবার দেখলে আর কখনও ভোলা যায় না।

দপ্তরি এসেই কোনোরকম ভনিতা না করেই তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল, যা আমি আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

আমি রূঢ়ভাবে উত্তর দিলাম, আমার কাছে এক পয়সাও নেই।

একটা সেলাম ঠুকে দপ্তরি তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে উদ্যত হল। ওর চেহারায় এত বেশি দীনতা আর অসহায়তা ফুটে উঠেছিল যে, আমার করুণা হল। ওর এই ভূমিকাহীন নীরব প্রস্থান যে কতটা ব্যঞ্জনাময় তা কী বলব। তাতে লজ্জা ছিল, সন্তোষ ছিল, আবার আপশোশও ছিল। ওর মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোল না, কিন্তু ওর চেহারা যেন বলছিল, আমি জানতাম, আপনি এমনই উত্তর দেবেন। এব্যাপারে আমার একরত্তি সন্দেহ ছিল না। তবু একথা জেনেও কেন যে এলাম তা আমি

নিজেও ঠিক বুঝি না। হয়তো আপনারই দয়া, আপনার স্নেহ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। এখন চলে যাচ্ছি, কারণ আমার দুঃখের কথা আপনাকে শোনাবার মতো মুখ আমার নেই।

আমি দপ্তরিকে ডেকে বললাম, আচ্ছা শোনো। তোমার দরকারটা কী বলোতো শুনি।

দপ্তরি বুঝি একটু আশান্বিত হল। বলল, কীই বা বলি আপনাকে। গত দুদিন ধরে অনাহারে আছি এরকম।

খুব আস্তে আস্তে যত্নসহকারে আমি ওকে বোঝালাম, এইভাবে ধার করে করে কি চিরদিন চালানো যায়? তুমি বিচক্ষণ লোক, বোঝোই তো, আজকাল সবাই নিজের মাথার ঘায়েই পাগল। কারও কাছে ফালতু টাকা থাকেই না। আর থাকলেও সে ঋণ দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোহাতে যাবে কেন? তুমি অবস্থাটা একটু পালটাবার চেষ্টা করো!

ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিল দপ্তরি, কী আর বলি বলুন, সবই সময়ের ফের। এক মাসের জন্যে যা কিছু আনি, তা একদিনেই উড়ে যায়। আমার গৃহিণীর নোলার জ্বালায় একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি। একটা দিন দুধ না জুটলে কুরুক্ষেত্র করে, মিষ্টি না কিনে ঘরে ঢোকাই মুশকিল। একদিন মাংস না হলে পারলে আমার মাংসই খায়। ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, সামান্য খাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রোজ ঝগড়া-কোঁদল, এ বেইজ্জতি তো বরদাস্ত করা যায় না। যা করতে বলে চোখ বুজে তাই করি। এখন খোদার কাছে এটুকুই প্রার্থনা, তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিন। এছাড়া আমার আর কোনো উপায়ই নেই। আমি সব কিছুতেই হেরে গেছি, সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।

আমি বাক্স থেকে পাঁচটা টাকা বের করে ওকে দিয়ে বললাম, এটা রাখো, এটা তোমার পৌরুষের প্রতি আমার দক্ষিণা। আমি কখনও ভাবতেও পারিনি তোমার অন্তরে এতটা বীরত্ব রয়েছে, তোমার হৃদয় এতখানি উদার।

গৃহদাহের আগুনে ঝলসে যাচ্ছে যে বীর, সে রণক্ষেত্রের বীর সৈনিকের চাইতে কোনো অংশেই হীন নয়।

(দফতরী / ১৯২০) অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

আত্মারাম

বেন্দো গ্রামের মহাদেব স্যাকরা নামের ব্যক্তিটিকে সকলেই চিনত। সে প্রতিদিন নিজের বাড়ির বারান্দায় সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে বসে আগুনের মালসার সামনে খট খট করতে থাকত। সেখানকার লোক এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনি শুনতে শুনতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, যদি কোনো দিন কোনো কারণে সে আওয়াজ বন্ধ থাকত তাহলে তারা মনে করত কী যেন একটার অভাব ঘটছে। সে প্রতিদিন খুব সকালে একবার তার টিয়াপাখির খাঁচাটা হতে নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে দিঘির ধার পর্যন্ত যেত। সেই ভোরের অস্পষ্ট আলোয় তার জীর্ণ শরীর, ফোকলা গাল আর নুয়ে-পড়া কোমর কোনো অপরিচিত লোক দেখলে তাকে পিশাচ বলে ভুল করতে পারত। 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা' — এই আওয়াজ যাদের কানে যেত তারা বুঝতে পারত ভোর হয়েছে।

মহাদেবের পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না। তার তিন ছেলে এবং তাদের তিন স্ত্রী ছিল আর ছিল কয়েক ডজন নাতিপুতি। কিন্তু তার বোঝা হালকা করার কেউ ছিল না। ছেলেরা বলে বেড়াত, বাবা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন আমরা জীবনের আনন্দ ভোগ করে নিই, পরে ওই ঢোল তো গলায় একদিন বাঁধতেই হবে। বেচারা মহাদেবকে মাঝে মাঝেই অনাহারে কাটাতে হত। খাওয়ার সময় তার বাড়িতে সাম্যবাদের এমন গগনভেদী নির্ঘোষ উঠতে থাকত যে, সে পেটে খিদে নিয়েই উঠে আসত, আর কিছুক্ষণ থেলো হুঁকোয় তামাক টেনে ঘুমোতে যেত। তার ব্যাবসার জীবনটা ছিল আরও অশান্তিময়। যদিও সে তার পেশায় সুনিপুণ, তার অ্যাসিড অন্যদের ও বস্তুর তুলনায় বেশি পরিশোধনক্ষম এবং তার রাসায়নিক প্রক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে বেশি কষ্টসাধ্য, কিন্তু তবুও তাকে সন্দিগ্ধমনা এবং অসহিষ্ণু ব্যক্তিদের কাছ থেকে অপবাদ পেতে হত। তবে মহাদেব তার অবিচলিত গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা নিচু করে সব শুনে যেত। যখন সব গন্ডগোল মিটে যেত তখন সে তার টিয়ার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিত — 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। এই মন্ত্র জপ করে নিলেই যেন তার প্রাণে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসত।

একদিন ঘটনাক্রমে বাচ্চাকাচ্চাদের মধ্যে কেউ খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছিল। টিয়াটা উড়ে গেল। মহাদেব মাথা তুলে খাঁচার দিকে তাকাতেই তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার মতো হল। টিয়া কোথায়? সে বার বার ভালো করে খাঁচাটাকে দেখে। টিয়াপাখি তো পালিয়েছে। মহাদেব ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় আর এদিকে ওদিকে, চারদিকের ঘরের চালের উপর তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজ করে। এই সংসারে তার প্রিয় বলতে যদি কিছু থাকে তো ওই টিয়াপাখিটাই। ছেলেরা, নাতিপুতির দল, সকলের প্রতিই তার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। বাচ্চাদের গন্ডগোলে তার কাজের বিঘ্ন ঘটত। ছেলেগুলি

নিষ্কর্মা ছিল বলেই যে তাদের ভালোবাসত না একমাত্র তাই নয়, তার আরও কারণ ছিল। ওদের জন্য সে তার 'আনন্দদায়ী সুধাভাণ্ডের' নিয়মিত জোগান থেকে বঞ্চিত হত। প্রতিবেশীদের উপরও মহাদেব বিরক্ত ছিল, কারণ তারা প্রায়ই তার মালসা থেকে আগুন বের করে নিয়ে যেত। এই সমস্ত বিঘ্ন এবং অশান্তি থেকে ত্রাণ পেয়ে কোনো শান্তি লাভের জায়গা যদি থেকে থাকে তো তা হল ওই টিয়াপাখিটা। এর জন্যেই সে কোনোরকম কষ্টবোধ করত না। যে বয়সে মানুষের মানসিক প্রশান্তি লাভ করা ছাড়া আর কোনো বসনা থাকে না, মহাদেবের এখন সেই বয়স।

টিয়াটা একটা চালার উপর বসেছিল। মহাদেব খাঁচাটা নামিয়ে নিয়ে এসে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগল — 'আয়! আয়! সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির আর গ্রামের ছেলেপুলেরা একত্রিত হয়ে চিৎকার করতে আর হাততালি দিতে শুরু করেছে। উপর থেকে কাকগুলো কা-কা করতে শুরু করেছে। টিয়াপাখি ভয় পেয়ে আবার উড়ে গেল এবং একেবারে গ্রামের বাইরে এক গাছের ডালে গিয়ে বসল। মহাদেব খালি খাঁচা নিয়ে পাখির পিছনে ছুটল। বেশ জোরেই দৌড়োল। তার ওই দ্রুতগতি দেখে লোকজন বেশ অবাক হল। মায়ামোহের এর থেকে সুন্দর, সজীব এবং ভাবময় অভিব্যক্তির কথা কল্পনা করা যায় না।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। চাষিরা সব খেত থেকে ফিরছিল। খানিকটা মজা করার সুযোগপেয়ে গেল তারা। মহাদেবকে রাগিয়ে দিয়ে সবাই মজা পেত। কেউ পাথর ছুঁড়তে লাগল, কেউ হাততালি দিতে লাগল। টিয়া আবার সেখান থেকে উড়ে পালাল। এবারে সে অনেক দূরের আমবাগানে একটা গাছের মগডালে গিয়ে বসল। মহাদেব আবার খালি খাঁচা নিয়ে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে চলল। বাগানে যখন পৌঁছোল, তখন তার পায়ের তালু থেকে আগুন বেরোচ্ছে আর মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। একটু সামলে নিয়ে আবার খাঁচাটা তুলে ধরে আওড়াতে লাগল, 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। টিয়া মগডাল থেকে নেমে এসে নীচের একটা ডালে বসল। কিন্তু সশঙ্ক নেত্রে তাকাতে লাগল মহাদেবের দিকে। মহাদেব ভাবল, পাখিটা ভয় পাচ্ছে। খাঁচাটা নীচে নামিয়ে রেখে নিজে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। টিয়া চারদিক বেশ ভালো করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গাছ থেকে নেমে এসে খাঁচার উপর বসল। মহাদেবের বুক কাঁপতে শুরু করল। 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত ...' মন্ত্র জপতে জপতে ধীরে ধীরে টিয়ার কাছে এল এবং তাকে ধরবে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পাখিকে ধরা গেল না, সে আবার উড়ে গিয়ে গাছে বসল।

সন্ধে পর্যন্ত এইরকম চলল। টিয়া কখনও এডালে কখনও ওডালে গিয়ে বসে। কখনও খাঁচার দরজায় বসে নিজের দানাপানির পাত্রটাত্র দেখেশুনে আবার উড়ে যায়। বুড়োকে যদি মূর্তিমান মোহ বলা যায়, তাহলে টিয়া নিশ্চয়ই মূর্তিময়ী মায়া। এইভাবে আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল এবং মায়া ও মোহের এই সংগ্রাম ক্রমে স্থায়ী অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

রাত্রি হয়ে গেল। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। পাতার আড়ালে কে জানে কোথায় টিয়াটা লুকিয়ে রইল। মহাদেব ভালো করেই জানত যে রাতের বেলায় সে কোথাও উড়ে যেতে পারবে না, আর খাঁচাতেও আসতে পারবে না। সে তা সত্ত্বেও সেই জায়গা থেকে নড়ার নাম করল না। আজ সারাদিন সে কিছু খায়নি; রাতের খাওয়ার সময়ও পার হয়ে গেল। এক ফোঁটা জলও তার গলা দিয়ে নামেনি। তবু তার না ছিল খিদে, না ছিল তেষ্টা। টিয়ার অবর্তমানে তার জীবন অর্থহীন, রুক্ষ এবং

রিক্তবলে বোধ হতে লাগল। মহাদেব দিনরাত পরিশ্রম করতে পারত কারণ টিয়াপাখিটা ছিল তার প্রেরণাস্বরূপ; অভ্যাসবশতই সে জীবনের অন্যান্য কাজ করে যেত। এই সব কাজে আপন সজীবতার লেশমাত্রও সে অনুভব করতে পারত না। টিয়াই ছিল একমাত্র প্রাণী যা তার মধ্যে প্রাণের আভাস এনে দিত। হাত ফসকে সেই পাখির চলে যাওয়াটা আত্মার দেহত্যাগ করার শামিল।

সারাদিনের খিদে, তেষ্টা, ক্লান্তিতে মহাদেবের মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকিয়ে চোখ খুলে তাকাচ্ছিল আর ওই সর্বপরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে তার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল — 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'।

রাতের আধখানা কেটে গেল। এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে মহাদেব চমকে তাকিয়ে দেখল যে কাছেই আর একটা গাছের নীচে একটা আবছা আলোতে কয়েকটা লোক বসে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। তারা সবাই তামাক খাচ্ছিল। তামাকের মদির গন্ধ মহাদেবকে চঞ্চল করে তুলল। সে উঁচু গলায় হাঁক দেয় — 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। আর তামাক খাওয়ার আশায় লোকগুলোর দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু হরিণ যেমন বন্দুকের আওয়াজ পেলেই পালাতে থাকে, তেমনই তাকে আসতে দেখে লোকগুলোও উঠে সবেগে পালিয়ে গেল। একেক জন একেক দিকে পালাল। মহাদেব চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তারপর হঠাৎ তার মনে হল লোকগুলো বোধ হয় সবাই চোর। সে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, চোর, চোর, ধরো, ধরো। চোরেরা এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতেও সাহস পেল না।

মহাদেব আলোর কাছে গিয়ে একটা কলসি দেখতে পেল। কলসিতে মরচে পড়ে কালো হয়ে গেছে। মহাদেবের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। কলসিতে হাত দিতেই মোহর আছে বলে মনে হল। একটা মোহর বের করে নিয়ে আলোর সামনে ভালো করে দেখল : হ্যাঁ, তাইতো, মোহরই তো বটে। তাড়াতাড়ি কলসিটা তুলে নিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। তারপর গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল। সাধু মহাদেব চোর মহাদেবে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে তার ভয় হতে থাকল যে যদি চোরেরা ফিরে এসে তাকে একা পেয়ে মোহর ছিনিয়ে নেয়। সে কিছু মোহর কোমরে বেঁধে নিল। তারপর একটা শুকনো কাঠ দিয়ে জমির মাটি সরিয়ে কয়েকটা গর্ত তৈরি করল। সেগুলোকে মোহর দিয়ে ভরতি করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল।

মহাদেবের মানসনেত্রে চিন্তা এবং কল্পনায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ জগতের একটা ছবি ভেসে উঠল। যদিও তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ হাতছাড়া হওয়ার ভয় ছিল, তবুও নানান অভিলাষ মনের ভেতর তাদের কাজ শুরু করে দিল। গড়ে উঠল একটা পাকা বাড়ি; জহুরির একটা কারবার শুরু হয়ে গেল; আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আবার সম্পর্ক গড়ে উঠল; ভোগবিলাসের সব সামগ্রীগুলো এক জায়গায় এসে হাজির হল; এ সবের পরেই নিয়মমতো তীর্থযাত্রায় তাকে যেতে হল এবং সেখান থেকে ফিরেই মহাসমারোহ করে যাগযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণভোজন হল। এ সবের পরে একটা শিবালয় এবং একটা ইঁদারা তৈরি করতে হল। তৈরি হয়ে গেল একটা কুঞ্জ যেখানে সে রোজ পুরাণ-কথকতা শুনতে শুরু করল। সাধুসন্তরা যত্নআত্তি পেতে লাগলেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ চিন্তা হল যদি চোরেরা আবার আসে, তাহলে সে পালাবে কী করে। সে পরীক্ষা করে দেখার জন্য কলসিটা তুলল তারপর অনায়াসে তাড়াতাড়ি শ-দুই কদম

দৌড়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন তার পায়ে পাখনা গজিয়েছে। দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। তারপর আবার সেই আকাশকুসুম চিন্তার মধ্যেই আস্তে আস্তে রাত কেটে গেল। উষার প্রকাশে মৃদুমন্দ সমীরণে এবং পাখির কূজনে চারদিক পূর্ণ হয়ে উঠল। সহসা মহাদেবের কানে ভেসে এল —

'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা
রামকে চরণ মে চিত্ত লাগা।'

এই বুলি মহাদেবের জিহ্বায় লেগেই থাকত। সারাদিনে সহস্রবার এই শব্দ তার মুখ থেকে বেরোত। কিন্তু কখনও এই চরণদুটির অন্তর্নিহিত মহৎভাব তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি। কোনো নিষ্প্রাণ বাদ্যযন্ত্র থেকে যেমন রাগরাগিণীর আওয়াজ সৃষ্ট হয়ে থাকে, তেমনই তার মুখ থেকে ওই স্তোত্র বেরোত। কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত তার জীবন-তরুতে পত্রপল্লবের উপস্থিতি মাত্র ছিল না। প্রভাতের নির্মল বায়ু তাই সেখানে গুঞ্জনধ্বনি জাগিয়ে তুলতে পারেনি। আর এই মুহূর্তে সেই বৃক্ষে নতুন শাখার উদ্‌গম হল, মঞ্জুরিত হল নবকিশলয়। মলয় পবনে হিন্দোলিত হল বৃক্ষরাজি, গুঞ্জরিত হল বনতল।

ক্রমে অরুণোদয়ের সময় উপস্থিত হল। এক অনির্বচনীয় দ্যুতিতে প্রকৃতি প্লাবিত হয়ে গেল। আকাশ থেকে মাঝে মাঝে তারা যেমন ধরণীর দিকে নেমে আসে, তেমনই ভাবে তখন হঠাৎ উঁচু ডাল থেকে জোড়াপায়ে টিয়াটা নেমে এসে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ল। মহাদেব উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসে খাঁচাটা তুলে ধরে বলল — এসো বাবা আত্মারাম। তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ অনেক, কিন্তু আমার জীবন সফল করেও তুলেছ। আমি এখন থেকে রুপোর খাঁচায় রেখে তোমাকে সোনায় মুড়ে দেব। মহাদেবের প্রতি লোমকূপ থেকে ঈশ্বরের প্রতি অশেষ করুণার জয়গান ধ্বনিত হতে থাকল : হে প্রভু, হে দয়াময়! অসীম তোমার করুণা, না হলে আমার মতো পাপী এবং ঘৃণিত জীব কি তোমার এই দয়া পাওয়ার যোগ্য। একটা পবিত্র ভাবের উদয় হওয়াতে তার চিত্ত উদ্‌বেলিত হয়ে উঠে, গভীর উপলব্ধির সঙ্গে সে বলে উঠে —

'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা
রামকে চরণমে চিত্ত লাগা।'

সে একহাতে খাঁচা, অপর হাতে কলসি নিয়ে ঘরের দিকে রওনা দিল।

মহাদেব যখন বাসায় পৌঁছল তখনও রাতের আঁধার কাটেনি। সারা রাস্তায় একটা কুকুর ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পায়নি। কুকুরটাও দৃক্‌পাত করেনি, কারণ কুকুরদের মোহরের প্রতি লোভের কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। মহাদেব কলসিটা গামলার ভেতরে লুকিয়ে রেখে সেটাকে ভালো করে কয়লা দিয়ে ঢেকে নিজের ঘরে রেখে দিল।

দিনের আলো ফুটতেই সে সোজা পুরোহিতের বাসায় গিয়ে পৌঁছল। পুরোহিত ঠাকুর তখন পুজো করতে বসে ভাবছিলেন — কালই মোকদ্দমার দিন পড়েছে, অথচ হাতে একটা কানাকড়িও নেই — যজমানদের কেউই তার ধারে কাছে আসে না। এমন সময় মহাদেব এসে প্রণাম কের। পণ্ডিতজি মুখ ফিরিয়ে নিলেন : এই মূর্তিমান অমঙ্গল কোথা থেকে এসে পৌঁছল? কে জানে আজ

কপালে খাওয়া জুটবে কি না? বেশ রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন — কী ব্যাপার? সাত সকালে কী চাই? তুমি তো জানই এই সময়টা আমি পুজোআর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

মহাদেব বিনীত ভাবে বলল — মহারাজ, আজ আমার ওখানে সত্যনারায়ণের পুজো করাতে চাই।

পুরোহিতমশাই তো একেবারে অবাক। নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না। মহাদেবের বাড়িতে কথকতার আয়োজন হওয়া আর পুরুতঠাকুরের নিজের বাড়ি থেকে ভিখারির ভিক্ষে পাওয়া যে একই রকমের অসাধারণ ঘটনা। মুখ থেকে তাই বেরিয়ে আসে, কেন, আজ কিছু হল না কী?

মহাদেব বলে, কিছু না, কিছু না, আজ হঠাৎ ইচ্ছে হল ভগবানের নামগান শোনার।

বেলা একটু বাড়তেই নানা প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বেন্দো গ্রাম এবং কাছাকাছি অন্যান্য গ্রামেও খবর জানিয়ে সুপুরি বিলি করা হল। কথকতার শেষে ভোজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। যে শোনে সেই অবাক হয়। এই শুকনো মরুভূমিতে ঘাস গজাল কী করে?

সন্ধ্যার সময়, লোকজন জড়ো হয়েছে এবং পণ্ডিতজি নিজের সিংহাসনে বিরাজমান। এমন সময় মহাদেব দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে বলল, ভাইসব, আমার সারা জীবন ছলচাতুরিতে কেটে গেছে। আমি জানি না, কত লোককে আমি ঠকিয়েছি, কত আসল জিনিসকে মেকিতে পরিণত করেছি। এখন ভগবান আমার উপর সদয় হয়েছেন, তিনি আমার মুখের উপর থেকে কলঙ্কের ছাপ মুছে ফেলতে চান। তাই আমি এখানে সমবেত সব ভাই-বন্ধুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি — যার যা কিছু আমার কাছে গচ্ছিত আছে, যার যার জমা আমি আত্মসাৎ করেছি, আর যার যার খাঁটি জিনিস জাল জিনিসে পরিণত করেছি — তারা যেন এসে নিজের হিসেবের প্রতিটি কানাকড়ি অবধি বুঝে নিয়ে যান। আর যদি কেউ এখানে না এসে থাকেন, তাহলে আপনারা ফিরে গিয়ে সকলকে বলে দেবেন যে, কাল থেকে এক মাসের মধ্যে যে কোনো দিন যে কোনো সময় আমার কাছে এসে তারা যেন নিজের হিসাব চুকিয়ে নিয়ে যান। কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার নেই।

সমবেত সকলে অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বলল, কেমন? আমি বলেছিলাম কি না? কেউ আবার অবিশ্বাসের সুরে বলল, সব যোগ করলে তো কয়েক হাজার টাকা হবে — ও দেবে কোত্থেকে?

একজন ছত্রী রাজপুত আবার ঠাট্টা করে বলে উঠলেন — আর যারা পরলোকে গেছেন, তাদের কী হবে?

মহাদেব উত্তর দিল, তাদের বাড়ির লোকজন তো আছে।

সেই সময়ে কিন্তু লোকের বকেয়া উশুলের ইচ্ছে যতটা প্রকট ছিল, তার চেয়ে বেশি প্রকট ছিল কোথা থেকে মহাদেবের এত ধনপ্রাপ্তি ঘটল, সেটা জানার ইচ্ছে। কিন্তু মহাদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করার সাহসও হল না কারও। দেহাতি লোক সবাই, পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটার কলাকৌশল তারা জানে না। তাছাড়া বেশির ভাগ লোকেরই স্মরণে ছিল না মহাদেবের কাছে তাদের কী পাওনা, আর এই পবিত্র মুহূর্তে যদি ভুলচুক কিছু হয়ে যায়, সেই ভয়েও তারা মুখ খুলতে সাহস করেনি। কিন্তু সব থেকে বড়ো কথা হল যে, মহাদেবের এই সাধুতা তাদের বশীভূত করে ফেলেছিল।

হঠাৎই পুরোহিতমশাই বলে উঠলেন, তোমার হয়তো মনে আছে মহাদেব, আমি তোমাকে সেবার ডালার মালা তৈরির জন্যে সোনা দিয়েছিলাম, আর তুমি তা থেকে কয়েক মাষা ওজন করার সময়েই মেরে দিয়েছিলে।

মহাদেব — হ্যাঁ। মনে আছে বইকী। আপনার কতটা লোকসান হয়েছিল?

পুরোহিত — তা, পঞ্চাশ টাকার কম হবে না।

মহাদেব কোমরের খুঁট থেকে দুটো মোহর বার করে পুরোহিতের সামনে রেখে দিল। পুরোহিত ঠাকুরের এই লোলুপতা নিয়ে টীকাটিপ্পনি শুরু হয়ে গেল : এটা একেবারে বেইমানি, খুব বেশি হলে দু-চার টাকা ক্ষতি হয়তো হয়েছিল। আর সেখানে বেচারার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করে নিল? নারায়ণের ভয়ও নেই। এদিকে পণ্ডিত হয়েছেন, আর ওদিকে এতটা অসৎ চরিত্র? ছি! ছি!

লোকের মনে মহাদেব সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু ওই হাজার মানুষের জমায়েতের মধ্যে থেকে একজনও উঠে দাঁড়াল না। তখন মহাদেব আবার বলল, মনে হচ্ছে আপনারা নিজেদের হিসেব ভুলে গেছেন। তাহলে আজ কথকতাই শুরু হোক। কিন্তু আমি একমাস পর্যন্ত আপনাদের পথ চেয়ে থাকব। তারপর তীর্থযাত্রায় বেড়িয়ে পড়ব। ভাইসব! আপনাদের সকলের কাছে বিনীত আবেদন করছি, আমাকে উধ্বার করুন।

একমাস ধরে মহাদেব পাওনাদারদের জন্যে অপেক্ষা করল। রাত্রে চোরের ভয়ে ঘুমোত না পর্যন্ত। এই ঘটনার পর কাজকর্ম করাও ছেড়ে দিয়েছিল। মদের নেশাও ঘুচে গিয়েছিল। সাধুসন্ত প্রভৃতি অভ্যাগতদের, যাঁরা এসে পড়তেন তাঁদের যথাযোগ্য সৎকার করত। বহু দূর পর্যন্ত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। একমাস পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও একজন লোকও এল না হিসাব মেটানোর জন্য। আজ মহাদেব অনুভব করতে পারল, সংসারে এখনও ধর্ম এবং সদাচার কী বিপুল পরিমাণে অবশিষ্ট আছে; এখন সে বুঝতে পারল, জগৎ খারাপ লোকের কাছেই খারাপ, আর ভালোর কাছে ভালো।

এই ঘটনার পর পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। এখনও কেউ বেন্দো গ্রামে গেলে দূর থেকেই একটা সোনার কলসি দেখতে পাবে। ওটা হল ঠাকুর-দ্বারের কলস। মন্দিরের লাগোয়া একটা বাঁধানো দিঘিতে প্রচুর পদ্ম ফুটে আছে। সেই দিঘির মাছ কেউ ধরে না। দিঘির কিনারায় একটা বিশাল সমাধি স্থাপিত আছে। এটাই 'আত্মারাম'-এর স্মৃতিচিহ্ন, তার সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কেউ বলে তার সেই সোনার খাঁচাসুদ্ধই সে স্বর্গে আছে। কেউ বলে সে 'সত্য গুরুদত্ত...' বলতে বলতে হঠাৎ অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে — ওই পক্ষীরূপী চন্দ্রকে একটা বিড়ালরূপী রাহু গ্রাস করেছিল। লোকে বলে এখনও নাকি মাঝরাতে দিঘির ধারে আওয়াজ শোনা যায় —

'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা
রামকে চরণ মে চিত্ত লাগা।'

মহাদেবের বিষয়েও অনেক জনশ্রুতি আছে। সেগুলোর মধ্যে যা বিশ্বাসযোগ্য তা হল আত্মারাম সমাধিস্থ হওয়ার পরে পরেই মহাদেব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হিমালয়ে চলে যায় এবং আর ফিরে আসেনি। সেখানে সেও 'আত্মারাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

(আত্মারাম/১৯২০) অনুবাদ সৌরেন ভট্টাচার্য

পশু থেকে মানুষ

দুর্গা মালি কাজ করত ডক্টর মেহ্‌রা, বার-এট্‌-ল-এর বাড়িতে। তার বেতন ছিল মাসে পাঁচ টাকা। স্ত্রী ও দু-তিনটি ছোটো সন্তান নিয়ে ছিল তার সংসার। দুর্গার স্ত্রী প্রতিবেশীদের গম পেষাই করে দিত। যে বাচ্চা দুটোর একটু বুদ্ধি হয়েছিল তারা এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানি কাঠ ও ঘুঁটে জোগাড় করে নিয়ে আসত; কিন্তু এত করেও অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হত। ডক্টর সাহেবের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দুর্গা বাগান থেকে ফুল তুলে বাজারে গিয়ে পূজারিদের কাছে বেচে দিত। কোনো কোনো সময় ফলও চুরি করে বেচে দিত। এ সবই ছিল তার উপরি আয়। এ দিয়েই তার তেল-নুনের ব্যবস্থাটা হয়ে যেত। কয়েক বারই সে ডক্টর সাহেবের কাছে তার বেতন বাড়াবার জন্য প্রর্থনা জানিয়েছিল; কিন্তু ডক্টর সাহেব চাকরদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে সংক্রামক ব্যাধি হিসাবে গণ্য করতেন, যা একজনের কাছ থেকে অন্য জনে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাফ বলে দিতেন: দেখ, আমি তো তোমাকে বেঁধে রাখিনি। তোমার যদি না পোষায় তো অন্য কোথাও চলে যাও। আমার এখানে মালির আকাল হবে না। দুর্গার এত সাহস ছিল না যে হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে চাকরি খুঁজে বেড়ায়। এখান থেকে বেশি বেতন পাবার আশাও ছিল না। কাজেই, এই নৈরাশ্যময় জীবনকে মেনে নিয়ে অদৃষ্টকে সে অভিশাপ দিত। ডক্টর সাহেব ছিলেন বিশেষ বাগানপ্রেমী লোক। নানা রকমের ফুল-পাতার গাছ তিনি লাগিয়েছিলেন। দ্বারভাঙ্গা, মলিহাবাদ, সাহারানপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে ভালো ভালো ফলের গাছ এনে তাঁর বাগানে লাগিয়েছিলেন। গাছ ফলে ভরে আছে দেখলে তাঁর খুব আনন্দ হত। নিজের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে ফুলের তোড়া আর ঝুড়ি ঝুড়ি শাক-সবজির উপহার পাঠিয়ে যেতেন। তার নিজের ফল খাবার কোনো শখ ছিল না, তবে বন্ধুদের খাইয়ে অসীম আনন্দ পেতেন। প্রত্যেক ফলের মরশুমে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন আর 'পিকনিক পার্টি' ছিল তাঁর চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়।

একবার গরমের সময় তিনি তাঁর কয়েক জন বন্ধুকে আম খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মলিহাবাদি গাছে সুফেদা আম খুব ধরেছিল। ডক্টর সাহেব রোজ এই ফল দেখাশোনা করতেন। প্রথম বারের ফল বলেই তিনি বন্ধুদের মুখ থেকে এই আমের মিষ্টত্ব ও স্বাদের বর্ণনা শুনতে চেয়েছিলেন। একজন পালোয়ান তার কসরত দেখিয়ে যে আনন্দ পায় তিনি বন্ধুদের মুখ থেকে আমের প্রশংসা শুনে সেই আনন্দ পেতেন। এত বড়ো, সুন্দর ও নরম সুফেদা তাঁর নজরে পড়েনি। এই ফলের স্বাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তা চেখে দেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। একটা ফল চেখে নষ্ট করলে একজন বন্ধুকে তার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত করা হবে, মুখ্যত এই কারণটাও ছিল।

সন্ধ্যাকাল, চৈত্রমাস। বন্ধুরা এসে বাগানের মধ্যে জলাশয়ের ধারে পাতা চেয়ারে বসেছেন। আগেই তাদের জন্য বরফ ও দুধের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। তখন পর্যন্ত ফল পাড়া হয়নি। ডক্টর সাহেব ফলগুলো গাছে ঝুলছে এটা দেখিয়ে পাড়তে চেয়েছিলেন, যাতে কারোরই এ সন্দেহ না হয় যে ফল তাঁর বাগানের নয়। সবাই এসে গেলে তিনি বললেন, আপনাদের কষ্ট হবে ঠিকই, তবু একটু গিয়ে গাছে ঝুলন্ত ফলগুলো যদি দেখেন। এ দৃশ্য বড়ো মনোরম। গোলাপেরও এমন নয়নলোভন লালিমা হয় না। রং দেখে স্বাদও বোঝা যাবে। আমি এগাছের কলম খোদ মলিহাবাদ থেকে আনিয়েছিলাম আর এই গাছ বড়োও করেছি বিশেষ নিয়মে।

বন্ধুরা সব উঠে দাঁড়ালে ডক্টর সাহেব আগে আগে চললেন। পথের দুধারে ছিল গোলাপের সারি। গোলাপের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে শেষে তারা সুফেদা আমগাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! গাছে তো একটা ফলও নেই। ডক্টর সাহেব ভাবলেন, বোধ হয় এ-গাছ নয়। দু-পা এগোতেই আর একটা গাছ পাওয়া গেল। আর একটু এগিয়ে আরও একটা। আবার পিছিয়ে এসে সেই সুফেদা আমগাছের নীচে বিস্ময়বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাছ যে ভুল হয়নি তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ফল কোথায় গেল? বিশ-পঁচিশটা আম ছিল, এখন একটারও চিহ্ন নেই! বন্ধুদের দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আশ্চর্য লাগছে যে এই গাছে একটা আমও নেই। আজ সকালে দেখেছি, গাছ আমে ভরে আছে। এই দেখুন আমের বোঁটা। এটা নিশ্চয়ই মালির বদমাইশি। আজ আমি ওর হাড় গুঁড়ো করব। ব্যাটা পাজি আমাকে কীভাবে ধোঁকা দিল! আমি অত্যন্ত লজ্জিত যে, আপনাদের মিছিমিছি কষ্ট দিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমার এখন এত খারাপ লাগছে যে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এমন সুন্দর এমন নরম লাবণ্যময় ফল আমি কখনও দেখিনি। এই আম এভাবে উবে গেল দেখে আমার মন ভেঙে গেছে।

এসব বলতে বলতে তিনি নৈরাশ্য ও বেদনাভরে চেয়ারে বসে পড়লেন। বন্ধুরা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, চাকরদের ব্যাপার সব জায়গাতেই এই রকম। এ জাতটাই পাজি। আমাদের কষ্ট হল বলে আপনি দুঃখ করবেন না। সুফেদা নাই বা হল অন্য আম তো রয়েছে।

এক ভদ্রলোক বললেন — সাহেব, আমার তো সব আমই একরকম লাগে। সুফেদা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, দসেরা — এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না। জানি না, কীভাবে আপনারা এদের মধ্যে স্বাদের পার্থক্য স্থির করেন।

দ্বিতীয় এক ভদ্রলোক বললেন — আমারও সেই কথা। এই সময়ে যে জাত পাওয়া যায় তাই আনিয়ে দিন না। যা গেছে তা নিয়ে আপশোশ কেন?

ডক্টর সাহেব ব্যথিতভাবে বললেন — আমের কি আর কিছু অভাব আছে? সারা বাগান আমে ছেয়ে আছে। যত খুশি খান আর সঙ্গে করে নিয়েও যান। এগুলো আছে তো ওই জন্যেই। কিন্তু সেই রস আর সেই স্বাদ কোথায় পাওয়া যাবে? আপনাদের বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, এই সুফেদা এত মসৃণ ছিল যে আপেলের মতো মনে হত। আপেলও দেখতে সুন্দর, কিন্তু তাতে সেই রুচিবর্ধক কান্তি, সেই অমৃতময় মিষ্টতা কোথায়? এই মালি আজ এমন অনর্থ ঘটাল যে, ইচ্ছা হচ্ছে নিমকহারামটাকে গুলি করে শেষ করে দিই। এখন সামনে পেলে আধমরা করে দেব।

মালি বাজারে গিয়েছিল। ডক্টর সাহেব সইসকে দিয়ে কিছু আম পাড়ালেন। বন্ধুরা আম খেয়ে, দুধ খেয়ে, ডক্টর সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে যে যার পথ ধরলেন। ডক্টর মেহরা কিন্তু সেই জলাশয়ের ধারে হাতে হান্টার নিয়ে মালি ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দেখে সাক্ষাৎ ক্রোধের প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল।

দুই

একটু রাত করে দুর্গা বাজার থেকে ফিরল। এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিপাত করে সে ফিরছিল। যখনই সে দেখল ডক্টর সাহেব হাতে হান্টার নিয়ে জলাশয়ের ধারে বসে আছেন তখনই ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। সে বুঝল, তার চুরি ধরা পড়ে গেছে। এই ভয়েই সে বাজারে খুব দেরি করেছিল। সে ভেবেছিল — ডক্টর সাহেব হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকবেন আর আমি চুপি চুপি কাঁঠাল গাছের নীচে আমার ডেরায় গিয়ে বসে থাকব। সকালে যদি কিছু জিজ্ঞাসাবাদও হয়, সাফাই গাইবার অবসর পাওয়া যাবে। পাকা চোরের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু হল সময়। এক একটা মুহূর্ত তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার পক্ষেই যায়। কিন্তু চোর যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় তখন আর তার বাঁচার উপায় থাকে না। শুকনো রক্তের দাগকে রঙের দাগ বলে চালানো যায়; কিন্তু তাজা রক্ত তো নিজেই সোচ্চার। দুর্গার পা আর চলছিল না, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ডক্টর সাহেব দুর্গাকে দেখে ফেলেছিলেন। এখন আর পেছন ফেরা সম্ভব ছিল না।

ডক্টর সাহেব তাকে দূর থেকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য ছিল আচ্ছা করে ধোলাই দেবেন। কিন্তু যেহেতু নিজে উকিল ছিলেন তাই ঠিক করলেন তার বক্তব্য শোনা দরকার। ইশারা করে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন — সুফেদা গাছে বেশ আম ধরেছিল। এখন একটাও নেই। কী হল বল তো?

দুর্গা নির্দোষের মতো জবাব দিল — হুজুর, এই একটু আগে যখন আমি বাজারে গিয়েছিলাম তখনও তো সব আম গাছে ঝুলছে দেখে গেছি। এর মধ্যে কেউ পেড়ে নিয়ে থাকলে আমি বলতে পারব না।

ডক্টর — কার উপর তোমার সন্দেহ হয়?

দুর্গা — সরকার, আমি তা কী করে বলব? আপনার কত চাকরবাকর, জানি না কার এই দুর্মতি হয়েছে।

ডক্টর — আমার সন্দেহ তোমাকে। যদি পেড়ে থাকো তো এনে দিয়ে দাও। সোজাসুজি বল, পেড়েছি। নয়তো খুব খারাপ হবে।

চোর যে কেবল দণ্ড থেকেই বাঁচতে চায়, তা নয়; সে অপমানের হাত থেকেও বাঁচতে চায়। সে দণ্ডকে যত না ভয় পায় তার চেয়ে বেশি ভয় পায় অপমানকে। শাস্তি থেকে বাঁচার যখন আর কোনো আশাই থাকে না তখনও সে অপরাধ স্বীকার করে না। অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি থেকে বাঁচার চেয়ে নির্দোষ থেকে দণ্ড ভোগ করাকে সে শ্রেয় মনে করে। দুর্গাও অপরাধ স্বীকার করে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারত, কিন্তু সে বলল — হুজুর, আপনি মালিক। আপনার যা ইচ্ছা আপনি করবেন। তবে

আমি আম পাড়িনি। আপনিই বলুন, এতদিন আপনি আমাকে রেখেছেন, কোনোদিন কি একটা পাতায় হাত দিয়েছি?

ডক্টর — তুমি দিব্যি করে বলতে পারবে?

দুর্গা — গঙ্গামার নামে দিব্যি করে বলছি যদি আমে হাত দিয়ে থাকি।

ডক্টর — আমি এ শপথ বিশ্বাস করি না। প্রথমে তুমি ঘটিতে জল নেবে, তাতে তুলসী পাতা দেবে তারপর শপথ করে বলবে, আমি যদি আম পেড়ে থাকি তবে আমাকে যেন আমার ছেলের মুখ দেখতে না হয়। তাহলে আমার বিশ্বাস হবে।

দুর্গা — হুজুর, যা সত্য তাতে ভয় কীসের। যা দিব্যি করতে বলবেন করব। যখন একাজ আমি করিনি তখন দিব্যি করলে আর কী হবে।

ডক্টর — ঠিক আছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জল নিয়ে এসো।

ডক্টর সাহেব মানবচরিত্র বুঝতেন। সর্বদা অপরাধীদের সঙ্গে তাঁকে কারবার করতে হত। যদিও দুর্গা খুব বড়ো গলায় নিজের সাফাই গাইছিল, তবু মনে তার ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সে তার ডেরায় গেল ঠিকই, কিন্তু ঘাটিতে করে জল নেবার সাহস তার হল না। তার হাত কাঁপতে লাগল। এমন সব ঘটনা মনে এল যাতে গঙ্গামার নামে মিথ্যা শপথকারীর উপর দেবীর কোপ পড়েছিল। ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ, এই বিশ্বাস তাকে এমন নিদারুণ ভাবে এর আগে আর কখনও পায়নি। সে ঠিক করল — আমি গঙ্গামার নামে মিথ্যা শপথ করব না। তাতে যদি বেরিয়ে যেতে হয় তো বেরিয়ে যাব। চাকরি কোথাও না কোথাও পাওয়াই যাবে। আর যদি নাই পাওয়া যায় তো দিনমজুরি আছে। কোদাল চালালেও সন্ধ্যা নাগাদ আধা সের আটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সে আস্তে আস্তে খালি হাতে ডক্টর সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল।

ডক্টর সাহেব কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন — জল এনেছ?

দুর্গা — হুজুর, গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্যি করতে পারব না।

ডক্টর — তাহলে তুমি আম পেড়েছ এটাই প্রমাণ হল?

দুর্গা — এখন আপনার যেমন ইচ্ছা আপনি ভাবতে পারেন। ধরে নিন আমিই আম পেড়েছি। তা, আমি তো আপনারই চাকর। দিনরাত আপনার হুকুম তামিল করছি। ছেলেপুলেরা যদি আমের জন্য কান্নাকাটি করে তবে কোথায় বা যাব! এবারকার মতো বাঁচান, আর কোনো দিন এ অন্যায় করব না।

ডক্টর মহোদয় এতটা উদার ছিলেন না। তবে তিনি এই বড়ো উপকারটুকু করলেন যে, দুর্গাকে পুলিশে দিলেন না কিংবা তার উপর হান্টার ব্যবহার করলেন না। দুর্গার ধর্মবিশ্বাস ডক্টর সাহেবকে কিছুটা নরম করে ফেলেছিল। তবে এমন দুর্বলচিত্ত লোককে নিজের কাছে রাখাও ছিল অসম্ভব। তার অর্ধের মাসের বেতন কেটে রেখে তিনি সেই মুহূর্তে দুর্গাকে চাকরি থেকে জবাব দিয়ে দিলেন।

তিন

কয়েক মাস পরে একদিন ডক্টর মেহরা প্রেমশংকরবাবুর বাগানে বড়োতে গেলেন। ওখান থেকে কিছু ভাল কলম আনা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রেমশংকরও ছিলেন বাগানপ্রেমী আর এই দুটি মানুষের

মধ্যে এই জায়গাতেই ছিল মিল। অন্য সব বিষয়ে ওঁরা ছিলেন একে অন্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রেমশংকর ছিলেন অল্পে সন্তুষ্ট, সরল আর সহৃদয় মানষ। কিছুদিন তিনি আমেরিকায় ছিলেন, সেখানে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেন। তারপর দেশে ফিরে তিনি এই কৃষিকেই তার জীবিকা করে নেন। মানবচরিত্র ও বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা ছিল বিচিত্র। এই জন্য শহরের সভ্য সমাজের মানুষ তাঁকে উপেক্ষা করত ও খামখেয়ালি মানুষ বলে গণ্য করত। এটা ঠিকই যে, তাঁর নীতিগুলো সম্পর্কে মানুষের একধরনের দার্শনিক সহানুভূতি ছিল। তবে সেই নীতিগুলো কার্যকর করার প্রশ্নে তাদের মনে যথেস্ট শঙ্কা ছিল। সংসার কর্মক্ষেত্র, মীমাংসার ক্ষেত্র নয়। এখানে নীতি নীতির স্তরেই থাকবে, বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

ডক্টর সাহেব বাগানে পৌঁছে দেখলেন, প্রেমশংকর ফুলগাছে জল দিচ্ছেন। কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে একটি লোক পাম্পের সাহায্যে জল তুলে দিচ্ছে। মেহরা তাকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনে ফেললেন। ও ছিল দুর্গা মালি। ডক্টর সাহেবের মনে সে সময় দুর্গার প্রতি এক বিচিত্র ঈর্ষার উদয় হল। যে নরাধমকে তিনি দণ্ড দিয়ে নিজের কাছ থেকে তাড়ালেন তার আবার চাকরি হল কী করে? দুর্গাকে যদি তখন কাঁদোকাঁদো মুখে দেখা যেত তাহলে ডক্টর সাহেবের মনে দয়ার উদ্রেক হত। তিনি সম্ভবত তাকে কিছু বকশিশ দিতেন এবং প্রেমশংকরের কাছে তার প্রশংসাও করতেন। তাঁর প্রকৃতিতে দয়া ছিল এবং নিজের ভৃত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিও ছিল। তবে তাঁর এই কৃপা বা দয়ার সঙ্গে তাঁর কুকুর বা ঘোড়ার প্রতি যে দয়া তার লেশমাত্র পার্থক্য ছিল না। এই কৃপার ভিত্তিমূলে কিন্তু ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, ছিল দরিদ্র-পালনের দৃষ্টিভঙ্গি। দুর্গা তাঁকে দেখে কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নমস্কার জানিয়ে আবার নিজের কাজ করতে লাগল। তার এই ব্যবহার ডক্টর সাহেবের হৃদয়ে এসে ছুরির ফলার মতো বিঁধল। তার কাছে থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়েছে, এই কথা ভেবে ডক্টর সাহেবের অত্যন্ত ক্রোধ হল। নিজের উদারতার জন্য তাঁর যে অহংকার ছিল তাতে খুব আঘাত লাগল। প্রেমশংকর ডক্টর সাহেবকে নিয়ে ফুলের কেয়ারি দেখাতে গেলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — এই লোকটি আপনার এখানে কতদিন আছে?

প্রেমশংকর — প্রায় ছ-সাত মাস হবে।

ডক্টর — কোনো লুটপাট করছে না তো? আমার ওখানে মালির কাজ করত। ওর হাতটানের জন্য বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কখনও ফুল তুলে বেচে দিত, কখনও গাছ উপড়ে নিয়ে যেত, আর ফলের কথা কী বলব! এসব ছাড়া সে চলতেই পারত না। একবার আমি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মলিহাবাদি সুফেদা গাছে ফলও খুব ধরেছিল। সবাই এসে বসলে আমি তাদের নিয়ে গাছের ফল দেখাতে গেলাম। দেখি সব আম বেপাত্তা। তখন আমার অবস্থা কী রকম হাস্যকর হয়েছিল তা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি তখনই একে গালিগালাজ করি। অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক লোক আর এত ধূর্ত যে ধরা মুশকিল। উকিলদের মতো শক্ত লোক হলে হয়তো ধরতে পারে। তার সাফাই গাওয়া, তার ঔদ্ধত্য দেখবার মতো। আপনার এখানে কোনো গোলমাল করেনি তো?

প্রেমশংকর — আজ্ঞে না, কখনও না। অভিযোগের কোনো কারণ ঘটতে দেয়নি। এখানে তো খুব পরিশ্রম করে, এমন কী, দুপুরে ছুটির সময়ও বিশ্রাম করে না। আমার তো এখন ওর উপর এত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে যে, সমস্ত বাগানের ভার ওর উপর ছেড়ে দিয়েছি। সারাদিনে যা বেচাকেনা হয় তার হিসাব সন্ধ্যায় সে আমাকে দিয়ে দেয় আর কখনও এক পাই পয়সারও এদিক-ওদিক হয় না।

ডক্টর — এটাই হল ওর কৌশল। ও আপনার মাথা উলটো ঘুরিয়ে দিলেও বুঝতে পারবেন না। আপনি একে কত বেতন দেন?

প্রেমশংকর — এখানে কাউকেই বেতন দেওয়া হয় না। লাভে সকলের সমান অংশ। সারা মাসে প্রয়োজনীয় খরচের পর যা উদ্‌বৃত্ত থাকে তার শতকরা দশভাগ 'ধর্মখাতে' রাখা হয়। বাকি অংশ সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হয়। গতমাসে একশো চল্লিশ টাকা আমদানি হয়েছিল। আমাকে নিয়ে এখানে সাত জন লোক কাজ করে। বিশ টাকা করে ভাগে পড়েছিল। এখন প্রচুর কমলালেবু হয়েছে, মটর শাক, আখ, কপি ইত্যাদি বেশ বিক্রি হচ্ছে। ভাগে চল্লিশ টাকার কম পড়বে না।

ডক্টর মেহরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — এতেই আপনার চলে যায়?

প্রেমশংকর — হ্যাঁ, খুব ভালোভাবেই চলে যায়। আমি এদের মতোই কাপড় ব্যবহার করি, এদের মতো খাবারই খাই, আর আমার অন্য কোনো নেশাও নেই। এখানে মাসে বিশ টাকা গরিব লোকের ওষুধের জন্য খরচ করা হয়। এই টাকা সকলের সম্মিলিত আয় থেকে আলাদা করে রাখা হয়। কারও কোনো আপত্তি হয় না। এই যে সাইকেল দেখতে পাচ্ছেন এটাও সংযুক্ত আয় থেকে কেনা। যার প্রয়োজন হয় সে এটা ব্যবহার করে। আমাকে এরা সবাই বেশি দক্ষ বলে মনে করে আর পুরোপুরি বিশ্বাস পরে। তাই আমি এদের 'মুখিয়া'। যে সব পরামর্শ দিই এরা মেনে চলে। কেউই এখানে এটা মনে করে না যে 'আমি অমুকের চাকর'। সবাই সবাইকে এখানে অংশীদার হিসাবে ভাবে আর প্রাণ ঢেলে কাজ করে। যেখানে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সেখানে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হয়। মালিক চায়, যত কাজ দেওয়া হবে তা করতে হবে; চাকর চায়, যত কম কাজ করা যায় তাই করব। এর মধ্যে সহৃদয়তা বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। সত্যি কথা বলতে কী, একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষময় পরিণাম আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি। মোটা ও রোগা লোকের পৃথক পৃথক শিবির তৈরি হয়েছে আর তাদের মধ্যে চলছে ঘোর সংগ্রাম। সময়ের বিচারে দেখা যাচ্ছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন এর জায়গা নেবে সমবায়। আমারা অন্যান্য দেশে এই আত্মঘাতী সংগ্রামের পরিণাম লক্ষ করেছি; এ জাতীয় কলহে আমাদের ঘৃণা জন্মে গেছে। সমবায়ই পারে এই সংকট থেকে আমাদের মুক্ত করতে।

ডক্টর — আচ্ছা, বলুন তো আপনি কি 'সোশ্যালিস্ট'?

প্রেমশংকর — না মশাই, আমি 'সোশ্যালিস্ট' কিংবা 'ডেমোক্র্যাট' কোনোটাই নই। আমি শুধু ন্যায় ও ধর্মের দীন সেবক। আমার কাছে নিঃস্বার্থ সেবা বিদ্যার চেয়ে বড়ো। আত্মিক কিংবা মানসিক শক্তির কথা বলুন, সম্পদ কিংবা বৈভবের কথা বলুন, আমি এদের কারও গোলামে পরিণত হতে চাই না। বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার উপর আমার বিশ্বাস নেই। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মিক উন্নতি আর আত্মিক উন্নতির প্রকাশ হল উদারতা, ত্যাগ, সদিচ্ছা, সহানুভূতি, ন্যায়পরতা ও দয়াশীলতা। যে শিক্ষা দুর্বলের উপর অত্যাচার শেখায়, যে শিক্ষা আমাদের জমি ও বিত্তের ভৃত্যে পরিণত করে, যে শিক্ষা মানুষকে ভোগবিলাসে মত্ত রাখে, যে শিক্ষা অপরের রক্ত চুষে মোটা হতে শেখায়, সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তি লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রভাবে পড়ে যায় তবে তা ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু বিদ্যা ও সভ্যতার পূজারিদের স্বার্থান্ধতা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মানুষ এখন বিদ্যা ও বুদ্ধিকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করার রাস্তায় পরিণত করেছে। বাস্তবে কিন্তু সেবা ও প্রেমের সোপান

বেয়েই সেখানে আরোহণ করতে হয়। কী অদ্ভুত অবস্থা! যিনি এখন যত বেশি বিদ্বান, তিনি তত বেশি স্বার্থান্বেষী। আমাদের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, আমাদের সমস্ত উৎসাহ-উদ্যম ধনলিপ্সা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের অধ্যাপকরা যদি এক হাজার টাকার কম বেতন পান তাহলে তাঁরা মুখ ভার করে রাখেন, আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মাসে দুহাজার টাকা আয় করেও হা-হুতাশ বন্ধ করেন না, আমাদের ডাক্তারবাবুরা চান, রোগী বাঁচুক মরুক তাঁদের 'ফিজ' পেতে যেন কোনো বাধা না হয়, আর আমাদের উকিলবাবুরা (ক্ষমা করবেন) ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করেন যাতে ঈর্ষাদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর তাঁরা সোনার দেওয়াল তুলতে পারেন। 'সময় সম্পদ' — আমরা এই বাক্যটিকে ঈশ্বরীয় বলে ধরে নিয়েছি। এই মহান পুরুষদের প্রত্যেকে শত-সহস্র-লক্ষ লোকের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছেন আর তবুও তাঁরা দেশপ্রেমিক হতে ব্যস্ত। এঁরাই স্বজাতিপ্রেমের ডঙ্কাধ্বনি করে বেড়ান। উৎপাদনের দায় অন্যের, ঘাম ঝরাবে অন্য লোক, আর গোঁফে তা দিয়ে ভোগ করার অধিকার ওঁদের। আমার মনে হয়, সমস্ত শিক্ষিত সমাজ শুধু অকর্মণ্যই নয়, অনাচারীও।

ডক্টর সাহেব খুব ধৈর্যের সঙ্গে বললেন — তা হলে আপনি কি চাইছেন আমরা সবাই মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করি?

প্রেমশংকর — আজ্ঞে না। যদি তাই হত তা হলে বোধ হয় সমস্ত মনুষ্যজাতিরই উপকার হত। আমার যা আপত্তি তা হল এই অবস্থার জন্য, এই অন্যায় প্রভেদের জন্য। একজন মজুর যদি পাঁচ টাকায় চালাতে পারে, তবে মানসিক শ্রম যাঁরা করেন তাদের এর থেকে দ্বিগুণ বা তিন গুণ আয় যথেষ্ট হওয়া উচিত, আর এই বেশিটুকু এইজন্য যে, তাঁদের একটু ভালো খাওয়া, একটু ভালো পোশাক একটু বেশি সুখসুবিধা দরকার। কিন্তু পাঁচ টাকা আর পাঁচ হাজার টাকা, কিংবা পঞ্চাশ টাকা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা? এই অস্বাভাবিক প্রভেদ কেন? এখানেই শেষ নয়। আমাদের সমাজ পাঁচ টাকা আর পাঁচ লাখ টাকার প্রভেদকেও অন্যায় বলে না, বরং তার আরও প্রশংসা করে। প্রশাসন, আইনব্যাবসা, চিকিৎসা, চিত্রকর্ম, শিক্ষা, দালালি, ব্যাবসা, সংগীত এবং এরকম আরও অনেক বৃত্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এঁরা কেউই নিজেরা ধনোপার্জনে নিযুক্ত নয়, এঁরা অন্যের শ্রমের উপর টিকে থাকে। আমি এটা বুঝতে পারি না যে, কী করে মানুষের শ্রম, মানুষের উদ্যোগ যা সম্পদ সৃষ্টি করে যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তা, যাঁরা শুধু মানসিক শ্রম করেন, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য বেশি বেশি অর্থোপার্জন করা, তাঁদের কাজ থেকে ছোটো কাজ হয়ে যায়। আজ যদি দেশের সমস্ত উকিল দেশ ছেড়ে চলে যায়, যদি সমস্ত মালিকশ্রেণী লুপ্ত হয়ে যায়, যদি সমস্ত দালাল স্বর্গলাভ করে, তাহলেও সংসার চলবে বরং আরও ভালোভাবেই চলবে। কৃষক জমি চাষ করবে; তাঁতি তাঁত বুনবে; ছুতোর, কামার, রাজমিস্ত্রি, মুচি সবাই আগের মতোই যার যার কাজ করতে থাকবে। তাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু কৃষাণ যদি না থাকে তবে সারা সংসার ক্ষুধায় যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়বে। অথচ এই কৃষাণের পাঁচ টাকা মজুরি অনেক বেশি বলে ধরা হচ্ছে আর উকিল ডাক্তারদের পাঁচ হাজারও বেশি নয়!

ডক্টর — অর্থশাস্ত্রে শ্রম বিভাজন (division of labour) বলে যে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার রয়েছে তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। প্রকৃতির নিয়মেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে আর শক্তির বিকাশের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেমশংকর — আমি তো একথা বলিনি যে প্রত্যেক মানুষকে মজুর-বৃত্তি করতে বাধ্য করা হোক। ভগবান যাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকুন, যিনি ভাবুক তিনি কাব্য রচনা করুন, যিনি অন্যায়কে ঘৃণা করেন তিনি আইনব্যাবসা নিয়ে থাকুন। আমার শুধু কথা হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে মানুষের আয়ের এই অসমতা থাকা উচিত নয়। মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে এই পার্থক্য ন্যায়বহির্ভূত ব্যাপার। অত্যাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ, আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় কাজের উপর প্রাধান্য পাবে — এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। কিছু কিছু শিক্ষিত লোক এই মত পোষণ করেন যে, এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে গুণীদের অনাদর হবে এবং সংসার তাঁদের বিচারশীলতা ও সৎকর্মের সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বড়ো বড়ো কবি, বড়ো বড়ো আবিষ্কারক, বড়ো বড়ো শিক্ষক সম্পদ ও প্রভুত্বের লোভ থেকে মুক্ত ছিলেন। আমাদের অস্বাভাবিক জীবনের এটাও এক কুফল যে, আমরা গায়ের জোরে কবি ও শিক্ষক বনে যাচ্ছি। পৃথিবীতে আজ অগণিত লেখক, উকিল ও শিক্ষক রয়েছেন। এঁরা সবাই পৃথিবীর উপর ভারস্বরূপ হয়ে রয়েছেন। যখন এদের হুঁশ হবে যে, এই সব 'দিব্য কলায়' কোনো লাভ নেই তখন শুধু তাঁরাই কবি হবেন যাঁরা কবি হবার যোগ্য। সংক্ষেপে আমি এটাই বলতে চাইছি যে, সম্পদের প্রাধান্য আমাদের সমাজকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

ডক্টর মেহরা অধীর হয়ে পড়েছিলেন। বললেন — মশাই, সমাজব্যবস্থার এই রূপ দেবলোকের পক্ষে উপযুক্ত হলেও পার্থিব জগতের পক্ষে অচল।

প্রেমশংকর — কেবল এই জন্যই বিত্তশালী, জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব এখনও টিকে রয়েছে। তবে এর আগেও এই প্রভুত্বে কয়েক বার আঘাত লেগেছে এবং লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে এই প্রভুত্বের পরাভব ঘটবে। এই পরাভব চূড়ান্ত রূপ নেবে। সমাজের চক্র সাম্য থেকে শুরু করে আবার সাম্যে পৌঁছেই থামবে। একাধিপত্য, বিত্তশালীদের প্রভুত্ব ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য এই চক্রের মধ্যবর্তী অবস্থা। বর্তমান চক্র তার মধ্যবর্তী অবস্থা পার হয়ে তার অন্তিম অবস্থার কাছাকাছি এসেছে বলা চলে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি অধিকারবোধ ও প্রভুত্বের মাদকতায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, আমরা অগ্রপশ্চাৎ কিছুই বিবেচনা করছি না। চারিদিক থেকে গণমানুষের কলরোল আমাদের কানে ভেসে আসছে, কিন্তু আমরা এতই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি যে, এই নির্ঘোষকে সাধারণ মেঘের গর্জন বলে ধরছি। আমরা এখনও পর্যন্ত সেই সব বিদ্যা ও বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি যে সব বিদ্যা ও বৃত্তির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অপরের শ্রমের উপর। আমাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, আমাদের উকিলদের দপ্তরে পা রাখার জায়গা হয় না, গলিতে গলিতে ফটোর স্টুডিয়ো খুলছে, ডাক্তারের সংখ্যা রোগীর সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, তবু আমাদের চোখ খুলছে না। এই অস্বাভিক জীবন থেকে, সভ্যতার এই জাল থেকে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টা আমরা করছি না। শহরে আমরা কারখানা খুলে বেড়াচ্ছি যাতে করে শ্রমিকের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে আমরা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারি। শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ ভাগ লাভের কল্পনায় আমরা আনন্দে ডগমগ করছি, কিন্তু এটা কখনও আমাদের চোখে পড়ছে না যে, শিক্ষিত ব্যাক্তিও তাঁত চালাচ্ছে কিংবা চাষ আবাদ করছে। যদি দুর্ভাগ্যবশত কাউকে এসব করতে হয় তবে তাকে আমরা উপহাস করি। আমরা তাকেই সম্মান প্রদর্শনের যোগ্য বিবেচনা করি যে

গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে থাকে, যাকে হাত-পা নাড়াতে হয় না, কেবল আদায়-পত্র আর সুদ-বাট্টার হিসাবে অসংখ্য লোককে জেরবার করে...!

এসব কথা চলছে এমন সময় দুর্গা মালি একটা ধামায় করে কমলালেবু, ফুলকপি, পেয়ারা, মটরশাক ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে এসে ডক্টর সাহেবের সামনে রাখল। দুর্গার চেহারায় একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল, তার অন্তরাত্মা জেগে উঠছে। সে ডক্টর সাহেবের সামনে একটা মোড়ার উপর বসে বলল — হুজুরের যে যে কলম দরকার সেগুলোর নাম একটা কাগজে লিখে বাবুজির কাছে দিয়ে যাবেন। আমি কাল আপনার বাড়ি পৌঁছে দেব। আপনার ছেলেপুলেরা ভালো আছে তো?

ডক্টর সাহেব একটু সংকোচের সঙ্গে বললেন — হাঁ, ছেলেরা ভালোই আছে। তুমি এখানে ভালো আছ তো?

দুর্গা — আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনার দয়ায় খুব আরামেই আছি।

ডক্টর সাহেব উঠে রওনা দিলেন। প্রেমশংকর তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য গেট পর্যন্ত গেলেন। ডক্টর সাহেব গাড়িতে উঠে মুচকি হেসে প্রেমশংকরকে বললেন — আমি কিন্তু আপনার নীতি মেনে নিতে পারলাম না। তবে আপনি যে একটা পশুকে মানুষে পরিণত করেছেন তাতে কোনো ভুল নেই। এটা আপনার সৎসঙ্গের ফল। তবে, ক্ষমা করবেন, আমি আবার বলছি, আপনি এর থেকে সাবধানে থাকবেন। 'ইউজেনিক্স' (সুপ্রজনন শাস্ত্র) আজ পর্যন্ত এমন কোনো আবিষ্কার করতে পারেনি যার দ্বারা মানুষ তার আজন্ম সংস্কার ভুলে যাবে!

(পশু সে মনুষ্য/১৯২০) অনুবাদ অমলকুমার রায়



ভগবানের সং

স্ত্রী

আমি যথার্থই অভাগিনী, তা না হলে কেন আমাকে রোজ রোজ এমন ঘৃণিত দৃশ্য দেখতে হবে! দুঃখের কথা হল, আমাকে যে শুধু দেখতে হয় তাই নয়, দুর্ভাগ্যবশত এসব ঘটনা আমার জীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে পড়েছে। আমি হলাম এমন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কন্যা যাঁর বিধান ধর্মের প্রধান প্রধান আর গভীর সব বিষয়ে সকলের উপর মান্য করা হয়। মনে হয় না আমাদের বাড়িতে কেউ কোনোদিন বিনা স্নানে কিংবা ঠাকুরের পুজো না করে এক ফোঁটা জল মুখে দিয়েছে। আমার মনে আছে একবার আমাকে কঠিন জ্বরের জন্য স্নানটান না করেই ওষুধ খেতে হয়। এর জন্য আমাকে মাসাবধি অনুশোচনা ভোগ করতে হয়েছিল। আমার ঘরে ধোপা ঢুকতে পারত না, চামারনি বারান্দাতে পর্যন্ত বসতে পারত না। কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হয় আমি এক পাপলোকে হাজির হয়েছি। আমার স্বামী বড়ো দয়ালু, খুবই চরিত্রবান ও অত্যন্ত সুযোগ্য পুরুষ। তাঁর এসব সদ্‌গুণ দেখে আমার বাবা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কী করে জানবেন এখানকার সবাই অঘোরপন্থী। সন্ধ্যা-পূজা তো দূরের কথা, কেউ নিয়মিত স্নানও করে না। বৈঠকখানায় সব সময় মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি সব জাতের লোক আসাযাওয়া করে আর আমার স্বামী সেখানে বসেই জল-দুধ-চা সব খান। শুধু তাই নয়, তিনি সেখানে বসেই মিষ্টিও খেয়ে নেন। এই গত কালের কথা, আমি তাঁকে লেমোনেড খেতে দেখেছি। চামার যে সইস সেও সেলাম ঠুকে ঘরে চলে আসছে। শুনছি, তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতেও যান। এই ভ্রষ্টাচার আর দেখতে পারি না। আমার মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে আছে। যখন তিনি হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে দেন তখন আমার মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হলে আমি তার ভিতর প্রবেশ করতাম। হায়, হিন্দু জাতি! তুমি আমাদের স্ত্রীদের পুরুষের দাসী বানিয়ে দেওয়াটাই আমাদের জীবনের পরম কর্তব্য বলে ঠিক করে দিলে। আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের ন্যায়নীতি, এমন কী, আমাদের ধর্মের পর্যন্ত কোনো মূল্য থাকল না।

এখন আর আমার ধৈর্য নেই। এখন আমি এই অবস্থার শেষ করে দিতে চাই। আমি এই আসুরিক পাপের জাল থেকে বেরিয়ে আসব। আমি আমার বাবার আশ্রয়ে ফিরে যাব বলে চিন্তা করছি। আজ এখানে সম্মিলিত ভোজ চলছে; আমার স্বামী যে শুধু এর সঙ্গে যুক্ত তাই নয়, তিনি এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণার জন্যই এমন ধর্মীয় অত্যাচার চলছে। সমস্ত জাতির লোক এক সঙ্গে বসে ভোজন করছে। শুনছি, মুসলমানরাও এক পঙক্তিতে বসেছে। আকাশ ভেঙে পড়ছে

না কেন? ভগবান কি ধর্ম রক্ষার্থে অবতার হয়ে অবতীর্ণ হবেন না? ব্রাহ্মণরা নিজের বন্ধু ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণের হাতের রান্নাও গ্রহণ করেন না। সেই মহান জাতির আজ এই অধোগতি হয়েছে যে কায়স্থ, বানিয়া, মুসলমান কারও সঙ্গে বসে খেতে তার লেশমাত্র সংকোচ হচ্ছে না, বরঞ্চ এ ব্যবস্থাকে জাতীয় গৌরব, জাতীয় একতার হেতু বলে মনে করছে।

পুরুষ

কবে সেই শুভ দিনের আবির্ভাব হবে যেদিন এই দেশের নারীর মধ্যে জ্ঞানের উদয় হবে আর তারা রাষ্ট্রগঠনের কাজে পুরুষদের সহায়তা করবে? আমরা কত দিন আর ব্রাহ্মণদের গোলোকধাঁধায় ঘুরে মরব? আমাদের বিবাহনীতি কবে এই সত্য উপলব্ধি করবে যে, স্ত্রী ও পুরুষের মতের সাযুজ্য ও সমতা গোত্র ও বর্ণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি তা জানা থাকত তাহলে আমিও বৃন্দার স্বামী হতাম না আর বৃন্দাও আমার স্ত্রী হত না। আমাদের দুজনের চিন্তায় আকাশপাতাল ফারাক। যদিও সে মুখে কিছু বলে না, তবু আমার বিশ্বাস, সে আমার মতামতকে ঘৃণার চোখেই দেখে। আমার মনে হয় যে, সে আমাকে স্পর্শ করতে পর্যন্ত চায় না। এটা তার দোষ নয়; এ দোষ আমাদের মা-বাবার, যাঁরা আমাদের দুজনের উপরই ঘোর অবিচার করেছেন।

বৃন্দা কাল মুখ খুলেছিল। আমার কয়েকজন বন্ধু সম্মিলিত ভোজের প্রস্তাব করলে আমি সানন্দে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম। কয়েকদিন বাদানুবাদের পর গতকাল কয়েকজন ভদ্রলোক ভোজের ব্যবস্থা করলেন। আমি ছাড়া আর মাত্র চার জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, বাকি সব অন্য জাতের লোক। এই উদারতা বৃন্দার কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। যখন আমি খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরলাম তখন সে এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, মনে হয়েছিল আঘাত তার মর্মস্থলে গিয়ে লেগেছে। আমার দিকে বিষাদময় চোখে চেয়ে সে বলল — এখন তো তাহলে স্বর্গের দ্বার অবশ্যই খুলে গিয়ে থাকবে!

এই কঠোর বাক্য আমার বুকে গিয়ে তিরের মত বিঁধল। বিরক্ত হয়ে বললাম — স্বর্গ-নরকের চিন্তা নিয়ে তারাই থাকে যারা পঙ্গু, কর্তব্যহীন, নির্জীব। আমাদের স্বর্গ-নরক সব এই পৃথিবীতেই। আমি এই কর্মক্ষেত্রে কিছু করে যেতে চাই।

বৃন্দা — ধন্য আপনার পৌরুষ আর সামর্থ্য। পৃথিবী এখন সুখ আর শান্তির রাজত্ব হয়ে যাবে। আপনিই পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। এর থেকে বেশি আর কী কল্যাণ আশা করা যায়!

আমি রাগতভাবে বললাম — যখন ভগবান তোমাকে এসব ব্যাপার বোঝবার মতো বুদ্ধিই দেননি, তখন আমি আর কী বোঝাব? জাতপাতের এই বিভেদভাব থেকে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তার কথা তো অত্যন্ত মোটা বুদ্ধির লোকও বুঝতে পারে। এসব বিভেদ দূর করতে পারলে যে দেশের কল্যাণ হয়, এতে কারও সন্দেহ নেই। তবে, হ্যাঁ, যে জেনেশুনে না জানার ভান করে তার কথা আলাদা।

বৃন্দা — একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া না করলেই কি ভালোবাসা জন্মায় না?

এই বিবাদে জড়ানো আমি সঠিক মনে করলাম না। এমন নীতি গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় মনে হল যাতে কোনো রকমেরই বিবাদের স্থান না থাকে। ধর্মের উপর বৃন্দার খুব শ্রদ্ধা। আমি তাকে তার

শাস্ত্র দিয়েই পরাজিত করব বলেই স্থির করে ফেললাম। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললাম — যদি অসম্ভব নাও হয়, কঠিন তো বটেই। কিন্তু ভেবে দেখ তো, এটা কি ঘোর অন্যায় নয় যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান হয়েও একে অন্যকে ঘৃণা করছি, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নিয়ে মেতে আছি। এই জগৎসংসার সেই পরম পিতার বিরাট প্রকাশ। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সেই পরমাত্মার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই পার্থিব ব্যবধানই কেবল আমাদের এক জনের কাছ থেকে আর এক জনকে পৃথক করে রেখেছে। বাস্তবে আমরা সবাই এক। যেমন সূর্যের আলো ভিন্ন ভিন্ন গৃহে প্রবেশ করলেই ভিন্ন হয়ে যায় না, সেই রকম ঈশ্বরের মহান আত্মা পৃথক পৃথক জীবে প্রকাশ করেও পৃথক পৃথক হয়ে যায় না...

আমার এই জ্ঞানবর্ষণ বৃন্দার শুষ্ক হৃদয়কে তুষ্ট করল। সে তন্ময় হয়ে আমার কথা শুনছিল। যখন আমি থামলাম তখন সে আমার দিকে ভক্তিভরা চোখে চেয়ে কাঁদতে লাগল।

স্ত্রী

স্বামীর জ্ঞানোপদেশ আমাকে সজাগ করে দিয়েছিল। আমি অন্ধকার কূপে ডুবে ছিলাম। এই উপদেশ আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে এক পর্বতের জ্যোতির্ময় শিখরে বসিয়ে দিল। আমার কৌলীন্যের জন্যে, মিথ্যা অভিমানের বশে, আমার উচ্চবর্ণের পবিত্রতার অহংকারে কত লোককেই না আমি অনাদর করেছি! পরমপিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এই অজ্ঞানতার জন্য আমি আমার পূজনীয় স্বামীকে অশ্রদ্ধা করেছি, তাঁকে কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছি — আমার এসব অপরাধ ক্ষমা করো।

যখন থেকে এই অমৃতবাণী আমি শ্রবণ করেছি আমার হৃদয় অত্যন্ত কোমল হয়ে গিয়েছে। নানা প্রকার সৎ কল্পনা আমার মনে উদয় হচ্ছে। ধোপানি কাল কাপড় নিয়ে এসেছিল, তার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি তাকে এই অবস্থায় আগে দেখলে কদাচিৎ মৌখিক সমবেদনা দেখাতাম কিংবা ঝিকে বলে দিতাম তাকে একটু তেল দেবার জন্যে। কিন্তু কাল আমার বন ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, সে যেন আমারই বোন। তাকে আমার পাশে বসিয়ে নিয়ে আমি তার মাথায় ঘন্টা খানেক তেল মালিশ করলাম। সে সময় আমি যে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার মন কোনো এক প্রবল শক্তির বশীভূত হয়ে কেবল তারই দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আমার ননদ এসে আমার এই ব্যবহার দেখে একটু বাঁকা মন্তব্যও করল, কিন্তু আমি তাতে লেশমাত্রও ঘাবড়ালাম না। আজ সকালে অত্যন্ত ঠান্ডা পড়েছিল। হাত-পা সব জমে যাচ্ছিল। ঝি কাজ করতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। আমি একটা চাদর গায়ে দিয়ে মালসাতে আগুন পোয়াচ্ছিলাম। তবু চাদরের ভিতর থেকে বাইরে মুখ বের করতে পারছিলাম না। ঝি-র অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ হল। আপন স্বার্থচিন্তায় লজ্জা হল। ঝি আর আমার মধ্যে কীসের প্রভেদ! তার আত্মাতেও সেই একই জ্যোতির প্রকাশ। কেন এই অন্যায়? মায়া আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে বলেই কী? অন্য আর কিছু চিন্তা করার সাহস আমার হল না। আমি উঠে আমার তুষের চাদর ঝি-র গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তার হাত ধরে তাকে আগুনের মালসার পাশে বসিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার রেজাই খুলে রেখে ঝি-র সঙ্গে বসে বাসন মাজতে শুরু করে দিলাম। সেই সরলহৃদয় মেয়ে আমাকে বারবার সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে চাইছিল। আমার ননদ এসে আমাকে

কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল, ভাবটা এমন যেন আমি মজা করছিলাম। সারা বাড়িতে হইচই পড়ে গেল, আর তা কি না এই সাধারণ ব্যাপার নিয়ে! আমাদের চোখের উপর কত পুরু আবরণ পড়ে গিয়েছে, আমরা পরমাত্মার কী অপমানই না করছি।

পুরুষ

মধ্যপন্থা গ্রহণ করা কখনও নারীপ্রকৃতির ধর্ম নয়। নারী সব সময় চরম পন্থাই নিয়ে থাকে। যে বৃন্দা তার কৌলীন্য আর কুলমর্যাদার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সেই এখন সাম্য আর সহৃদয়তার মূর্ত বিগ্রহ। আমার এই সামান্য উপদেশের এই আশ্চর্য ফল! এখন আমিও আমার ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতে সমর্থ। বৃন্দা যে এখন নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসেছে, হাসছে ও কথা বলছে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তাদের সে কিছু কিছু পড়েও শোনাচ্ছে। ভালো কথা। কিন্তু তাদের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ হওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করতে পারছি না। তিন দিন হল আমার কাছে এক চামার এসেছিল জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ দায়ের করতে। আমি নিঃসন্দেহ যে জমিদার তার উপর জুলুম করেছিল; কিন্তু উকিলদের কাজ তো আর বিনা পয়সায় মোকদ্দমা করা নয়! তার উপর আবার এক চামারের জন্য এক বড়ো জমিদারকে শত্রু বানানো! এভাবে তো ওকালতি চলে না। লোকটার কান্নার আওয়াজ বৃন্দার কানে গিয়েও পৌঁছল। আর যাবে কোথায়, সে নাছোড়বান্দা যাতে আমি ওই মামলা তক্ষুনি নিয়ে নিই। সে আমার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করতেও তৈরি হয়ে গেল। আমি বাহানা করে কোনো রকমে তাকে নিরস্ত করতে চাইলাম, কিন্তু সে আমাকে ওকালতনামায় সই করিয়েই ছাড়ল। তার পরিণাম এই হল যে, পরপর তিন দিন আমার এখানে বিনাপয়সার মক্কেলের ভিড় লেগে রইল আর আমারও বেশ ক-বার বৃন্দার সঙ্গে কটু বাক্য ব্যবহার করে কথা বলতে হল। এই জন্যই প্রাচীন কালের বিধানদাতারা স্ত্রীজাতিকে ধর্মোপদেশের পাত্রী বলে মনে করতেন না। এদের মাথায় এটা আসে না যে, প্রত্যেক নীতিরই একটা ব্যবহারিক দিক রয়েছে, যা একটু ভিন্ন। আমরা সবাই জানি যে ঈশ্বর ন্যায়শীল; কিন্তু তাই বলে ন্যায়ের জন্য কে আর নিজের অবস্থা ভুলে যায়! আত্মার ব্যাপকতাকে যদি ব্যবহারিক জীবনে মেনে নেওয়া যায় তাহলে তো আজই পৃথিবীতে সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু সাম্য হল দর্শনের একটা নীতিজ্ঞান, আর তা তেমনই থাকবে। ঠিক একই রকম, রাজনীতিও এক অলভ্য বস্তু, থাকবেও তাই। আমরা এই দুই নীতিকেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করব; তা নিয়ে আলোচনাও করব; নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে এগুলোর সাহায্যও নেব, কিন্তু তার প্রয়োগ অসম্ভব। আমি বুঝতে পারি নি যে, বৃন্দা এই সাদামাটা কথাটাও বুঝতে পারবে না।

বৃন্দার বুদ্ধি দিন দিন উলটো হয়ে যেতে শুরু করেছে। আজ রান্নাঘরে সকলের জন্য একই রকম রান্না হয়েছে। এত দিন বাড়ির লোকের খাবার জন্য মিহি চাল রান্না করা হত, তরকারি ঘি দিয়ে তৈরি করা হত এবং তাদের জন্য ঘি-দুধের বরাদ্দও থাকত। চাকরদের জন্য মোটা চাল, মটরের ডাল আর তেল দিয়ে তরকারি রান্না হত। বড়ো বড়ো ধনী লোকের বাড়িতেও এই প্রথা চলে আসছিল। আমার চাকররা কখনও এই ব্যাপার নিয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। কিন্তু আজ দেখছি সবার জন্যই একরকম রান্না করিয়েছে। আমি কিছু বলতে পারলাম না, কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে

গিয়েছিলাম। বৃন্দা হয়তো ভেবে থাকবে যে, খাবার ব্যাপারে ভেদাভেদ করার অর্থ চাকরদের উপর অন্যায় করা। কী রকম বাচ্চা ছেলের মতো চিন্তাভাবনা। একেবারে বুদ্ধিহীন। এই পার্থক্য বরাবর ছিল, এখনও থাকবে। আমিও জাতীয় ঐক্য চাই। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয়তা করে করে প্রাণ দিচ্ছে, কিন্তু মজদুর ও চাকরবাকরের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ স্বার্থও লোপ করছে না। আমরা তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাই, দীন অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাই। এই হাওয়া সারা পৃথিবী জুড়েই বইছে। তবে এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ কি তা মনে মনে অনুভব করলেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছে না। এসবের উদ্দেশ্য হল এই যে, এতে আমাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, আমাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, আমাদের জাতীয় আন্দোলন জোরদার হয়, আমাদের একথা বলার অধিকার জন্মায় যে, আমাদের বক্তব্য শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের নয় বরং সমস্ত জাতির সকলের কথাই এখানে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু বৃন্দাকে এই রহস্যের কথা কে বোঝাবে?

স্ত্রী

কাল আমার স্বামীদেবতা খোলাখুলি সব বললেন। এজন্য আমার মন খারাপ হয়ে আছে। হায় ভগবান! সংসারে এত জাঁকজমক, এত স্বার্থান্ধতা, আমাদের হাতে গরিবরা এত মার খায়! স্বামীর উপদেশ শুনে আমি তাঁকে দেবতুল্য ভাবতে শুরু করেছিলাম। আজ আমার জ্ঞান হয়েছে যে, যারা একই সঙ্গে দু-নৌকোয় পা রেখে চলতে পারে তাদেরকেই জাতির হিতৈষী বলা হয়।

কাল ছিল আমার ননদের বিদায়ের দিন। সে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। এই উপলক্ষে সমাজের বেশ কয়েকজন মহিলা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা দামি দামি শাড়ি গয়না পরে কার্পেটের উপর বসে ছিলেন। আমি তাঁদের অভ্যর্থনা করছিলাম। আমি দেখলাম, দরজার কাছে যেখানে ওই মহিলাদের জুতোচটি রয়েছে সেখানে কয়েকজন স্ত্রীলোক বসে আছে। সেই বেচারারাও বিদায়যাত্রা দেখতে এসেছিল। ওরা ওখানে বসে থাকবে, এটা আমার ভালো লাগেনি। আমি ওদের এনে কার্পেটের উপর বসিয়ে দিলাম। এই নিয়ে ওই মহিলাদের মধ্যে ইশারা শুরু হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনো না কোনো ছুতো করে প্রত্যেকেই উঠে চলে গেলেন। আমার স্বামীকে কেউ এই সংবাদ দিলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে বাইরে থেকে এসে চোখ লাল করে বললেন — তুমি এসব কী করছ, তুমি কি আমার মুখে কালি দিতে চাও? কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়, এই বুদ্ধিটুকুও কি ভগবান তোমাকে দেন নি? ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে ছোটোজাতের মেয়েছেলেদের বসিয়ে দিয়েছ? তারা মনে মনে কী ভাববে? তুমি আর আমার মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না? ছিঃ ছিঃ!

আমি সরলভাবে বললাম — এতে মহিলাদের কী অপমান হল? আত্মা তো সবারই এক। অলংকার পরলে তো আর আত্মা উন্নত হয়ে যায় না!

স্বামী ঠোঁট কামড়ে বললেন—চুপ করো তো। উলটো-পালটা কথা বলতে শুরু করেছ। ওই এক কথা। আত্মা এক, পরমাত্মা এক! কিছু জানও না, কিছু বোঝও না। সারা শহরে ঢিটি পড়ে গিয়েছে। তারপরও আবার কথা বলছ। একবার ভেবে দেখেছ কি ওই মহিলাদের আত্মা কতটা ব্যথিত হয়েছে?

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম।

আজ সকালে উঠেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। অতিথিদের এঁটো পাতা, ভাঁড়, ঠোঙা ইত্যাদি রাত্রে মাঠে ফেলা হয়েছিল। জন পঞ্চাশেক মানুষ ওইসব এঁটো জিনিসের উপর হামলে পড়ে সেগুলো চাটছিল। হ্যাঁ, মানুষ, যে মানুষ, যে মানুষ পরমাত্মার স্ব-স্বরূপ। কতগুলো কুকুরও ওই পাতার উপর গিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল, কিন্তু ওই মানুষগুলো কুকুরগুলোকে মেরে মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তাদের অবস্থা ছিল কুকুরগুলোর চেয়েও হীন। এই ব্যাপার দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল; আমার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। ভগবান! এরাও আমাদের ভাইবোন, আমাদের আত্মা! এদের এই শোচনীয় দীন দশা! আমি তক্ষুনি ঝিকে দিয়ে ওই মানুষগুলোকে ডেকে পাঠালাম আর যত পুরি মিষ্টি অতিথিদের জন্য রাখা হয়েছিল সব পাতায় ভাগ করে তাদের দিয়ে দিলাম। ঝি দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল। সে এই জন্যে কাঁপছিল যে, বাবু শুনলে আর তাকে আস্ত রাখবে না। আমি তাকে আশ্বাস দিলে পরে সে শান্ত হল।

ওই কাঙালরা তখনও বসে খাচ্ছে এমন সময় পতিদেবতা মুখ লাল করে এসে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন—তুমি নেশা করনি তো? একটা না একটা উপদ্রব তো লাগিয়েই রেখেছে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা তোমার কী হয়েছে। এসব মিষ্টি হাড়ি-ডোমদের জন্যে বানানো হয়নি। এসব তৈরি করতে ঘি, চিনি, ময়দা লেগেছে আর তুমি সব নিয়ে এসে ডোমদের খাইয়ে দিলে। এখন অতিথিদের কী দেওয়া হবে? তুমি কি আমার মানমর্যাদা সব নষ্ট করবার জন্য পণ করে বসেছ?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—আপনি মিছিমিছি এত রাগ করছেন। আপনার যত মিষ্টি আমি ওদের খাইয়েছি তা আমি আনিয়ে দেব। কেউ মিষ্টি খাবে আর কেউ এঁটো পাতা চাটবে এটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ডোমরাও তো মানুষ। এদের মধ্যেও তো সেই একই...

আমার স্বামী কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন—ছাড় এসব কথা, রাখ তোমার আত্মা। তুমি রক্ষা করলেই আত্মা রক্ষা পেয়ে যাবে? ভগবানের যদি সে ইচ্ছে থাকত যে, প্রাণীমাত্রেরই সমান সুখভোগ হবে, তাহলে সবারই এক অবস্থা করে দিতে তাঁকে কে বাধা দিয়েছিল? উচ্চনীচের ভেদাভেদ হতেই বা তিনি দিচ্ছেন কেন? যখন তাঁর আদেশ ছাড়া একটা পাতাও নড়তে পারে না, তখন এই মহান সামাজিক ব্যবস্থা তাঁর আদেশ ছাড়া কি করে ভাঙা সম্ভব? তিনি নিজে যখন সর্বব্যাপী তখন কেনই বা তিনি নিজেকে এমন ঘৃণ্য অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছেন? যখন তুমি এসমস্ত প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারবে না তখন তো সংসারের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চলাই তোমার উচিত। এসব মাথামুন্ডুহীন কথায় হাসি অথবা নিন্দা ছাড়া আর কোনো কিছু লাভ হয় না।

আমার মনের অবস্থা কী হল তার আর বর্ণনা করে কী বোঝাব! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হায় স্বার্থ! হায় মায়ান্ধকার! ভগবানকে আমরা সং বানিয়ে তুলেছি।

সেই মুহূর্তেই পতিশ্রদ্ধা বা পতিভক্তির ভাব আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেল। এই বাড়ি আমার কাছে কারাগার তুল্য। কিন্তু আমি নিরাশ হইনি। আমার বিশ্বাস, আজ হোক কিংবা কাল হোক, ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ এখানে অবশ্যই দেখা যাবে এবং তার প্রভায় এই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

(ব্রহ্ম কা স্বাঁগ/১৯২০) অনুবাদ অমলকুমার রায়

ঝগড়ার শেষ

জোখু ভগত আর বেচন চৌধুরিতে তিন পুরুষের শত্রুতা। এক চিলতে আল-জমি নিয়ে সামান্য ঝগড়া ছিল। তাই নিয়ে ঠাকুরদাদার আমলে খুনখারাপিও হয়ে গেছে কয়েকবার। বাপের আমলে চলেছে মামলা-মোকদ্দমা, দুপক্ষই বেশ কয়েকবার দৌড়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত। ছেলেদের জমানায় সেই লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়েছে আরও বহুগুণ। পরে অবস্থা এমন হল যে দুপক্ষেরই আর লড়বার ক্ষমতা রইল না। একদিন এই দুই পরিবার ছিল বলতে গেলে সমস্ত গ্রামটারই আধাআধি বখরাদার আর আজ যে আলটুকু নিয়ে ঝগড়া তার দুপাশের খেত ছাড়া একখানি জমিও নেই কারও। জোতজমি গেছে, ধনসম্পদ গেছে, মানমর্যাদা সব গেছে, তবু বিবাদ যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হাইকোর্টের ধুরন্ধর বিচারকও এই মামুলি ঝগড়াটার নিষ্পত্তি করতে পারেননি।

দুপক্ষকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রামটাই মোটামুটি দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদলের সিদ্ধি-ভাঙ-এর আড্ডা বসে চৌধুরির ঘরের দাওয়ায়, অপর দল ভগতের ঘরের চৌহদ্দিতে দল বেঁধে দম দেয় গাঁজায়। ভাগাভাগি হয়ে গেছে মেয়েদের আর বাচ্চাদের মধ্যেও। এতদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা যে, উভয় দলের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার বিচারেও একটা সুস্পষ্ট বিভাজন হয়ে গেছে। চৌধুরি কাপড়চোপড় পরেই ছাতু খেতে বসে যান, ভগতকে উপহাস করে বলেন লোক দেখানো ভণ্ড। ভগত কিন্তু কাপড় না ছেড়ে কিছুতেই ছোঁবেন না খাবার। চৌধুরিকে বলেন ভ্রষ্টাচারী। ভগত সনাতন ধর্মে অন্ধ বিশ্বাসী, চৌধুরি নাম লিখিয়েছেন আর্যসমাজে। এমনকী, চৌধুরি যে কাপড়ওয়ালা, সবজিওয়ালা বা মুদির কাছে সওদা করেন, সেদিকে তাকানো পর্যন্ত মহাপাপ মনে করেন ভগত। তেমনি ভগতজি যে ময়রার কাছে মিষ্টি, যে গোয়ালার কাছে দুধ ও যে তেলির কাছে তেল কেনেন, চৌধুরির কাছে তারা অস্পৃশ্য।

এমনকী, দুই পরিবারের রোগারোগ্যের প্রশ্নেও বহাল ছিল এই বিদ্বেষ-চিন্তা। ভগতজি কোবরেজি মতে বিশ্বাসী, চৌধুরির আস্থা য়ুনানি প্রক্রিয়ায়। বরং অসুখ করে মরে যাবে রোগী, তবু দুজনের কেউই গোঁ ছাড়বেন না।

দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল, তার উত্তাপ এসে লাগল এই ছোট্ট গ্রামেও। চৌধুরি আন্দোলনের পক্ষে কাজ করতে লাগলেন, ভগত রয়ে গেলেন বিপক্ষে। গ্রামে কিষান সমিতি প্রতিষ্ঠা হল, চৌধুরি ভিড়ে গেলেন তাতে। ভগত থাকলেন আলাদা। সচেতন হল মানুষ, স্বরাজ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলতে লাগল। চৌধুরি স্বরাজবাদীদের দলে যোগ দিলেন, ভগত পক্ষ নিলেন রাজভক্তদের। চৌধুরির বাড়িটা স্বরাজবাদীদের আড্ডা হল, ভগতের বাড়িটা হল রাজভক্তদের ক্লাব।

চৌধুরি জনসাধারণের কাছে প্রচার শুরু করে দিলেন স্বরাজ সম্বন্ধে—বন্ধুগণ, স্বরাজ কথাটার অর্থ হল নিজেদের রাজত্ব। নিজের দেশে নিজের রাজত্ব, নিজের শাসন থাকবে সেটাই তো ঠিক, না কী অন্যের রাজত্ব, অন্যের শাসন?—'নিজের রাজত্ব চাই, নিজের রাজত্ব!' ধ্বনি উঠল জনতার মধ্যে থেকে।

চৌধুরি—কিন্তু স্বরাজ আসবে কী ভাবে? একে আনতে গেলে চাই আত্মবল, চাই পুরুস্কার, চাই ঐক্য। পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বদ্বেষ সবাই ভুলে যাও, নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটিয়ে নাও।

একজনের মন্তব্য—আপনি নিজেই তো রোজই ছোটেন আদালতে!

চৌধুরি—হ্যাঁ, তা ছুটি। তবে আজ থেকে আর যদি ওমুখো হই তবে যেন গোহত্যার পাপ লাগে আমার। সবাই রোজগার করে আপন আপন বউবাচ্চাদের খাওয়াও পরাও আগে, তারপর সম্ভব হলে পরোপকার করো। উকিল-মোক্তারের পকেট ভারী করে কী হবে? দারোগাকে ঘুষ দেবে কেন, আর আমলাদেরই বা তোষামোদি করতে যাবে কেন?—আগে আমাদের ছেলেরা ধর্মশিক্ষা পেত, সদাচারী, ত্যাগী, উদ্যোগী পুরুষ হয়ে গড়ে উঠত তারা। আজকাল সব ম্লেচ্ছ মাদ্রাসায় পড়তে যাচ্ছে, তারপর চাকরি করছে, ঘুষ নিচ্ছে, ফুটানি ওড়াচ্ছে। নিজের বাপ-পিতেমো, ঠাকুর-দেবতাদের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে, মুখে কালি মাখাচ্ছে। সিগারেট টানছে, বাহার করে চুল ছাঁটছে, আর সায়েবসুবোদের তোষামোদ করছে। এই সমস্ত ছেলেপুলেদের ধর্মপথে শিক্ষা দেওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়?

জনতা—চাঁদা তুলে একটা পাঠশালা চালু করা হোক।

চৌধুরি—আগে আমরা মদ স্পর্শ করাও পাপ মনে করতাম। আর এখন গাঁয়ে গাঁয়ে, অলিতেগলিতে, মদের দোকান ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা কোটি কোটি টাকা আমরা মদে-গাঁজায় উড়িয়ে দিচ্ছি।

জনতা—মদ-গাঁজা যার ছোঁবে তাদের জরিমানা করা উচিত।

চৌধুরি—আমাদের বাপঠাকুরদা চিরটাকাল ঘরে-বোনা মোটা খদ্দর পরে এসেছেন। আমার ঠাকুরমা নিজে হাতে চরকা কাটতেন। দেশের টাকা দেশেই থাকত। আমাদের তাঁতি ভাইয়েরা খেয়েপরে বাঁচত। আজকাল আমরা রঙদার বিলিতি কাপড়ের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছি। এই ভাবে বিদেশিরা আমাদের সমস্ত সম্পদ লুটে নিচ্ছে। হতভাগ্য তাঁতিরা দিনকে দিন আরও গরিব হয়ে পড়ছে। আমরা কি নিজের ভাইয়ের ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে বিদেশিদের বিলিয়ে দেব? এটাই কি আমাদের ধর্ম?

জনতা—ঘরে-কাটা খদ্দর আর চোখে পড়ে না আজকাল।

চৌধুরি—ঘরে ঘরে চরকা কেটে খদ্দর বুনে পরো সবাই। আদালত বর্জন করো, নেশা-ভাঙ করা ছেড়ে দাও, ছেলেপিলেদের ধর্মশিক্ষা দাও, পরস্পর মিলেমিশে থাকো সবাই। এই তো স্বরাজ। যারা বলে স্বরাজ আনতে রক্তের নদী বহাতে হবে তারা পাগল। ওদের কথায় কান দিয়ো না।

জনতা এই সমস্ত কথা খুব মন দিয়ে শুনত। দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকলে শ্রোতার সংখ্যা। চৌধুরিকে শ্রদ্ধা করতে লাগল সবাই।

ওদিকে ভগত ছড়িয়ে চলল রাজভক্তির উপদেশ—ভাইসব, রাজার কাজ রাজত্ব করা আর প্রজার কাজ রাজার আজ্ঞা পালন করা। একেই বলে রাজভক্তি। আমাদের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে

এই কথাই বলা হয়েছে। রাজা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কাজেই তাঁর আজ্ঞার বিরোধী হওয়া মানে মহাপাতক হওয়া। রাজদ্রোহীদের স্থান হয় নরকে।

একজন বলে উঠল—কিন্তু রাজারও তো উচিত নিজের ধর্ম ঠিকমতো পালন করা।

আরেকজন—আমাদের রাজা তো নামমাত্র, আসল রাজ হচ্ছে বিলেতের বানিয়া মহাজনেরা।

তৃতীয়জনের মন্তব্য—বানিয়া জানে শুধু টাকা কামাতে। রাজত্বের কী বোঝে ওরা?

ভগত—লোকে তোমাদের বোঝাচ্ছে যে আদালতে যেয়ো না, সব ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা কর পঞ্চায়েতে গিয়ে। কিন্তু এমন মোড়ল কোথায় আছে যে ন্যায় বিচার করে, দুধ থেকে জলকে আলাদা করে দিতে পারে? ওখানে কাজ হয় মুখ চিনে। যার খুঁটির জোর আছে সেই জেতে। যার জোর নেই সে বরাবরই হারে। কিন্তু আদালতে সবকিছুই চলে আইন মোতাবেক। সেখানে ছোটোবড়ো সবাই সমান, বাঘ-ছাগলকে একই ঘাটে জল খেতে হয়।

একজন আশঙ্কা প্রকাশ করল—আদালতের ন্যায়বিচার মুখেই। যার প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, টাকা আছে, প্যাঁচানো বুদ্ধিতে ওস্তাদ উকিল আছে, সেই জেতে। সত্যিমিথ্যের বিচার কেউ করেন না। তবে হ্যাঁ, হয়রানিটা ঠিকই হয়!

ভগত—বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে এ হবে চরম অন্যায়। বাজারে আমি যে জিনিসটা ভালো আর সস্তা পাব সেটাই নেব, তা সে স্বদেশি বিদেশি যাই হোক না কেন! আমাদের পয়সা তো আর উড়ে আসে না যে মুঠো মুঠো খয়রাত করব আজেবাজে স্বদেশি জিনিসের পেছনে!

একজন—কিন্তু পয়সা তো নিজের দেশেই থেকে যাচ্ছে। অন্যের হাতে তো আর যাচ্ছে না।

অন্যজন—নিজের বাড়িতে ভালোমন্দ খেতে পাই না বলে বেজাতের কাছে পাত পাড়তে হবে নাকি?

ভগত—তোমাদের শেখানো হচ্ছে ছেলেপুলেদের সরকারি মাদ্রাসায় পাঠিয়ো না। সরকারি মাদ্রাসায় না পড়লে আমাদের ভাইরা বড়ো বড়ো চাকরি পাবে কী ভাবে? বড়ো বড়ো কারখানা চালাতে শিখবে কী ভাবে? এই জগতে নতুন নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করতে না পারলে চলা শক্ত, পুরনো বিদ্যেতে শুধুমাত্র পাঁজি দেখা আর পুজোপাঠ ছাড়া আর কোন কাজটা হয় শুনি? ওদের দিয়ে আবার রাজকাজ হবে?

জনৈক—রাজকাজে প্রয়োজন নেই আমাদের। চাষাবাদ নিয়ে বেশ আছি আমরা, কারও গোলাম তো আর নই।

অন্যজন—যে বিদ্যা অহংকারী করে, তার চাইতে মূর্খতা ঢের ভালো। নতুন কেতার বিদ্যা শিখে সুট-বুট, ঘড়ি-ছড়ি, হ্যাট-কোট পরে বেড়াচ্ছে, শখ মেটাবার নামে নিজের দেশের ধনদৌলত সব তুলে দিচ্ছে বিদেশি বানিয়াদের পকেটে। ওরা সব দেশদ্রোহী।

ভগত—আজকাল লোকে গাঁজা-মদের প্রতি নজর রাখছে। নেশা যে কত ক্ষতিকারক তা সবাই জানে। অথচ নেশার জিনিসের দোকানগুলো থেকে সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব পায়। —মদের দোকানে না গিয়ে যদি লোকের নেশার অভ্যাস চলে যায় তবে তো তা ভালোই।—কিন্তু মতি কি অত সহজে পালটায়? দোকানে না গেলেও তারা দু-চারগুণ বেশি দাম দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে নেশা করবেই। সাজা দাও, তবু পরোয়া নেই, নেশা ছাড়বে না।—তাহলে এমন কাজ কেন

করব যাতে সরকারেরও লোকসান হয়, আবার গরিব প্রজাদেরও ক্ষতি হয়? তাছাড়া কারও কারও ক্ষেত্রে নেশাটা যথেষ্ট দরকারিও বটে। আমি তো আফিম না খেয়ে একটা দিনও থাকতে পারি না। গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়, দম আটকে আসে, একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়।

একজন বলে উঠল—তাছাড়া মাল টানলে শরীরে ফূর্তিও আসে।

সরকার অধর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, এটা ভালো কথা নয় মোটেই। এমনতরো অধর্ম চলতে থাকলে সে রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণ হতে পারে কখনো?—আশঙ্কা প্রকাশ করল একজন।

প্রথমে মদ খাইয়ে খাইয়ে মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে। নেশা একবার ধরে গেলে তখন প্রয়োজন হয় অর্থের। কিন্তু এত পয়সা আর কজন কামায় যাতে বউ-বাচ্চাকে খাইয়ে-পরিয়েও নেশা ভাঙ করার পয়সা হাতে থাকে? তখন হয় ছেলেপিলেকে শুকিয়ে মারো, আর নয়তো চুরি করো।—এই মদের দোকানগুলোই হচ্ছে গোলামি ছড়ানোর আখড়া।

জনতা ক্রমেই পাতলা হচ্ছে। চৌধুরির উপদেশ শুনতে যাচ্ছে সব। সেখানে তিলধারণের ঠাঁই নেই। দিনেদিনে চৌধুরির যশ দারুণ বেড়ে গেছে। ওর ওখানে পঞ্চায়েত, দেশের উন্নতি এসব নিয়ে কথা হয় রোজই। লোকের খুব ভালো লাগে সে সব আলোচনা। ওদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ বাড়ছে। ওরা উপলব্ধি করতে শিখেছে নিজেদের গৌরব, নিজেদের আত্মমর্যাদা। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে। স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ। স্বাধীনতার স্বাদ পেল ওরা। ঘরের তুলো, ঘরের সুতো, ঘরের কাপড়, ঘরের খাওয়া, ঘরের আদালত। না আছে পুলিশের ভয়, না আছে আদালতের তোষামোদ—সুখ আর শান্তিতে ভরপুর জীবন। বহুলোকে নেশা করা ছেড়ে দিল, মিলেমিশে জীবনযাপন করতে লাগল সৎভাবে।

কিন্তু ভগতের ভাগ্য ততখানি সুপ্রসন্ন ছিল না। তাঁর রাজভক্তির বক্তৃতায় ক্রমশ অরুচি ধরে গেল জনসাধারণের। এমন হল যে তাঁর সভায় শ্রোতা বলতে পাটওয়ারি, চৌকিদার, শিক্ষক আর ঐ সব কর্মচারীর স্যাঙাত ছাড়া অন্য কেউ থাকতই না। মধ্যে মধ্যে বড়ো হাকিমসাহেব এসে ভগতজির খুব সুখ্যাতি টুখ্যাতি করে ভগতজির চোখের জল কিছুক্ষণের জন্য মুছিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু ক্ষণিকের এই সমাদর ও স্বীকৃতি কি আর শীতল করতে পারে অষ্টপ্রহর তাচ্ছিল্য আর অশ্রদ্ধার দাহ? যে পথে ভগতজি যান সেপথেই লোকে আঙুল তুলে তুলে তাঁকে দেখায়। কেউ বলে সাহেবদের মোসায়েব, কেউ বলে পুলিশের চর। দাঁতে দাঁত চেপে ভগতজিকে সয়ে যেতে হয় নিজের অপযশ আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সুনামের সমস্ত জ্বালা। জীবনে এই প্রথম বার তাঁকে নিচু হতে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে। জীবনভর কুলমর্যাদার ধ্বজা উড়িয়ে এসে, তার জন্য তাঁর সর্বস্ব বাজি রেখে, সেই মর্যাদা আজ ধুলায় গড়াগড়ি যাবে। অপমানের এই নিদারুণ জ্বালা ভগতজিকে একমুহূর্তের জন্য স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সবসময় শুধু এক চিন্তা, হারানো সম্মান কী করে উদ্ধার করি, কী ভাবে বিধ্বস্ত করি প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরব? কী উপায়ে ভেঙে দেয়া যায় ওর ওই অহংকার?

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে তিনি উপায় ঠাওরালেন একটা। সিংহকে তার নিজেরই ডেরায় পেড়ে ফেলতে হবে।

সেদিন সন্ধেবেলায় চৌধুরির বাড়ির সামনেটায় একটা মহতী জনসভা ছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে চাষিরা সব এসেছে দলে দলে। হাজার হাজার মানুষের জমায়েত। চৌধুরি সেখানে

স্বরাজ নিয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভারতমাতার জয়ধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। একপাশে মেয়েরাও সমবেত হয়েছেন। বক্তৃতা শেষ হতেই চৌধুরি গিয়ে বসেন তাঁর নিজের আসনে। স্বেচ্ছাসেবকরা চাঁদা সংগ্রহ করতে লাগল স্বরাজ্য-তহবিলের জন্য। হঠাৎ ভগতজি লাফিয়ে উঠলেন মঞ্চের ওপর, শ্রোতাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—

ভাইসব, আমাকে এখানে এভাবে দেখে তোমরা আশ্চর্য হবে না। আমি স্বরাজের বিরোধী নই। এমন হীন কে আছে যে স্বরাজের নিন্দে করে! কিন্তু স্বরাজ পাবার যে রাস্তা চৌধুরি দেখাল, যা শুনে তোমরা গদগদ হয়ে উঠছ, তা দিয়ে হবে না। যেখানে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সেখানে পঞ্চায়েত কী করতে পারে? বিলাসিতার ভূতটাকে কীভাবে নামানো যাবে ঘাড় থেকে, কীভাবে বর্জন করা যাবে মদের দোকানগুলোকে? সিগারেট, সাবান, মোজা, গেঞ্জি, আদ্দির ওপর মানুষের মোহ কবে কাটবে? ক্ষমতা আর উচ্চাশার লোভ যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারি মাদ্রাসা বয়কট করবে কীভাবে? কী করে ভাঙবে বিধর্মী শিক্ষার শিকল-বেড়ি? স্বরাজ আনতে হলে একটাই উপায় আছে, তা হল আত্মসংযম। এই একটাই মহৌষধ যা সমস্ত রোগ সমূলে উচ্ছেদ করবে। আত্মার দুর্বলতাই হচ্ছে পরাধীনতার মূল কারণ, আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে সবল কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো, মনকে বশ মানাও, তবেই না তোমার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সঞ্চার হবে, বিভেদ-বিবাদ মিটবে, হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হবে, তবেই না ভোগবিলাস থেকে মন সংযত হবে, নেশা কাটবে। আত্মবল ছাড়া স্বরাজ আসতেই পারে না। সমস্ত পাপের মূলে হচ্ছে স্বার্থ।—এই স্বার্থবোধই তোমাদের আদালতে টেনে নিয়ে যায়, তোমাদের বিধর্মী শিক্ষার দাস বানিয়ে রেখেছে। এই অপদেবতাকে ধ্বংস করতে চাই আত্মবল, তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারবে। তোমরা সবাই জানো, আমি চল্লিশ বছর ধরে আফিম খেয়ে আসছি, আজ থেকে আফিম আমার কাছে গো-রক্তের সমান। চৌধুরির সঙ্গে আমার তিন পুরুষের ঝগড়া। আজ থেকে চৌধুরি আমার ভাই। আজ থেকে আমাকে কিংবা আমার বাড়ির কাউকে যদি ঘরে-বোনা কাপড় ছাড়া অন্য কিছু পরতে দেখো, তাহলে যা খুশি সাজা দিও। আমি আর কিছু বলতে চাই না। ঈশ্বর সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

এই বলে ভগতজি তার বাড়ির পথে পা বাড়াতেই চৌধুরি এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তিন পুরুষের দ্বন্দ্ব এক নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল।

সেদিন থেকে চৌধুরি আর ভগতজি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বরাজ-এর প্রচার করতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে মিত্রতা গড়ে উঠল অচিরেই, ঠাওরানো মুশকিল হল জনতা কাকে বেশি সম্মান করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্ফুলিঙ্গে দুজনেরই অন্তরের অন্তস্তল উদ্ভাসিত হতে থাকল।

(লাগ-ডাট/১৯২১)

অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

বুড়ি কাকি

বার্ধক্য প্রায় শৈশবের পুনরাগমনের সূচক। তাই বুড়ি কাকির জিহ্বার স্বাদ ভিন্ন অন্য আর কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। একমাত্র কান্না ছাড়া নিজের কষ্টের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অন্য কোনো উপায়ও ছিল না তাঁর। সমস্ত ইন্দ্রিয়, চোখ, হাত ও পা জবাব দিয়ে দিয়েছিল। তিনি কেবল মাটিতে পড়ে থাকতেন আর বাড়ির কেউ যদি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করত, খাবার সময় যদি পার হয়ে যেতে, ক্ষুধার পূর্ণ নিবৃত্তি যদি না হত কিংবা বাজার থেকে কোনো জিনিস এলে যদি তাকে দেওয়া না হত, তাহলে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিতেন। তার কান্না সাধারণ কান্না ছিল না, তিনি গলা ছেড়েই কাঁদতেন।

এক যুগ হল তার স্বামী স্বর্গত হয়েছেন। একের পর এক তাজা ছেলেও মারা গিয়েছে। এখন এক ভাইপো ছাড়া আর কেউ নেই। এই ভাইপোর নামেই তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার সময় তার ভাইপো অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছিল; কিন্তু আসলে সেসব ছিল কুলি-ডিপোর দালালদের মতো ভুলিয়ে নেওয়ার ধান্দা। যদিও ওই সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড়শো-দুশো টাকার কম ছিল না তবু বুড়ি কাকির পেট ওরে খাওয়া জুটত অনেক কষ্টে। এব্যাপারে তার ভাইপো পণ্ডিত বুদ্ধিরামের দোষ, না তার অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী রূপার দোষ তা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। বুদ্ধিরাম ছিল স্বভাবে সজ্জন; তবে ততক্ষণই সে সজ্জনতা দেখাত যতক্ষণ না তার পকেটে হাত পড়ত। রূপা উগ্র স্বভাবের ছিল ঠিকই, তবে সে ছিল ধর্মভীরু। তাই রূপার স্বভাবের উগ্রতা কাকিকে ততটা উত্যক্ত করত না যতটা করত বুদ্ধিরামের ভালোমানুষি।

কখনও কখনও নিজের অত্যাচারের জন্য বুদ্ধিরামের খেদ হত। মনে মনে ভাবত, এই সম্পত্তির দৌলতেই তো আমি আজ ভালোমানুষ হয়ে বসেছি। যদি শুধু মুখের কথায় আর শুষ্ক সহানুভূতিতে কাজ হত তাহলে কখনও সে আপত্তি করত না; কিন্তু বাড়তি খরচের ভয় তার সদিচ্ছাকে দাবিয়ে রেখে দিয়েছিল। এমন কী, যদি দরজায় এসে কোনো ভদ্রলোক বসতেন আর বুড়ি কাকি তার কাছে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করতেন তাহলে বুদ্ধিরাম রেগে আগুন হয়ে যেত ও ঘরে গিয়ে তাকে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিত। ছেলেপুলেদের সঙ্গে বুড়োদের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষের সম্পর্ক থাকে। তার উপর তারা যখন বুড়ি কাকির সঙ্গে নিজেদের মা-বাবার এই ব্যবহার দেখত, তখন তারা আরও বেশি করে তার পেছনে লাগত। কেউ একটা চুটকি মন্তব্য করে পালিয়ে যেত; কেউ বা জল মুখে নিয়ে তার উপর কুলকুচি করে দিত। কাকি

চিৎকার করে কাঁদতেন; কিন্তু যেহেতু সবাই জানত যে, কাকি কেবল খাবার জন্যই চিৎকার করেন, তাই কেউই আর তার হা-হুতাশ কিংবা আর্তনাদে গুরুত্ব দিত না। তবে ক্রুদ্ধ কাকি যদি বাচ্চাদের গালি দিতে শুরু করতেন তাহলে রূপা ঘটনাস্থলে এসে হাজির হত। এই ভয়ে কাকি কদাচিৎই তার জিহ্বা-কৃপাণের প্রয়োগ করতেন, যদিও কান্নার চেয়ে উপদ্রব দমনের জন্য এই পন্থা ছিল অনেক বেশি উপযুক্ত।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে যদি কাকির সঙ্গে কারও অনুরাগের সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা ছিল বুদ্ধিরামের ছোট মেয়ে লাডলির সঙ্গে। লাডলি তার দুই ভাইয়ের ভয়ে তার ভাগের ছোলাভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি বুড়ি কাকির পাশে বসে খেত। এই ছিল তার রক্ষাগার, তবে যদিও কাকির লোলুপতার জন্য তার আশ্রয় অত্যন্ত দুর্মূল্যের ব্যাপার হয়ে পড়েছিল; তবুও ভাইদের অন্যায়ের চেয়ে এ আশ্রয় ছিল অনেক সুলভ। পরস্পরের এই স্বার্থচিন্তা দুজনের মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

দুই

রাত্রিকাল। বুদ্ধিরামের বাড়ির দরজায় শানাই বাজছে আর গ্রামের বাচ্চাদের একটা দল বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সংগীতের রসাস্বাদন করছে। খাটিয়ার উপর বসে বিশ্রাম করতে করতে অতিথিরা নাপিতদের দিয়ে গা-হাত টেপাচ্ছে। পাশে উপস্থিত ভাট বীরগাথা শোনাচ্ছে আর কিছু আবেগপ্রবণ অতিথির 'বাঃ! বাঃ!' শুনে তারা খুশি হয়ে ভাবছে, এই প্রশংসার যথার্থ অধিকারী বুঝি সে নিজেই। দু-একটি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক অবশ্য এসব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বসেছিল। এই রকম অশিক্ষিত সমাজে কিছু বলা অথবা যোগ দেওয়া নিজেদের মর্যাদার হানিকর বলে তারা ধরে নিয়েছিল।

আজ বুদ্ধিরামের বড়ো ছেলে মুখরামের আশীর্বাদ। এ হল তারই উৎসব। বাড়ির ভিতর স্ত্রীলোকেরা গান গাইছে আর রূপা অতিথিদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। উনানের উপর কড়া বসানো হয়েছে। একটায় পুরি, কচুরি ইত্যাদি ভাজা হচ্ছে, আর একটায় অন্য রান্না চড়েছে। একটা বড়ো হাঁড়িতে মশলাদার ব্যঞ্জন রান্না হচ্ছে। ঘি ও মশলার ক্ষুধাবর্ধক সুগন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে।

বুড়ি কাকি নিজের কুঠুরিতে শোকের প্রতিমার মতো বসেছিলেন। খাবারের এই সুগন্ধ তাকে ব্যগ্র করে তুলেছিল। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, আমাকে পুরি সম্ভবত দেবে না। এত দেরি হয়ে গেল, অথচ কেউ খাবার নিয়ে এল না। মনে হচ্ছে, সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমার জন্য আর কিছু পড়ে নেই। একথা ভেবে তার কান্না পেল। কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁদতে পারলেন না।

আহা! কী সুগন্ধ? এখন আর কে আমার খবর নেয়? যখন রুটিই জোটে না তখন কী আর এমন ভাগ্য হবে যে পেট পুরে পুরি খাব? এসব মনে হয়ে তার কান্না এল; বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মতো শুরু হল। কিন্তু রূপার ভয়ে তিনি আবার চুপ করে গেলেন।

এই সব যন্ত্রণাদায়ক চিন্তায় বুড়ি কাকি অনেকক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন। ঘি ও মশলার সুগন্ধ থেকে থেকে তার মনকে হতচেতন করে দিচ্ছে। মুখ জলে ভরে ভরে আসছে। পুরির স্বাদ মনে হতেই তার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হচ্ছে। কাকেই বা ডাকা যায়। আজ তো লাডলি বেটিও

আসেনি। ছেলে দুটো সব সময় এসে দিক করে, আজ তাদেরও কোনো পাত্তা নেই। কী হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছু খবর তো পাওয়া যেত।

বুড়ি কাকির কল্পনায় পুরির ছবি নাচতে শুরু করল। খুব লাল লাল, ফোলা ফোলা, নরম নরম। রূপা খুব ভোজের ব্যবস্থা করে থাকবে। কচুরিতে দেওয়া শা-জিরে ও এলাচের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। একটা পুরি পেলে হাতে নিয়ে দেখা যেত। কেন, কড়ার সামনে গিয়েই একটু বসি না। কলকল করে পুরি ভাজা হবে। কড়া থেকে গরম গরম উঠিয়ে থালায় রাখা হবে। ঘরে বসে ফলের গন্ধ শোঁকা যায়, তবে বাগানে যেতে পারলে আরও ভালো। এসব ভেবে বুড়ি কাকি উবুড় হয়ে বসে হাতে ভর দিয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে চৌকাঠ পার হয়ে ঘসটাতে ঘসটাতে কড়ার কাছে গিয়ে বসলেন। ভোজনরত মানুষের সামনে বসে ক্ষুধার্ত কুকুরের যে অবস্থা হয়, কড়ার পাশে বসে বুড়ি কাকিরও তাই হল।

রূপা তখন কাজের চাপে উদ্বাস্ত। কখনও এঘরে যাচ্ছে, কখনও ওঘরে; কখনও কড়ার পাশে আসছে, কখনও যাচ্ছে ভাঁড়ারে। কে একজন বাইরে থেকে এসে বলল—মহারাজ ভাঙ চাইছেন। তখনই সে ভাঙ দিতে লেগে গেল। এরই মধ্যে আবার কেউ এসে বলল—ভাট এসেছে, তাকে কিছু দিয়ে দিন। ভাটের জন্য সিধা বের করছে এমন সময় তৃতীয় কেউ এসে জিজ্ঞাসা করল—রান্না হতে এখন আর কত বাকি আছে? ঢোল আর করতালএকটু বের করে দিন। একা মেয়েছেলে, বেচারা দৌড়ে দৌড়ে একেবারে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে রেগেও উঠছিল, তবু ক্রোধ প্রকাশ করার অবসর পাচ্ছে না। ভয় ছিল, কোনো প্রতিবেশী না বলে বসে, এতেই এত মেজাজ। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। গরমের চোটে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তবুও এতটুকু অবকাশ পাচ্ছে না যে একটু জল খেয়ে নেয় কিংবা পাখা নিয়ে হাওয়া খায়। এই ভয়ও ছিল যে, একটু চোখ সরালেই হয়তো হরির লুট লেগে যাবে। এই অবস্থায় বুড়ি কাকিকে কড়ার পাশে বসে থাকতে দেখেই রূপা জ্বলে উঠল। ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। এটাও মনে এল না যে, পড়োশি মহিলারা বসে আছে, তারা কী ভাববে; অন্য লোক শুনেই বা কী বলবে! ব্যাঙ যেভাবে কেঁচোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেও সেইভাবে বুড়ি কাকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে দুহাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এভাবে পেটে আগুন লাগে, পেট, না খোলা? ঘরে বসে কি দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এখনও অতিথিদের খাওয়া হল না, দেবতার ভোগ হল না, তুমি কি সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলে না? এসে বুকের উপর বসে গেছ। এরকম জিভ পুড়ে যায় না কেন। সারা দিন না খেয়ে থাকলে কার হাঁড়িতে গিয়ে মুখ দিতে কে জানে? গ্রামের লোক দেখলে বলবে যে, বুড়ি ভরপেট খেতে পায় না বলেই তো এরকম ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। ডাইনি মরেও না, আসনও ছাড়ে না। নাম ডুবিয়ে ছাড়বে। বেইজ্জত না করে থামবে না। এত গিলছে, তবুও কে জানে সব ভস্ম হয়ে কোথায় যাচ্ছে। নাও, ভালো চাও তো কুঠুরিতে গিয়ে বস। যখন বাড়ির লোকের খাওয়া শুরু হবে তখন তুমিও পাবে। তুমি তো আর কোনো দেবী নও যে কারও মুখে জলও পড়ল না অথচ তোমার পুজো হয়ে গেল।

বুড়ি কাকি মাথা তুললেন না, কাঁদলেন না, কথাও বললেন না, ঘসটাতে ঘসটাতে চুপচাপ নিজের কুঠুরিতে চলে গেলেন। রূপার আওয়াজ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত

ক্ষমতা, সম্পূর্ণ বিচারশক্তি এবং সম্পূর্ণ জোর ওই দিকেই আকর্ষিত হয়েছিল। নদীতে যখন কোনো বিশাল পাড় ভেঙে পড়ে তখন আশপাশের জল সেই জায়গা ভরার জন্য ছুটে আসে।

তিন

রান্না হয়ে গেলে উঠোনে পাতা পড়ল। অতিথিদের ভোজন শুরু হয়ে গেল। মহিলারা ভোজের গীত আরম্ভ করে দিলেন। অতিথিদের নরসুন্দর ও ভৃত্যরাও তাদের সঙ্গে অথচ একটু দূরে খাবার জন্য বসে গিয়েছে। তাহলেও রীতি অনুসারে সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই উঠতে পারছিলেন না। কিছুটা শিক্ষিত ছিলেন এমন দু-একজন অতিথি ভৃত্যদের অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া দেখে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকার এই ব্যবস্থাকে তারা অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন ব্যাপার বলে মনে করছিলেন।

বুড়ি কাকি নিজের কুঠুরিতে গিয়ে অনুতাপ করছিলেন : আমি কী ছিলাম, কী হয়েছি! রূপার উপর তার ক্রোধ হল না। নিজের অস্থিরতার জন্য দুঃখ হল। সত্যিই তো, অতিথিদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির লোক কী করে খায়! আমার এতটুকু তর সইল না। সবার সামনে এই অপমান! এখন যতক্ষণ পর্যন্ত ডাকতে না আসবে যাব না।

মনে মনে এইসব চিন্তা করে তিনি তাকে ডাকার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ঘির রুচিবর্ধক সুবাসকে কঠোর ধৈর্য-পরীক্ষক বলেই মনে হল। এক এক মুহূর্ত তার কাছে এক এক যুগ বলে মনে হতে লাগল ঃ এখন বোধ হয় পাতা বিছানো হয়ে গেছে। এতক্ষণে অতিথিরা এসে গিয়ে থাকবেন। নাপিত জল দিচ্ছে আর অতিথিরা হাত-পা ধুচ্ছেন। লোক খেতে বসে গেছে বোধ হয়। ভোজের গীত গাওয়া হচ্ছে। — এই সব চিন্তা করে মনকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে একটা গীত গুনগুন করতে লাগলেন। তার মনে হল — আমি অনেকক্ষণ গান গাইছি। তা, এত দেরিতেও কি লোক এখনও খাচ্ছে! কারও কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই সবাই খাওয়াদাওয়া করে চলে গেছে। আমাকে ডাকতেও কেউ এল না। রূপা রেগে গেছে; কে জানে হয়ত ডাকবেই না। হয়তো ভাবছে, আমি নিজেই যাব। আমি তো আর কোনো অতিথি নই যে আমাকে ডেকে পাঠাতে হবে। বুড়ি কাকি যাবার জন্য তৈরি হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই পুরি ও মশলাযুক্ত ব্যঞ্জন তার সামনে হাজির হবে; কাকির স্বাদেন্দ্রিয় উশখুশ করে উঠল। মনে মনে তিনি নানা রকমের পরিকল্পনা করলেন: প্রথমে তরকারি দিয়ে পুরি খাব; তারপর খাব দই ও মিষ্টি দিয়ে। মাঠার সঙ্গে কচুরি জমবে ভালো। কেউ ভালো বলুক আর খারাপই বলুক, আমি চেয়ে চেয়ে খাব। এতে লোকে বলবে তো যে, কোনো বিবেচনা নেই? কী করব? এত দিন বাদে যখন পুরি জুটেছে তখন কি আর মুখ নষ্ট করে এমনি উঠে যাব?

কাকি উবু হয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠোনে এলেন। কিন্তু, হা দুর্ভাগ্য! আগের বারের মতো এবারও কল্পনা সময়ের হিসাবে ভুল করে বসেছিল। অভ্যাগত-মণ্ডলী তখন সবে বসেছেন। কেউ খেয়ে আঙুল চাটছিলেন; কেউ বা তির্যক দৃষ্টিতে দেখছিলেন অন্যেরা তখনও খাচ্ছে কী না। কেউ ভাবছিলেন, পাতে পড়ে-থাকা পুরি কোনো রকমে পেটে ভরে নেওয়া যায় কী না। কেউ কেউ দই খেয়ে জিব দিয়ে তৃপ্তিসূচক শব্দ করছিলেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বার চাইতে সংকোচ হচ্ছিল। এমনি